একক ৬৯ ☐ বিবিধ প্রবন্ধ ঃ গীতিকাব্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

৬৯.১ উদ্দেশ্য
৬৯.২ প্রস্তাবনা
৬৯.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা
৬৯.৪ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য
৬৯.৫ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্য
৬৯.৬ মূল পাঠ ঃ প্রবন্ধের প্রথমাংশ
৬৯.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৬৯.৮ সারাংশ-১
৬৯.৯ অনুশীলনী-১
৬৯.১০ মূলপাঠ ঃ প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ
৬৯.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৬৯.১২ সারাংশ-২
৬৯.১৩ অনুশীলনী-২
৬৯.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৬৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের—

- গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৬৯.২ প্রস্তাবনা

সাহিত্যের নানা Form বা 'রূপ' আছে। 'কবিতা' সেই সব নানা 'রূপে'র একটি। আবার, 'কবিতার'ও আছে নানা Form বা 'রূপ'। 'লিরিক' বা 'গীতিকবিতা [বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে, 'গীতিকাব্য' অভিধাটিই প্রচলিত ছিল বলে তিনি 'গীতিকাব্য' অভিধাই ব্যবহার করেছেন।] তার মধ্যে একটি। বর্তমান প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবিতার স্বরূপ এবং প্রকৃতি নিয় আলোচনা করেছেন। গীতিকবিতা সম্পর্কে এটিই বাংলায় সর্বপ্রথম আলোচনা। অবশ্য প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল, নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' নামে একটি গীতিকবিতা সংকলনের সমালোচনা রূপে। গীতিকবিতা নিয়ে তখনকার শিক্ষিত বাঙালির মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সেই অভাব ঘুচিয়েছেন। নাটক বা আখ্যায়িকার প্রকৃত রূপ সম্পর্কেও শিক্ষিত বাঙালির কোনো ধারণা ছিল না। বাইরের অবয়ব বা আকৃতি দিয়েই তাঁরা

এগুলির স্বরূপ নির্ধারণ করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল,—কথোপকথনের আকারে কিছু রচনা করলেই তা নাটক হয়ে যায়; কিংবা টানা গদ্যে কিছু রচনা করলেই তা উপন্যাস হয়ে যায়। আসলে সাহিত্যের মূল স্বরূপ নির্ভর করে রচনাটির আন্তর সত্তার উপর, বাইরের কোনো রূপ বা অবয়বের উপরে নয়। এই অর্থে—কথোপকথনের আকারে লিখলেও তা কাব্য হতে পারে; কিংবা, আখ্যানের আকারে লিখলেও। মূলত বাঙালি বা বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হলেও আলোচনার পটভূমিকাটি কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গীতিকবিতা। সে হিসেবে রচনাটির একটি ব্যাপকতা ও সমগ্রতা আছে। গীতিকবিতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে তার দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। এখানেই এ প্রবন্ধটির বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে।

৬৯.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা

ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র (জন্ম ঃ ২৬শে জুন, ১৮৩৮। মৃত্যু ঃ ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪) ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রের প্রথম উদ্‌গাতা। পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুরে ডেপুটী কলেকটর। যাদবচন্দ্রের চার পুত্র-শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। প্রকৃত বাল্যশিক্ষার শুরু মেদিনীপুরে, এফ টীড নামে এক ইংরেজ শিক্ষকের স্কুলে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কাঁটালপাড়ায় ফিরে এসে সংস্কৃত-বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। এ বছরই ভর্তি হন হুগলী কলেজে। ১৮৫৬ পর্যন্ত এখানেই লেখাপড়া করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮ মার্চ, ১৮৫৩) তাঁর কবিতা 'কামিনীর উক্তি' পত্রস্থ হলে এর জন্য পুরস্কার পান-কুড়ি টাকা। 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও 'সংবাদ সাধু বঞ্জনে তাঁর গদ্য-পদ্যাদি রচনা বের হতে থাকে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আইন পড়বার জন্য তিনি ভর্তি হলেন—প্রেসিডেন্সি কলেজে। এখানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাশ করলেন বি.এ। এ বছরই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর নিযুক্ত হন—যশোহরে। চাকুরি জীবন থেকে অবসন নেন—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১। তাঁর প্রতিভা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে বিরোধিতার জন্য আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেন নি। বাল্যকালে তাঁর এক বিবাহ হয়, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সন্তান ছিল না। তিন কন্যা ঃ শরৎকুমারী, নীলাজ কুমারী এবং উৎপলা কুমারী।

প্রথম চাকুরি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন যশোহরে গেলেন, তখন তার সঙ্গে সেখানে দীনবন্ধু মিত্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। এ দু'জনের পারস্পরিক সাহচর্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সাহিত্য জীবনের এক পরিপোষক ছিলেন। কিশোরী চাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকা, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ধারাবাহিক ভাবে একটি ইংরেজি উপন্যাস লিখতে থাকেন—'Rajmohan's wife'। তখন তিনি খুলনায়। তারপর বের হল প্রথম উপন্যাসে-'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫); ক্রমে 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। এর মধ্যে 'কপালকুন্ডলা' তাকে বিশেষভাবে বিখ্যাত করে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) থাকাকালীন সময়টি (১৮৬৯-১৮৭৪) খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। এখান থেকেই বের হয় তাঁর বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা—'বঙ্গদর্শন' (এপ্রিল, ১৮৭২)। এই পত্রিকাকে অবলম্বন করে, বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে, এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর জন্ম হয়, যাঁরা পরবর্তীকালে এক মননধর্মী ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যধারার প্রবর্তন করেন। 'বঙ্গদর্শন' এক নাগাড়ে চার বছর বন্ধ হয়ে যায়। দু বছর এর কোনো প্রকাশ ঘটেনি। ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায়, পত্রিকাটি আবার বের হতে থাকে। এ বছর নবম খন্ডটি বের হবার পর তাও শেষে বন্ধ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত বের হত সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায়। অতঃপর সম্পাদক হন—শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সব্যসাচী' আখ্যা দিয়েছিলেন। একদিকে নিজে যেমন সৃষ্টিকর্মে রত ছিলেন, অপর দিকে অক্ষম রচনাবলীর "ধূম ও ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।" 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা থেকেই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বের হতে থাকে। ক্রমে 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়',

'চন্দ্রশেখর', 'রাধারানী' প্রভৃতি ছোটো বড়ো রচনা প্রকাশ পেল। সঞ্জীবচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক, তখন পত্রস্থ হয়-'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ'। 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'লোকরহস্য' ও 'বিজ্ঞান রহস্য'-প্রভৃতি রচনাও তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষের দিকে উপন্যাসগুলি এক বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত। স্বাদেশিকতা এর প্রধান দিক। 'রাজসিংহ' উপন্যাসটিকে এজন্যে তিনি বিস্তৃততর করেন (১৮৮২ এবং ১৮৯৩-তে)। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) সীতারাম' (১৮৮৭) উপন্যাসে তার সেই ভাবনা রূপ পায়। 'সীতারাম'ই তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। অতঃপর তিনি 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' পত্রিকায়, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় রত হন। প্রচারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়—'কৃষ্ণচরিত্র' ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, 'কৃষ্ণ চরিত্রে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বের হয়—১৮৯২ তে। 'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিম প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'নবজীবন' পত্রিকাতেও তিনি 'ধর্ম জিজ্ঞাসা' ও 'অনুশীলন' তত্ত্ব নিয়ে লিখতে থাকেন। 'ধর্মতত্ত্ব' প্রথম ভাগ, 'অনুশীলন' নামে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বের হয়। 'প্রচারে' 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করে শেষ করে যেতে পারেন নি। বৈদিক যুগের পটভূমিকায় একটি উপন্যাস লিখবার পরিকল্পনা থাকলেও তাও অ-রচিতই থেকে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় অবস্থিত, সেই সময় তিনি 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা 'ভারতবর্ষীয় সভা'র সভ্যপদ লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হন। সোসাইটি ফর হায়ার-ট্রেনিং অফ ইয়ং মেন' (পরবর্তী কালে এটির নাম হয়—'ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট')-এর সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে 'Companion of the Indian Empire' (সংক্ষেপে C.I.E) উপাধি দিলে তা নিয়ে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সুশাসক ও সুবিচারক ছিলেন। শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান—প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার ও মুক্ত। যৌবনে তিনি ফরাসী দার্শনিক Comte-এর Positivism মতবাদে বিশ্বাসী হন। এছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও তাঁকে প্রভাবিত করেন।

৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ (২৬শে চৈত্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দে) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৬৯.৪ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

'প্রবন্ধ' কথাটির মূল অর্থ-'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। ভাবের বন্ধন, যুক্তির বন্ধন, ছন্দের বন্ধন, বাক্যের বন্ধন। সংস্কৃতে ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' কথাটি সাহিত্যে কোন নির্দিষ্ট Form বা রূপকল্পকে বোঝাত না। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন গদ্যের সুস্পষ্ট প্রবর্তন ঘটল, তখন গদ্যে লেখা বিষয়বস্তু প্রধান রচনাকে 'প্রবন্ধ' বলা হতে থাকল। কখনও বা 'প্রবন্ধ'-কে 'প্রস্তাব' ও বলা হয়েছে। মোটামুটি ভাবে ইংরেজি Essay এবং বাংলা প্রবন্ধ সমার্থক। Essay কে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হল—বিষয়বস্তু ভিত্তিক, Objective রীতিসম্পন্ন, নৈর্ব্যক্তিক গদ্য রচনা। অপরটি রচয়িতার মানস ও ব্যক্তিত্ব ভিত্তিক, Subjective রীতিতে রচিত। বাংলা প্রবন্ধকেও এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধধারার প্রথম ধারাটি।

এই প্রথম ধারাটির উদ্ভবের ও পরিপুষ্টির পেছনে কয়েকটি বিশেষ দিকের ভূমিকা লক্ষণীয়। প্রথমত, বাঙলা গদ্যের সুস্পষ্ট প্রবর্তন। দ্বিতীয়ত, বাঙালির জীবনে বিশ্বের বিবিধ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা ও মানসিকতা। তৃতীয়ত, সাময়িক পত্রে প্রকাশ, যে সাময়িক পত্রগুলিতেই বিবিধ সাময়িক ঘটনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। চতুর্থত, উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টানধর্মকে অবলম্বন করে যে নানা তর্কালোচনা চলতে থাকে, তারই প্রতিক্রিয়ায় সাময়িক পত্রাদিতে নানা প্রবন্ধ রচিত হয়। পঞ্চমত, এই প্রবন্ধ ধারাটিকেই অবলম্বন করে একদিকে বাঙালির মননশক্তির যেমন বিকাশ ঘটতে থাকে, তেমনি বাঙালির গদ্য রচনাও বিবর্তিত ও উন্নততর হতে থাকে।

ষষ্ঠত, এই প্রবন্ধধারাটিকে বাঙালির রেনেসাঁসের একটি দিক বলে মনে করা যেতে পারে। বাঙালির সাংস্কৃতিক মনীষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল প্রবন্ধসাহিত্য। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সকলেই প্রবন্ধ রচনা করে এর ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসটিকে কয়েকটি পর্বে বা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগ দুভাবে করা হয়েছে—কখনও কোন সাময়িক পত্রিকা বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত প্রবন্ধ ধারা, কখনও বা কোন দেশনেতা বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা কোন গোষ্ঠীকে ভিত্তি করে রচিত প্রবন্ধ ধারা। এই ধরনের সাময়িক পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, ভারতী, বঙ্গবাসী, সাধনা, সাহিত্য, প্রবাসী, নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, বিচিত্রা, প্রভৃতি। এক-একজন চিন্তাবিদ্ ও লেখককে অবলম্বন করে বাঙলা প্রবন্ধের যুগ বিভাগ এই ভাবে করা যায় ঃ রামমোহনের যুগ, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ ; রবীন্দ্রনাথের যুগ। প্রত্যেক যুগেরই যুগ নায়কদের সঙ্গে ছিলেন বহু লেখক-লেখিকা। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হ'ল, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার গোষ্ঠীই হোক, আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন যুগই হোক,-দুয়ের মধ্যে দিয়েই বাঙালি মানসের এক সার্বিক প্রকাশ ঘটেছে, অনেক সময়েই এই দুই দিকের মধ্যে সংযোগও লক্ষ্য করা গেছে। একদিনেই সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ (Form) রূপে প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশিষ্টতাকে অর্জন করা বাঙালির পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমন বাংলা ছোটোগল্পের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রের একটি মূল্যবান ভূমিকা ছিল, প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও সেইরকম। সাময়িক পত্র সমসাময়িক বিবিধ-বিচিত্র প্রসঙ্গ-ঘটনা-তথ্যকে যেমন আশ্রয় করে, তেমনি এক সংখ্যাতেই সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে (ধারাবাহিক প্রবন্ধ ব্যতীত) এই দায়িত্ব ও স্বীকার করে। ফলে বাংলা প্রবন্ধের বিষয় ও দৈর্ঘ্য, এইভাবে নিরূপিত হতে থাকে। অপর-দিকে যুগনায়কগণ তাঁদের বিশিষ্ট ভাবনা-চিন্তাকে প্রবন্ধে দিতে থাকেন, সঙ্গে থাকতেন তাঁদের সহযোগীগণ। অবশ্য এসব কথা সাধারণভাবে বলা হল, ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। এইভাবে দুদিক থেকে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের অগ্রগতি ঘটতে থাকে।

রামমোহনের যুগে স্বয়ং রামমোহন এবং সে যুগের অন্যান্য লেখকেরা যে প্রবন্ধধারার সূচনা করেন, তাকে মূলত Polemic বা বিতর্কমূলক প্রবন্ধ সাহিত্য বলা যায়। নিজের মত প্রতিষ্ঠা এবং অপরের মত খন্ডন এগুলির লক্ষ্য ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকগণের প্রয়াস এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁদের প্রবন্ধের বিষয় যেসব বিতর্কমূলক ভাষাও তেমনি সংস্কৃত ঘেষা। রামমোহনের পক্ষে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—ব্রজমোহন মজুমদার, বিপক্ষের লেখক—গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশও রামমোহন পক্ষীয় লেখক। আজ এঁদের সকলের রচনাই বিস্মৃতি গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই যুগের খ্রীষ্টান লেখক রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানচর্চার কারণে এবং নানাবিধ আলোচনার কারণ এখনও বিস্মৃত হয়নি।

অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যেমন বিবর্ধন ঘটেছে, তেমন বিষয়গত বিস্তার ঘটেছে, তা অবিস্মরণীয়। বিশেষত বিদ্যাসাগরের অবদান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এই সময়কার অপর দুই শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এই যুগে নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঘটনা এঁদেরও বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার ফল তাঁদের প্রবন্ধে ধরা পড়েছে। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-চেতনা, প্রবন্ধের রূপকল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা বাংলা গদ্যের সহজরূপের অনুবর্তন তাঁকে অমর করে রেখেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৌলিক রচনা তেমন লেখেন নি বটে কিন্তু বাংলা গদ্যের শিল্পরূপটিকে তিনিই প্রথম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। নায়ক রূপে তিনি এবং তাঁর প্রতিভাধর অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে এই যুগ। পরবর্তী অংশে এই যুগ নিয়ে আলোচনা করছি।

রবীন্দ্রযুগের পত্তন ধরা যায় মোটামুটিভাবে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। তিনিও জীবনের পর্বে নানা সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, সম্পাদক রূপে তিনিই সেখানকার প্রধান লেখক রূপে বিদ্যমান। কিংবা এখনও বা অন্য কোনা সাময়িক পত্রের লেখক। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ-সমালোচনাদি বের হয়, নিজেও পরবর্তী কালে এই পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। তাঁর নিজ-সম্পাদিত পত্রিকা হল, 'সাধনা', 'নব-পর্যায় বঙ্গদর্শন', 'ভাণ্ডার'। এছাড়া 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্র' প্রভৃতিতেও তিনি লিখেছেন। এমন কি, বিরোধী ভাবনার পত্রিকা 'সাহিত্য', 'নারায়ণ' প্রভৃতিতেও তিনি লিখেছেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং সাহিত্য আন্দোলন নিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, আজ সেগুলি ইতিহাসের বিষয় হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ধারায় আছে তাঁর নিজস্ব সাহিত্য তত্ত্ব, সাহিত্য ভাবনা, এবং সাহিত্য জীবনের পরিচয়। 'লোকসাহিত্য' নিয়ে বিশদ আলোচনা তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রবন্ধের রূপকল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনিই বাঙলায় পত্র-প্রবন্ধের ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেন। তারপর প্রাচীন ভারত ও ভারতের সাহিত্য নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। বিদেশী সাহিত্য, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক, তাঁর অধ্যয়নশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের কয়েকটি বিশেষত্বও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, তাঁর সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তাঁর প্রবন্ধেও তার জের তিনি টেনেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রবন্ধের ভাষারীতিতে কাব্যের ছোঁয়া অনেকের কাছেই পছন্দসই ছিল না। তৃতীয়ত, বহুক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধ ব্যক্তিগত ভাবনামূলক হয়ে উঠেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদরূপে গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রযুগের অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ (তাঁর প্রবন্ধের কথা পরে বলেছি), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী (তাঁর প্রবন্ধের কথা পরে বলেছি), দীনেশচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত কুমার চক্রবর্তী, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ এবং এইসব প্রতিভাধর প্রবন্ধকারগণ মিলিতভাবে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগেও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। প্রবন্ধের বিষয় ও রূপকল্প নিয়ে, ভাষা ও প্রকাশকাল নিয়ে এঁরাও নানা পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে আছেন, রাজশেখর বসু, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, অন্নদাশঙ্কর রায় (এঁরা প্রবন্ধের কথা পরে বলেছি) প্রভৃতি এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রতিভাধর লেখক-লেখিকাগণ। বাংলা প্রবন্ধের ধারা নব-নব পথে বিস্তৃত ও অগ্রসর হয়ে চলেছে।

৬৯.৫ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক। কিন্তু তাঁর প্রতিভা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও সমভাবে সার্থক হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি যেন তাঁর তত্ত্ব-দর্শনের প্রকাশক, আর তাঁর উপন্যাসাবলী যেন সেই তত্ত্ব-দর্শনের রসতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এর ফলে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ যেন একে অপরের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার' ও 'নবজীবন'—প্রধানত এই তিনটি সাময়িক পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। নানা বিষয়কে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ লিখেছেন। ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ তাঁর একটি প্রিয় বিষয় ছিল। সাহিত্য-তত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলা—সকল দিকেই তিনি সমান দক্ষতায় বিচরণ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য—সবই তাঁর আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। তিনিই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতিকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাশ্চাত্য দর্শনতত্ত্বকেও তিনি তাঁর আলোচ্য একটি দিক করে তুলেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার একটি বিভাগ ছিল-সামসাময়িক পত্র-পুস্তকের সমালোচনা। এই বিভাগে তিনি অসম্পূর্ণ লেখকদের নানাভাবে সমালোচনা করেছেন, ফলে তাঁরাও এতে উপকৃত হয়েছেন। কেবল একা বঙ্কিমচন্দ্রই নন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহযোগীগণ, তাঁরাও ছিলেন এক-একজন বিশিষ্ট ও সমর্থক লেখক। এর ফলে

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রবর্তন ঘটে। এঁদের মিলিত চেষ্টায় বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। স্বাদেশিকতা ছিল এই গোষ্ঠীর মূল মন্ত্র। দেশের স্বাধীনতা এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধি—এই দুই দিক তাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করত।

ঔপন্যাসিক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যের একটি শিল্পিত রূপকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। গদ্যের সেই শিল্পিত রূপটিই তাঁর প্রবন্ধের গদ্যের মধ্যেও গৃহীত হল। ফলে তাঁর প্রবন্ধ সাধারণ মানুষের কাছেও সহজ-বোধ্য হয়ে উঠল। দ্বিতীয়ত, যে স্মিতহাস্য রসবোধ তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে কিংবা সে সপ্রতিভতা, তাঁর প্রবন্ধেও তা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হল। তৃতীয়ত, যুক্তিবোধ সেই প্রবন্ধকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলল। চতুর্থত, তাঁর প্রবন্ধের আয়তন। সাময়িক পত্রের প্রয়োজন পূরণের জন্য, একটি বিশিষ্ট আয়তনের মধ্যে প্রবন্ধের সীমা রক্ষা করতে হয়। কেবল তাই নয়। একটি বিশিষ্ট সীমার মধ্যে একটি প্রবন্ধের সুসম্পূর্ণতার প্রসঙ্গটিও আছে। অকারণে দীর্ঘ বা অতিভাষণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লে একটি প্রবন্ধের গঠনগত সুষমাও যে ব্যাহত হয়, তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধধারা থেকেই বাঙালি পাঠক বুঝেছে। তাঁর অনুগামীরাও এ বিষয়ে তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। একদিকে প্রবন্ধের গদ্যকে হতে হবে সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য, অন্যদিকে গঠনের ক্ষেত্রে চাই একটি নির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে সুষমাময় সম্পূর্ণতা। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কোনো প্রবন্ধকার এই দুই দিককে এক করে তুলতে পারেননি।

সমসাময়িক যেসব গ্রন্থের তিনি সমালোচনা করতেন, সেই সব গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক সাহিত্যতত্ত্বের দিকটিকেও তিনি তুলে ধরতেন। এর ফলে তখনকার পাঠক সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারতেন। যেমন ভবভূ তির 'উত্তররামচরিত' নাটক নিয়ে আলোচনা কালে, কিংবা জয়দেবের কবিকৃতি আলোচনা করেছেন বিদ্যাপতির সঙ্গে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে গীতিকবিতার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। এই ভাবে তিনি তাঁর গ্রন্থ সমালোচনাকে একটি সাহিত্যিক মাত্রা প্রদান করেছেন। এ কারণেই গ্রন্থ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধগুলি সমসাময়িকতার সীমা লঙ্ঘন করে চিরায়ত সাহিত্যে পরিণত হতে পেরেছে।

তবে, একথা বলাই বাহুল্য, তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে মূল শক্তি হল—তাঁরই অন্তর্দৃষ্টি, তাঁরই সৃষ্টি নৈপুণ্য। 'বিবিধ প্রবন্ধে' যখন তিনি 'প্রাচীনা এবং নবীনা' লেখেন তখন তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা বেরিয়ে আসে। আবার, 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' রচনা কালে তিনি কথোপকথনের রীতি অবলম্বন করেন। 'সাংখ্যাদর্শন' প্রবন্ধটি যে রীতিতে লিখিত, 'ভালবাসার অত্যাচার' ঠিক সেই একই রীতিতে লিখিত নয়। প্রবন্ধের বিষয় অনুসারে তার প্রকাশরীতিও যে ভিন্ন হবে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করবার জন্য আর এক রীতির আশ্রয় নিয়েছেন—এখানে মহাভারতের প্রাসঙ্গিক আখ্যানের অনুসরণ করে প্রবন্ধের সার গ্রহণে পাঠকের সহায়ক হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

১। বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬)

২। প্রবন্ধপুস্তক (১৮৭৯)

৩। বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ, ১৮৮৭)

৪। বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২)

(আকারে দীর্ঘ রচনাকে এখানে ধরা হয়নি)

বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী লেখকদের মধ্যে আছেন ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এছাড়া অন্যান্য পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, কেশব চন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি।

৬৯.৬ মূলপাঠ ঃ 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের প্রথমাংশ

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ, সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলি গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষ কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা ১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত; এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খন্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনেকগুলির উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus", "Manfred", "Faust" ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরেজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor" কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক খন্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম নেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold" কে ঐ নাম দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খন্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খন্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

৬৯.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে সাহিত্যিক রচনামাত্রকেই 'কাব্য' বলবার প্রথা ছিল। এ প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মধ্যেও দেখা গেছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই, রামায়ণ মহাভারত 'ইতিহাস' বলে খ্যাত হলেও, এ দুটিকে কাব্য বলেন,

শ্রীমদ্ভাগবত 'পুরাণ' হলেও তার অঁশ বিশেষকে কাব্য বলেন। আধুনিক যুগের পাঠক রামায়ণ-মহাভারতকে 'ইতিহাস' বলে স্বীকার করুন বা না করুন, কাব্য বলেই স্বীকার করেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আধুনিক পাঠকের মতগত পার্থক্য তেমন নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসগুলিকে 'উৎকৃষ্ট কাব্য' বলেন, তা আধুনিক যুগের পাঠক স্বীকার করবেন না। এগুলিকে তাঁরা 'উপন্যাস' বলেই মানবে। Walter Scott (১৭৭১-১৮৩২) অষ্টাদশ শতাব্দীর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজের রোমান্টিকতাকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। ইতিহাসকে তিনি রোমান্টিক রূপ দান করে উপন্যাসকে এক বিস্তৃত পটভূমিকায় বিন্যস্ত করেছিলেন। হয়তো রোমান্টিকতার এই বিস্তৃতির কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের উপন্যাসগুলিকে সরাসরি 'কাব্য' বলেছেন; আধুনিক পাঠক এই ধরনের উপন্যাসকে রোমান্সধর্মী উপন্যাস' আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু সরাসরি কাব্য বলবেন না। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে উপন্যাসের এতো বৈচিত্র্য এবং সে অনুযায়ী পারিভাষিক নাম প্রদানের প্রথা সৃষ্টি হয়নি। আধুনিক পাঠক এক-একটি সাহিত্যে রূপের নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত বলেই এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সহমত পোষণ করা সম্ভব হবে না।

নিতান্ত অক্লেশে অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি।' কিন্তু নাটকের মধ্যেও আজ নানা রূপ-বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছেঃ কাব্য নাট্য, নাট্যকাব্য রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটি গদ্যে লেখা, তথাপি তা কবিতার কাছাকাছি। গদ্য কাব্যের প্রবর্তনের পর গদ্যে-পদ্যে ভেদ অনেকটাই ঘুচে গেছে; কাজেই বিশেষ বিশেষ সাহিত্যরীতির আশ্রয়ে লেখা নাটক কবিতার কাছাকাছি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুসারে, নাটক মাত্রই কাব্য,—আধুনিক পাঠক তা নাও মানতে পারেন। নাটক বিচারের দৃষ্টিকোণ আজ যেমন পরিবর্তিত, নাট্যকারের দিক থেকে তার রচনারীতিও আজ ঠিক তেমনটি নেই।

এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণটিকে সমকালীন পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ হয়তো প্রভাবিত করেছে। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে খাঁটি নাটক কেবল গ্রীক বা ইংরেজি ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় নেই। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' বা ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত'—এই দৃষ্টিতে নাটক নয়, কাব্য। Goethe-র মত উদ্ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। গ্যেটে নিজে কবি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি "Faust" নাটকটি লিখেছেন, ফাউস্টের জীবনের ট্র্যাডেজিকে তুলে ধরেছেন। হয়তো গ্যেটের সময় Reading drama এবং Stage drama র পার্থক্য তেমন প্রবল ছিল না; আজকের সমালোচক Faust কে Reading drama ধরে নিয়ে তার মঞ্চগত দিক উপেক্ষাও করতে পারেন, কিন্তু 'কথোপকথনে' গ্রন্থনা তো করতেই হবে। আজকের সমালোচক নাটক বলতে তার মঞ্চায়ন ও আভিনায়িক দিককেই মুখ্য বলে মানবেন এবং সেই কারণে কাব্য নাট্যেরও অভিনয় আজ বিরল নয়। Closet বা Reading drama রূপে আজ নতুন এক ধারার নাটকেরই সৃষ্টি হয়েছে। Absurd নাটক পাঠ্য নাটক রূপে বেশি সফল হলেও তারও অভিনেয়তা আজ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আজ যেখানে পাঠ্য ও অভিনেয়—দু'ধরনের নাটকের প্রবর্তন ঘটেছে' সেখানে গ্যেটে কথিত এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থিত, কথোপকথন বিহীন, অভিনয় শূন্য নাটকের কল্পনা করবেন না।

আসলে এই ধরনের পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণের অনুসারী গবেষক-শিল্পী-সমালোচক গণ নাটককে খোঁজেন কোন রূপের মধ্যে নয়, রচনার আত্মার মধ্যে। তাই কথোপকথন এবং অভিনয় নাটকের পক্ষে অপরিহার্য বলে তাঁরা মানেন না। নাটকের সেই আত্মা লুকিয়ে আছে কাব্যের মধ্যে, আখ্যায়িকার মধ্যে এবং খাঁটি নাটকের মথ্যে তো বটেই। এই জন্য তাঁরা গদ্য-পদ্য, অভিনয়-কথোপকথন, প্রভৃতির বালাই স্বীকার করেন না। অথচ, আধুনিক যুগেই, পাশ্চাত্য জগতে নাটক বিচার করতে গিয়ে কাহিনী-ঘটনা-চরিত্রের-দ্বন্দ্ব-বিবর্তনকে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে রূপদানকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য নাটকের ভাব ও রস অনুযায়ী তার অভিনয় ও মঞ্চব্যবস্থাও ভিন্ন হবে। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রঙ্গমঞ্চকে প্রাধান্য দিতে চান নি।

এই পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণটি বিচার্য। 'বিবিধ প্রবন্ধে'রই অন্তর্ভুক্ত 'শকুন্তলা', 'মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আর একটু বেশি আলোচনা করেছেন। শেক্সপীয়ার এবং কালিদাসের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন, শকুন্তলার মনোভাব কালিদাসের টীকা ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না; কিন্তু ওথেলোর মনোভাব শেকসপীয়ার ওথেলোরই কর্ম ও সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ শেকসপীয়রীয় রীতিকেই তিনি খাঁটি নাট্যরীতি বলে মনে করেন। ভারতবর্ষে নাটককে সেখানে বলা হয়—'দৃশ্যকাব্য'। অর্থাৎ কাব্যত্বই এখানে প্রধান নাটকত্ব নয়। কেন এই পার্থক্য' বঙ্কিমচন্দ্র তার উত্তর দেননি। আমাদের মতে এর উত্তর এই ঃ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে নাটককে দেখা হয়েছে রস সৃষ্টির উপায় রূপে; কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র সংস্থা-পরের দিন থেকে নয়। রসসৃষ্টিই এখানে নাটকের মূল লক্ষ্য বলে কাব্যত্ব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। একথা এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, যে, খাঁটি নাটকের মাধ্যমেও রসসৃষ্টি হতে পারে, হয়েও থাকে। রসশাস্ত্রের নির্দেশ মান্য করবার জন্যই নাটক 'দৃশ্যকাব্য' হয়ে পড়েছে কিনা, কে জানে।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির প্রথম অংশ নাটক এবং কাব্যের অপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে ব্যাপৃত। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য জগৎ থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত চয়ন করে আপন বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। তিনি জন মিল্টনের Comus (সম্পূর্ণ নাম-Mark of Comus, ১৬৩৪ খ্রীঃ), George Gordon Byron-এর (১৭৮৮-১৮২৪, Lord Byron নামে সমধিক পরিচিত) Canfred (Faust-এর Parody বা লালিকা রূপে রচিত) নাটকগুলির কথা বলেছেন। বায়রনেরই Childe, Harold (সম্পূর্ণনাম-Childe Harold's Pilgrimage; প্রথম দুই সন ১৮১২ খ্রীঃ, শেষ দুই সন ১৮১৬-১৮১৮) নাটকটির কথাও বলেছেন। Mark of Comus, নাম থেকেই বোঝা যায় এটি মুখোশ-নাটক; নাচ-গান নাটকে পূর্ণ। সমালোচকেরা এটিকে Pastoral drama বলে থাকেন। আমোদই এর মূল লক্ষ্য। এছাড়া উল্লেখ করেছেন-উইলিয়ম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের (The) Excursion (১৮১৪ খ্রীঃ)। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে The Recluse নামে তাঁর যে কাব্যগ্রন্থটি বের হয় তার প্রথম পর্বের নাম-The Prelude, দ্বিতীয় পর্বের নাম The Excursion তৃতীয় অংশটি অলিখিত। ওয়াল্টার স্কটের একটি প্রেমের উপন্যাস-'The Bride of Lammermor', তখন বাঙালির কাছে একটি প্রিয় উপন্যাস; 'নরনারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও এই উপন্যাসটির কথা বলেছেন।

উপরে উল্লিখিত এই বিভিন্ন রচনাগুলির মধ্যে কাব্য ও নাটকের মাত্রা-পরিমাণ অন্বেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য" নাম দেওয়া যায়, 'তবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের Excursion এবং বায়রনের Childe Harold তাই। আবার স্কটের লেখা উপন্যাস Bride of Lammermoor কে তিনি 'নাটক' বলেন, যেমন, উপাখ্যানকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য বলেন (এ দুয়ের মধ্যে কিন্তু তিনি পার্থক্য করলেন না), তেমনি উপন্যাসকেও 'নাটক' বলেন। আবার, Comus, Manfred Faust, যা, কথোপকথনের আকারে লিখিত, সে সব রচনাকে তিনি 'কাব্য' বলেন। অর্থাৎ রচনার বাহ্যিক আকৃতি-অবয়ব দেখে তিনি তার সাহিত্যিক প্রকৃতি নিরূপণ করতে চান না। রূপকে অতিক্রম করে তার আত্মাকে পৌঁছতে চান।

এইভাবে কাব্যের সঙ্গে নাটকের ভেদ বিশ্লেষণ করে কাব্যেরই একটি অঙ্গ 'গীতিকাব্যে'র ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে। কাজেই এই ভূমিকা অংশটির একটি অপরিহার্যতা আছে। এই অংশটিকে প্রথম ধাপ বলে মেনে নিয়ে পাঠক মূল আলোচ্য ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারবেন।

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে সাহিত্য মাত্রই 'কাব্য' এবং সেই কাব্য আবার তিন ধরনের ঃ দৃশ্যকাব্য (নাটক); আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; আর যা কিছুই এ দুয়ের বাহিরে, তাই 'খন্ডকাব্য'। খন্ডকাব্যর মধ্যেও যে নানা শ্রেণী আছে, রকমফের আছে, এই বিভাগ অনুসারে তা ধরা পড়ে না। এ বিভাগ অতি-ব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। ইউরোপে যাকে 'লিরিক' বলে খন্ডকাব্য তার কাছাকাছি, কিন্তু সর্বাংশে অভিন্ন নয়। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিরিক কবিতা রূপে খন্ডকাব্যের যে টুকু অংশ গ্রহণীয়, তার কথা বলেছেন।

৬৯.৮ সারাংশ (প্রথম অংশের)

আমাদের দেশের আলংকারিকেরা সাহিত্যমাত্রকেই 'কাব্য' বলে মনে করতেন। 'কাব্য' বলতে তাঁরা একটি ব্যাপক ধারণা পোষণ করতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'কাব্য' কে তাঁরা তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন ঃ (ক) দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটক; (খ) আখ্যান কাব্য, অর্থাৎ গদ্যে রচিত গল্পমূলক রচনা; (গ) খন্ডকাব্য এবং মহাকাব্য। এই তিন ধরনের রচনার মধ্যে যে রূপগত পার্থক্য আছে, যে কেউ তা বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু সেই রূপগত বাইরের পার্থক্যটাই এদের পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্যের মূল দিক নয়। যেমন, কথোপকথনে রচিত গ্রন্থ মাত্রই নাটক নয়; আবার অনেক আখ্যানও নাটকের আকারে রচিত হতে পারে, কিংবা অনেকগুলি খন্ডকাব্যের সমষ্টি। এই খন্ডকাব্যেরই একটি বিশেষ দিক ইউরোপে 'লিরিক' নামে পরিচিত। এই 'লিরিক' বা গীতিকবিতার স্বরূপ সন্ধানই আলোচ্য প্রবন্ধটির লক্ষ্য। ভারতের 'খন্ডকাব্য' এবং ইউরোপের 'লিরিক' সর্বাংশে এবং সর্বত্র এক বা অভিন্ন নয়। এইভাবে প্রবন্ধটির ভূমিকা করে লেখক মূল বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। এই পর্যন্ত এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ।

৬৯.৯ অনুশীলনী-১

ক. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন (২০০ শব্দের মধ্যে)

১। বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক ও চাকুরি জীবনের পরিচয় দিন।

২। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি উপন্যাস এবং প্রথম তিনটি বাংলা উপন্যাসের নাম করুন এবং মন্তব্য করুন।

৩। কালানুক্রমিক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনটি উপন্যাসের নাম করুন এবং এগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রসঙ্গে মন্তব্য করুন।

৫। 'প্রচার' এবং 'নবজীবন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশিষ্ট রচনাগুলি প্রকাশিত হয়, তার বিবরণ দিন।

৬। 'প্রবন্ধ' কথাটির মূল অর্থ কী? ক' ধরনের প্রবন্ধ আছে?

৭। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক উল্লেখ করুন। তাঁর সহযোগী লেখকগণের নাম কী?

৮। প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিতে 'কাব্য' বলতে কী বোঝান হ'ত? তখন 'কাব্য' কিভাবে বিভক্ত করা হত?

৯। এই রচনাগুলির পরিচয় দিন ঃ Faust, comus Manfred, childe Harold

১০। Walter Scott এবং Bride of Lammermoor প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন।

খ. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত উত্তর দিন (১০০০ শব্দের মধ্যে) ঃ

১। বাংলা বিষয়বস্তু প্রধান (objective) প্রবন্ধ ধারার উদ্ভব ও পরিপুষ্টির পেছনের কারণগুলি নির্দেশ করুন।

২। বাংলা বিষয়বস্তু প্রধান (objective) প্রবন্ধের ধারাটিকে কি কি ভাবে বিভক্ত করা যায়?

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের পূর্ণ পরিচয় এবং প্রবন্ধকার রূপে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করুন।

৫। কাব্য এবং নাটকের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে পার্থক্যের কথা বলেছেন, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিন। Reading drama এবং stage drama র মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৬। বঙ্কিম-প্রবন্ধে আলোচিত সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬৯.১০ মূলপাঠ ঃ 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক, সেখানে নামও পৃথক হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না। অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পরিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি-স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক পৃথক দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপেপ গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; আগের গীতিকাব্য রচিতই হতে লাগল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চন্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যকতির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যকত্বি এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেক বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ে উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জ্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ

তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; বক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। শেকসপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলার মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যর্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখা যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেকস্‌পীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্র সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমনত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

৬৯.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'গীতিকাব্য' ('অবকাশরঞ্জিনী' নামে 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত। বৈখাখ, ১২৮০। এটি নবীনচন্দ্র সেনের একটি গতিকাব্য সঙ্কলন। এই গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষে এটি লিখিত) প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয়, তখন 'লিরিক' বা গীতিকবিতা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির মনে কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে গীতি কবিতা সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে আলোচনা শুরু করতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি অতি সুন্দর ভাবে গীতিকবিতার একেবারে মূল ধারণায় গিয়ে পৌঁছেছেন। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ গীতিকবিতাকে যে Lyre (Lyra). বীণাজাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গেয় রচনা বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রথমেই উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকেই তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। মূলত গ্রীকগণ ছিল এই ধারণার পরিপোষক। Lyre (Lyra) থেকেই Lyric শব্দের উদ্ভব হয়েছে। ভাবের দিক থেকে পাশ্চাত্য জগতে গীতিকবিতাকে Reflexive বা 'আত্মবাচক' বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একেই বলেছেন 'আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়'। গীতিকবিতার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভা ও সাহিত্য রসবোধের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের মনের তাবৎ ভাবকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছেন ঃ বক্তব্য এবং অব্যক্তব্য। ব্যক্তব্য অংশ নাট্যকারের ক্ষেত্র; অব্যক্তব্য অংশ লিরিক কবির ক্ষেত্র। অর্থাৎ কবির 'আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়', অব্যক্তব্য বিষয়ই গীতিকাব্যের বিষয়। তবে, কেবল একা কবিরই আত্মবিষয়ক হবে, এমন কোন মানে নেই। তা একজন বক্তার আলোচ্য বিষয়ও হতে পারে। এই পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অতি সুন্দর এবং যথার্থ। কিন্তু সেই অব্যক্তব্য অংশের প্রকাশকাল ও প্রকরণ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট কোন আলোকপাত করেন নি। কিংবা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং প্রকাশকলার প্রকরণ অনুযায়ী গীতিকবিতার শ্রেণীবিভাগও তিনি করেন নি। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে বাংলা ভাষায় গীতিকবিতা নিয়ে এই আলোচনা করেছিলেন, সে সময়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করাও সম্ভব ছিল না। এই দিক থেকে বিচার করে আজ তাঁর প্রবন্ধটিকে আংশিকভাবে অসম্পূর্ণ বলে মনে হলেও তাঁকে আমরা দোষ দিতে পারি না।

একদা গীতিকবিতার স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, 'একটুখানির মধ্যে অনেকখানি ভাবের বিকাশ'। 'একটুখানি' কথাটির মধ্যে গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত সংহত-তীক্ষ্ণ-যথাযথ রূপগত পরিসরের কথাটি আছে। গীতিকবিতার এই বিশেষ রূপবন্ধটিকে সবার আগে লক্ষ করতে হবে। গীতিকবিতার প্রকরণ বা প্রকাশকলার প্রধান উপকরণ হল-ভাষা (শব্দ চয়ন, গীতিময় পদসৃষ্টি), ছন্দ এবং চিত্রকল্প। ভাবের তীক্ষ্ণতা ও প্রসারতা, গভীরতাকে ব্যক্ত করতে সরাসরি ভাষাভঙ্গী অপেক্ষা

চিত্রকল্পের আশ্রয় নিতে হবে। ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্প সবই হবে ভাবের প্রকৃত প্রকাশক এবং সেই কারণে অপরিহার্য। নিসর্গজগৎ গীতিকবিতার একটি বড়ো অবলম্বন। নিসর্গজগৎ গীতিকবির মনে নানা তত্ত্ব-ভাবনার সূচনা করে। গীতিকবির আত্মবিশ্লেষণের ফলে কখনো তিনি রোমান্টিক, কখনো বা মিষ্টিক।

আধুনিক যুগে গীতিকবিতার এক নতুন মাত্রা দেখা যাচ্ছে। এখানকার 'গীতিকবিতা' একদিকে পাঠ্য বটে অপরদিকে, সুর-সহযোগে তা গেয়ও বটে। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত 'গীতিঞ্জলি'র গান-কবিতাগুলি। মূলত এগুলি গান, গানরূপেই রচিত এবং সুরে সমর্পিত। কিন্তু কেউ ইচ্ছে করলে এ রচনাগুলিকে পাঠ্য কবিতারূপেও ব্যবহার করতে পারেন। আধুনিক গীতিকবিতার এই প্রয়োগ বা ব্যবহারিক দিকটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল গীতিকবিতার তত্ত্বগত দিকটির কথা বলেছেন। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে গীতিকবিতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি ব্যক্ত করা অবকাশ পাননি।

আদিতম গীতিকবিতার নিদর্শন মিলেছে ইজিপ্টের পিরামিড-সাহিত্যে অন্ত্যেষ্টির কালে রচিত শোকগীতিরূপে (খ্রী. পূ. ২৬০০)। মৃত রাজার প্রশস্তিরূপে কিংবা দেবতার প্রতি স্তোত্র রূপে। এই পর্বে মেষপালক ও জেলেদের গানও মিলেছে পরবর্তী কালে (খ্রী. পূ. ১৫০০) সমাধিফলকে উৎকীর্ণ গানও পাওয়া গেছে গীতিকবিতা রূপে। ইজিপ্শীয়দের মতো হিব্রু এবং গ্রীক লিরিকের জন্ম হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গ্রীক গীতিকবিতা গীত বা মন্ত্রবৎ উচ্চারিত হত, কখনও বা নৃত্যের সঙ্গে।

হোমারের রচনার মধ্যেও গীতিকবিতার বিষয় ও মানসভঙ্গির ইঙ্গিত আছে। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতকের আগে খাঁটি অর্থে গীতিকবিতার জন্ম হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীতে পিন্ডার (Pinder) প্রভৃতি গ্রীক কবিগণ এবং ইস্কাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস প্রভৃতি নাট্যকারগণ কিছু শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের গীতিকবিতা লেখেন। রোমান গীতিকবিগণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মচরিতমূলক গীতিকবিতা রচনায় প্রবণতা দেখিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় ৩০০ পর থেকে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন গীতিকবিতায় বিষয়বস্তুর বিস্তার এবং শিল্পগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেল। রেনেসাঁসের যুগে ইটালীতে পেত্রার্ক (Petrach) এবং ফ্রান্সের Ronsad গীতিকবিতার যুগের প্রবর্তন করেন, বিশেষত সনেট কবিতায়।

ইংলণ্ডেও গীতিকবিতার অনুশীলন চলতে থাকে। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে থেকে Restoration যুগ পর্যন্ত বহু ইংরেজ কবি গীতিকবিতা রচনা করেন। ষোড়শ শতকে এই ধরনের গীতিকবিতার সঙ্কলন বের হতে থাকে। সিডনি (Sidney), স্পেনসার (Spenser) শেকসপীয়ার, বেন জনসন (Ben Janson), হেরিক (Herrick), মিল্টন (Milton) প্রভৃতি এ যুগের গীতিকবি। এঁদের মধ্যে সিডনী, স্পেনসার এবং শেকসপীয়ারের সনেটধারা উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের কলিন্স (William Collins) এবং গ্রে-র (Thomas Gray) 'ওড' কবিতা গীতিকবিতার একটি বিশেষ ধারাকে সমৃদ্ধ করে। অষ্টদশ শতকের শেষের দিকে, রোমান্টিক পর্বে, গোটা ইউরোপেই গীতিকবিতার জোয়ার আসে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বার্নস (Burns) ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্লেক (Blake) কোলরিজ, বায়রন, শেলী, কীটস; জার্মানীতে গ্যেটে (Goethe), শিলার (Schiller); ফ্রান্সো ভিকটর হুগো (Victor Hugo), রাশিয়ায় পুশকিন (Pushkin) প্রভৃতি এঁদের মধ্যে আছেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের বোদলেয়র (Baudelaire) যিনি একজন সাংকেতিকতার প্রবর্তক, ফরাসীভাষায় তিনি কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখেন। অন্যান্য গীতিকবিদের মধ্যে আছেন ঃ য়েটস (W. B. Yeats), এজরা পাউন্ড (Ezra Pound), এলিয়ট (T. S. Eliot), অডেন (W. H. Auden) প্রভৃতি।

আমাদের বাঙলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারাটি খুবই সমৃদ্ধ। মূলত বিহারীলাল চক্রবর্তী খাঁটি অর্থে এই ধারার সূচনা করলেও, তাঁর আগে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অন্যান্য অসংখ্য কবি এদিকে লেখনী সঞ্চালন করেন। রবীন্দ্রনাথ এসে এই ধারার চরমোৎকর্ষ সূচিত হয়। এই পর্বের আর এক বৈশিষ্ট্য, বাঙালি মহিলা গীতিকবির রচিত গীতিকবিতার প্রচলন। এই সব মহিলা গীতিকবিদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন। দাম্পত্য প্রেম এবং গার্হস্থ্য ধর্ম এঁদের গীতিকবিতার মূল বিষয় ছিল।

৬৯.১২ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশের)

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশের বক্তব্যকে আমরা তিনটি ধারায় বিভক্ত করে নিতে পারি ঃ প্রথমত, 'গীতিকাব্য' নাম বা অভিধার অর্থ জ্ঞাপন, এর উদ্ভবের ইতিহাস ও স্বরূপ কথন ; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যকারের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব অনুসারে সাহিত্যের প্রকাশরীতির দিক থেকে, বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক তিন ধরনের কবি-সাহিত্যিকের কল্পনা ; এই ভাবনাটির মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূল দিক ধরা পড়েছে। তৃতীয়ত, দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধকারের মূল বক্তব্যকে বিশদ করা।

'গীতিকাব্য' এই সমাসবদ্ধ পদটির বিগ্রহবাক হল ঃ যা 'গীতি', তাই 'কাব্য'। 'গীতি'ও যা 'কাব্য'ও তাই। পাশ্চাত্য Lyric অভিধার বাংলা প্রতিশব্দরূপে বঙ্কিমচন্দ্র এটির প্রবর্তন করেছেন। 'গীতি' বলতে সংগীত ; 'সংগীত' বলতে কণ্ঠস্বরের বিশেষত্বের মাধ্যমে মনের কোন আবেগের প্রকাশ। আর 'কাব্য' হল-ছন্দোময় বাক্য। 'গীত' হওয়াই ছিল 'গীতিকাব্যে'র আদিম উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, গান গেয়ে না শোনালেও, কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই মনের আবেগকে প্রকাশ করতে পারে এবং তা আনন্দদায়কও বটে, তখন গান গাইবার দিকটি অপ্রধান হয়ে পড়ে। এইভাবে 'গীতিকাব্য' গেয় থেকে অ-গেয় অর্থাৎ নিছক আবৃত্তিযোগ রচনায় পরিণত হয়। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস প্রকাশ গানেরও লক্ষ্য, কাব্যের লক্ষ্য। গীতের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। এইভাবে যা গীতি তাই কাব্য—এই অভিন্নতার বোধে এসে পৌঁছান রসিকেরা।

দ্বিতীয় ধারায় বক্তব্যে এসে লেখক সাহিত্যের প্রকাশগত দিক এবং সাহিত্যকারের প্রকাশ ক্ষমতার দিকের কথা তুলেছেন। আমাদের মনের মধ্যে স্নেহ-শোক-ভয় প্রভৃতি নানা ধরনের ভাব থাকে। সাহিত্যের মধ্যে সেই ভাবগুলির সবটাই প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়, কিন্তু অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত থাকে। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রকাশ সাহিত্যরূপের (যথাঃ নাটক, গীতিকাব্য, মহাকাব্য) কথা তুলেছেন। মানুষের মনের যে সব ভাব ও আবেগ ব্যক্ত করা সম্ভব হয়, সেগুলি ধরা পড়ে নাটকের মধ্যে। পাত্র-পাত্রীর কথা ও কাজের মাধ্যমে ভাবের সেই প্রকাশ ঘটে। কিন্তু যে সব ভাব আবেগ প্রখাশ করা যায় না, ব্যক্ত হয় না, সেগুলির ক্ষেত্র হল গীতিকবিতা। নাটক ও গীতিকবিতার মধ্যে এটি একটি প্রধান পার্থক্যের দিক। এ দুয়ের মিশ্রণ অনুচিত, কারণ, নাটকের নাট্যকার নিজে নিজের কথা বলেন না, চরিত্রগুলির কথাই তুলে ধরেন (অবশ্য পরে যে 'কাব্য নাট্য'-এর উদ্ভব ঘটেছে তাতে গীতিকবিতার কিছু ধর্ম পাওয়া যায়)। আর মহাকাব্য হল,—মানুষের মনের ব্যক্ত-অব্যক্ত দু'দিকেরই প্রকাশস্থল। এইজন্য মহাকাব্য হল,—নাটক ও গীতিকাব্যের মিলিত দিক। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য—'গীতিকাব্য'। গীতিকবিতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য লেখক গীতিকবিতাকে মাঝখানে রেখে, তার একদিকে নাটক আর অন্যদিকে মহাকাব্যকে রেখেছেন। এইভাবে তিন ধরনের সাহিত্যরূপের পটভূমিকায় গীতিকবিতার বিশেষত্ব নিরূপণ করেছেন লেখক।

তাঁর বক্তব্যের তৃতীয় ধারায় এসে বঙ্কিমচন্দ্র উদাহরণ দিয়ে উল্লিখিত তত্ত্বটি বিশদ করেছেন। তিনি মহাকবি বাল্মীকি এবং নাট্যকার ভবভূতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এখানে। আলোচ্য বিষয়টি ধরা যাক সীতাবর্জন কালে এবং তারপরে রামচন্দ্রের মনোভাব। ভবভূতি নাট্যকার। কাজেই তাঁর 'উত্তররামচরিত' নাটকে রামচন্দ্রের মনোভাবের যে সব দিক প্রকাশযোগ্য বা ব্যক্ত করবার মতো কেবল সেই সীমাতেই তার আবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি নাট্যকারের সীমা লঙ্ঘন করে গীতিকবির রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন। অর্থাৎ, রামচন্দ্রের মনের যে সব দিক অব্যক্ত-অপ্রকাশযোগ্য, যা গীতিকবির ক্ষেত্র, তাও তিনি প্রকাশ করতে গেছেন। উল্টো দিকে বাল্মিকী মহাকবি। মানবমনের ব্যক্ত-অব্যক্ত-দুই ক্ষেত্রেই তার অধিকার। তিনি করেছেনও তাই। প্রবন্ধকারের অভিযোগ, নাটকের মধ্যে গীতিকবিতাকে এনে ফেলে ভবভূতি ঠিক কাজ করেননি। অবশ্য, একথাও তিনি বলেছেন, ঈষৎ মাত্রায় নাটকের মধ্যে গীতিকবিতার অনুপ্রবেশ সহনীয়। মানবমনের ব্যক্তব্য, বিষয়টি হল,—'পরসম্বন্ধীয়' ; আর, অব্যক্তব্য বিষয়টি—'আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়'। গীতিকবিতার বিষয় হল,—'আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়'।

৬৯.১৩ অনুশীলনী

ক. সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে ক'টি ধারায় বিভক্ত করা যায়?

২। 'গীতিকাব্য' পদটির বিগ্রহবাক্য বলুন।

৩। কোন্ পাশ্চাত্য শব্দের প্রতিশব্দ রূপে বাংলা 'গীতিকাব্য' অভিধাটি প্রদত্ত হয়েছে?

৪। সীতা বর্জন কালে রামচন্দ্রের মনোভাব ব্যক্ত করতে বাল্মীকি ও ভবভূতির শিল্পরূপের সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৫। 'পরসমন্বন্ধীয়' এবং আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়' বিষয় দুটির পার্থক্য বোঝান।

৬। 'বঙ্গদর্শনে'র কোন সংখ্যায় 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটি বের হয়? তখন এর নাম কি ছিল?

৭। আদিতম গীতিকবিতার নিদর্শন মিলেছে কোথা থেকে?

৮। ইংলণ্ডের কয়েকজন গীতিকবির নাম করুন।

৯। ঊনবিংশ শতকের কয়েকজন বাঙালি গীতিকবির নাম উল্লেখ করুন।

১০। ঊনবিংশ শতকের বাঙালি মহিলা গীতিকবিদের বিষয়বস্তু প্রধানত কি ছিল?

খ. বিশদ আলোচনা করুন ঃ

১। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে 'গীতিকাব্যে'র সংজ্ঞা দিন।

২। গীতিকবিতা এবং নাটকের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩। গীতিকবিতার রূপবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৪। পাশ্চাত্ত্য গীতিকবিতার ক্রমবিকাশের রূপরেখাটি তুলে ধরুন।

৬৯.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী পর্ব)—ড. সুকুমার সেন।

২) বাঙ্গালা প্রবন্ধ—ড. সুকুমার সেন।

৩) আধুনিক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারা—অধীর দে।

৪) সাহিত্য সন্দর্শন—শ্রীশ চন্দ্র দাস।

৫) J. A. Cuddon (সম্পাদিত)—A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.

একক ৭০ ❑ বিবিধ প্রবন্ধ ঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

৭০.১ উদ্দেশ্য
৭০.২ প্রস্তাবনা
৭০.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ও স্বদেশচেতনা
৭০.৪ বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-বিষয়ক রচনাবলী
৭০.৫ মূল পাঠ ঃ প্রবন্ধের প্রথমাংশ
৭০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭০.৭ সারাংশ-১
৭০.৮ অনুশীলনী-১
৭০.৯ মূলপাঠ ঃ প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ
৭০.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭০.১১ সারাংশ-২
৭০.১২ অনুশীলনী-২
৭০.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৭০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের—

- ইতিহাস ও স্বদেশচেতনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন;
- প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কীয় ইতিহাস জানতে পারবেন;
- বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৭০.২ প্রস্তাবনা

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮০ বঙ্গাব্দের ভদ্র মাসের সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে এটির নাম ছিল প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ/স্বাধীনতা'। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করবার সময় প্রবন্ধটির এই নাম পরিবর্তন ঘটে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথমদিকের প্রবক্তাগণের একজন হলেন—বঙ্কিচন্দ্র। তাঁর স্বাদেশিকতার সঙ্গে ইতিহাস চেতনা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রবন্ধটিতে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতার অবস্থার তুলনা করেছেন। তুলনার শেষে তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ঃ সাধারণ মানুষের অবস্থা, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-শাসনের কালেও যা ছিল, আধুনিক ভারতে ইংরেজের শাসনকালেও মোটামুটি তাই আছে। অবস্থার সামান্য হের-ফের হয়েছে দুই যুগের উচ্চবর্ণের মানুষদের। আমাদের এতদিন ধারণা ছিল প্রাচীন

ভারতের সব কিছুই ছিল ভালো। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিরপেক্ষ ইতিহাসবোধ দ্বারা চালিত হয়ে সে ধারণাটি ভেঙে দিয়েছেন। ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ভারতবাসী যে কোন-কোন দিক থেকে উপকৃত হয়েছে, তারও উল্লেখ তিনি করেছেন। অর্থাৎ লেখক উগ্র-স্বাদেশিকতা পছন্দ করেন না। লেখকের মতে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণরাই যেন এক নতুন রূপে, ইংরেজের বেশে ফিরে এসেছে। মনে রাখতে হবে, রচনাটি স্বাধীনতা বনাম পরাধীনতার তুলনা নয়; এটি হল, প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ভারতবাসীর সুখ-সুবিধার তুলনামূলক আলোচনা।

৭০.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ও স্বদেশচেতনা

বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমেই ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকঙ্ক্ষাটি প্রথম একটি সুনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বরূপ লাভ করে। তাঁর পূর্বে ভারতবাসীর মনে এ বিষয়ে যে কোনো সচেতনতা ছিল না, তা নয়। কিন্তু তার কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ যেন ভারতবাসীর মনের মধ্যে তখনো জেগে ওঠেনি। রেনেসাঁস বা নবজন্মের ফলে ভারতবাসীর মনের মধ্যে যে দেশচেতনার জন্ম হয়, এবং যার একটি দিক হয়, প্রাচীন ভারতের ভাবসম্পদকে পুনর্জাগ্রত করা, জাতীয় জীবনে তার নিয়োগ-প্রয়োগ করা, তারই একটি বিশেষ দিক বঙ্কিচন্দ্রের চিন্তা ও চেতনায় ধরা দেয়। স্বাদেশিকতার একটি বিশিষ্ট পথ রূপে স্বদেশের ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করা তিনি এক পবিত্র ও প্রধান কর্মরূপে গ্রহণ করলেন। বিদেশী শাসক ভারতবর্ষকে জানে না, তার ঐতিহ্যও তাদের অজানা। কাজেই, প্রথমেই জানতে হবে নিজ দেশের ইতিহাসকে এবং সেই লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমেই বিদেশী শাসকের কাছ থেকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে নিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এখানে গবেষকের, কর্মীর নয়। পরবর্তী কালে কর্মের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, এক অখণ্ডতা ও সংহতির বোধ নিয়ে ইংরেজের কাছে স্বাধীনতার দাবী করা হয়েছিল, বঙ্কিমের দৃষ্টিকোণ ছিল তা থেকে পৃথক। তিনি তাঁর বিস্তৃত পড়াশোনা, গবেষণা এবং কবির ও ঋষির ধ্যানদৃষ্টিতে প্রাচীন ভারত এবং আধুনিক ভারতের সাধারণ মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন; এবং সেই লব্ধ জ্ঞানকেই একদিকে দেশবাসীকে অপর দিকে বিদেশী শাসকবর্গকে জানাতে চেয়েছেন। নিজদেশবাসীকে যদি দেশের অতীত অবস্থার প্রকৃত পরিচয় না জানানো হয়, তবে দেশবাসিগণও স্বদেশ বিষয়ে সচেতন ও সক্রিয় হবে না; বিদেশীরাও অতীত ঐতিহ্যকে জেনে ভারতবাসীকে হেয় জ্ঞান করতে পারবে না। মুখ্যত এই কারণেই বঙ্কিচন্দ্রের ইতিহাস চেতনা এবং স্বদেশে চেতনা এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে।

কেবল প্রবন্ধেই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসেও ইতিহাস চর্চা করেছেন। তবে উপন্যাসে তাঁর ইতিহাসচর্চা অবশ্যই ভিন্ন ধরনে। বেশির ভাগ উপন্যাসে যেখানে তিনি ইতিহাসের পটভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা রোসা-রোমান্সরস সৃষ্টির জন্য। ইতিহাস এখানে একটি পটভূমিকা মাত্র। কিন্তু 'রাজসিংহ' উপন্যাসে তএার ইতিহাস-চর্চা ইতিহাসের দিকটিকে বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত করেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে যে সব বঙ্গীয় ও ভারতীয় জীবন সম্পর্কীয় ইতিহাস গ্রন্থ পাওয়া যেত, তার প্রায় সবই বিদেশীদের লিখিত। স্বভাবতই সে সব গ্রন্থ তথ্যের স্বল্পতা, তথ্যের বিকৃতি এবং একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট ছিল। উপরন্তু, সে সব ইতিহাসে সাধারণ মানুষের জীবন-কথা উপেক্ষিত হত। বঙ্কিচন্দ্র যে ইতিহাস চর্চার জন্য লেখনী ধারণা করেছিলেন, এটিও তার অন্যতম একটি কারণ।

তবে, তিনি যতোটা পেরেছিলেন-নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত হবার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি তার প্রমাণ। উগ্র স্বাদেশিকতাকে তিনি এখানে বর্জন করেছেন। যা কিছুই প্রাচীন ভারতীয়, তাই নির্দোষ একথা তিনি মানতে চাননি। তখনকার নবজন্ম-প্রাপ্ত ভারতবাসী প্রাচীন ভারতীয় জীবনের মধ্যে সবই ভালো বলে মনে করতে অভ্যস্ত ছিল। বঙ্কিচন্দ্র সেখানে এক নতুন ও পৃথক সুর ধরেছেন। নিরপেক্ষ ইতিহাস-চর্চা অর্থাৎ ইতিহাসকে একটি 'বিজ্ঞান' রূপে দেখা, তিনি তার ধারা পত্তন করলেন। একটি নিরপেক্ষ ও তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রাচীন ভারতের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিভূ ব্রাহ্মণগণই আধুনিক যুগে ইংরেজের রূপ ধরে যেন ফিরে এসেছে; সাধারণ মানুষের

সামাজিক আর্থিক অবস্থা সে যুগে যা ছিল, এ যুগে মোটামুটি তাইই আছে। শিক্ষার কারণে এযুগে শিক্ষিত মানুষের সামাজিক-আর্থিক অবস্থার কিছু হেরফের হয়েছে, এইমাত্র। এই মন্তব্য ও সিদ্ধান্তে তখনকার মানুষ নিশ্চয়ই সুখী হননি। তবু তিনি বাঙালিকে এই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন ঃ ইতিহাসকে 'বিজ্ঞান' রূপে দেখতে হবে; তথ্যের ও যুক্তির উপর নির্ভর করে একটি সামগ্রিক ও অখণ্ডদৃষ্টিকে আয়ত্ব করতে হবে; এবং স্বাদেশিকতার কারণে সে পথ থেকে সরে আসা চলবে না।

পরিশেষে, ইতিহাসচর্চার আধুনিক দুটি ধারার কথা বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক পরে, স্বাদেশিকতাকে একটি মুখ্য লক্ষ ধরে নিয়ে ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত ঘটে, বিদেশেই। দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগে সাধারণ জন-জীবন এবং সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের ('সাব অলটার্ন), ইতিহাসকে সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসচর্চার একটি প্রধান দিক বলে মনে করা হচ্ছে।

৭০.৪ বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-বিষয়ক রচনাবলী

মূলত সাময়িক পত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইতিহাস-বিষয়েক প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেছেন। কেউ যদি কালানুক্রমিক এবং ধারাবাহিকভাবে সেই প্রবন্ধগুলি সাজিয়ে নেন, তবে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিকোণের বিবর্তন এবং বিশেষত্বগুলি অনুধাবন করতে পারবেন। তাঁর গ্রন্থ-পাঠের বিস্তৃতি ছিল অপরিসীম, তারই ফল এই ধরনের প্রবন্ধ রচনা। নীচে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরণের রচনার নামোল্লেখ করলাম (পুস্তকাকারে প্রকাশকালে অনেক প্রবন্ধের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে; বক্তব্যও সম্পাদিত হয়েছে;)

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ ঃ স্বাধীনতা ঃ বঙ্গদর্শন ঃ ভাদ্র, ১২৮০

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ঃ বঙ্গদর্শন ঃ ভদ্র, ১২৮০। অগ্রহায়ণ, ১২৮২

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ ঃ রাজনীতি (প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ঃ শারদবাক্য) ঃ বঙ্গদর্শন ঃ আশ্বিন, ১২৮০

বাঙ্গালীর বাহুবল ঃ বঙ্গদর্শন ঃ শ্রাবণ, ১২৮১

আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প ঃ বঙ্গদর্শন ঃ ভাদ্র, ১২৮১

বঙ্গে দেবপূজা ঃ ভ্রমর ঃ অগ্রহায়ণ, ১২৮১

বাঙ্গালার ইতিহাস ঃ বঙ্গদর্শন ঃ মাঘ, ১২৮১

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ঃ বঙ্গদর্শন ঃ অগ্রহায়ণ, ১২৮৭

বাঙ্গালীর উৎপত্তি ঃ বঙ্গদর্শন ঃ পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র, ১২৮৭ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮

বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ঃ বঙ্গদর্শন ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯?

এই তালিকায় কেবল বিশুদ্ধ ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির উল্লে করা হল। কিন্তু সাংস্কৃতিক ও ভাষাসাহিত্যের ইতিহাস-ঘটিত প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা হল না। যেমন, 'মহাভারতের ঐতিহাসিকতা' (প্রচার ঃ ফাল্গুন-চৈত্র, ১২৯২) প্রবন্ধটির নাম করা হয়নি, 'ঐতিহাসিকতা' কথাটি থাকা সত্ত্বে। কেননা, আসলে এইট 'কৃষ্ণচরিত্রে'রই একটি অংশ।

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির নাম-মালার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে, বঙ্কিচন্দ্রের দৃষ্টি তখনও রাজনৈতিক দিক থেকে নিখিল ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়নি। 'আনন্দমঠে'র 'বন্দেমাতরম্' গানেও এই জন্য বঙ্গের তৎকালীন জনসংখ্যার কথা মনে রেখে 'সপ্তকোটী' লেখা হয়। 'গোরা' উপন্যাস থেক রবীন্দ্রনাথ নিখিল ভারতক পটভূমিকা করে রাজনীতির আলোচনা করত থাকেন। তবে একথা এখানে বিশেষবাবে উল্লেখযোগ্য যে নামে বাঙ্গালীর প্রসঙ্গ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিখিল ভারত (এবং প্রাচীন ভারতের) পটভূমিকাকে গ্রহণ করেছেন।

কেবল নিজ-লিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমেই নয়, 'বঙ্গদর্শনে'র পুস্তক সমালোচনা বিভাগেও অনেক ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থের যে সমালোচনা করা হয়েছে তার মাধ্যমেও একই মনোভাব প্রকাশিত। যেমন, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার'; কিংবা, রামদাস সেনের 'ঐতিহাসিক রহস্য' (দুটিই 'বঙ্গদর্শনে'র জৈষ্ঠ, ১২৮১)তে প্রকাশিত। কিংবা শ্রীকৃষ্ণ দাসের সভ্যতার ইতিহাস' (', জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪)। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে Col Mames Tod-এর Annalsl and Antiquities of Rajasthan গ্রন্থেরও সমালোচনা করা হয় (ঐ/বৈশাখ, ১২৮০)।

এইভাবে বঙ্কিচন্দ্র সার্বিকভাবে তাঁর ইতিহাস চেতনাকে ব্যক্ত করেছিলেন।

৭০.৫ মূলপাঠ ঃ প্রবন্ধের প্রথমাংশ

"মানুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে কিছুই দেখা যায় না। আমাদিগের গুরুতর দুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ। দুঃখও যে কেবল দুঃখ নহে, দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সুখ আছে।

ভারতবর্ষ পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল-এখন অনেক শত বৎসর হইতে পরাধীন। নব্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে, দুঃখই বা কি, সুখ কি।

কিন্তু স্বাধীনতা ও পারধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন্ বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারতস্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধীন, এ কথা বলিয়া কি উপকার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী?

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ, তাহাতে সংশয় কি, যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সদুত্তর পায়ো ভার।

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটির কথা শিখিয়াছেন— "Liberty" "Independence" তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দ এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে বা সিরাজদ্দৌল্লার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন-বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।

মহারাণী ভিকটোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংজে ছিলেন না। তাঁহারা জার্মান। তৃতীয় উইলিয়াম ওলন্দাজ ছিলেন। বোনাপার্টি কার্সিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন বুর্বোবংশীয় রাজারা ফরাসী ছিলেন। রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্বরজাতীয় সম্রাট আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতীয় ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন না, বলা যাইতে পারে। যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহাজাদা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দ্দি শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্ত্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার

শাসনকর্ত্তৃগণ স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না।

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি?

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজদের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমকজিত ব্রিটেন হইতে সিরিয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রসকল পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিয়ার্স বা জামেকা পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি পৃথক রাজ্য নহে, ভিন্ন দেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না-ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই। অন্য দেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনরূঢ় এবং অন্য দেশবাসী সেই দেশ পরতন্ত্র।

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র।

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথম জেমস্, স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন। স্কটল্যাণ্ড কি ইংলণ্ডকে রাজা দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপনপূর্ব্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন-তাঁহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিয়া পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন;—হানোবার কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল?

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম জেমস্ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের পূর্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে না। আমরা "Independence", শব্দের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতা এবং "Liberty" শব্দর স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাবসূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছি।

তবে পারতন্ত্র্য এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতায় প্রভেদ কি?

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা সে অর্ত অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। কেন না, সে অর্থ এই উপস্থাপিত। বিচারের উপযোগী নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষীয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব।

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতি পীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতি পীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পার; যথা নর্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতুবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্র্য-পারতন্ত্র্যজন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক—পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। রাজা অন্যদেশবাসী হইলে দুইটি অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা; প্রথম রাজা দূরে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহার অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দুরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী ভিকটোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষে শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত, তাহার সন্দেহ নাই; কেন না, যাহা রাজার নিকটবর্ত্তী, তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘটিতেছে ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের

দায়ী ভারতবর্ষ। "হোমাচার্জেস" বলিয়া যে ব্যয় বাজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষে ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অনেক আছে।

রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষেরগ সুশাসনের বিঘ্ন ঘটে বটে, কিন্তু তেমন রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র,-অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অর্থগৃধ্নু। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভ ারতবর্ষে দূরস্থিত রাজা বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হতি। পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখ বিধান করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উভয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্মসুখের অনুরোধ কোন অনিষ্ঠপাতের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার প্রভেধ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য এবং দেশীয় প্রজাসকল তাঁহাদিগের নিকট অবনত, তাঁহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশ যে ভারতবাসীদিগের সুখের লাঘব ঘটিয়া থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তুল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজান শূদ্র; উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শূদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের শাসনকর্ত্তা কিন্তু এ সকল কথা একটু সন্তিারে লেখা আবশ্যক হইল।

লোকের বিশ্বাস আছে যে প্রাচীন বারতে কেবল ক্ষত্রিই রাজা ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকার্য্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল ; রাজব্যবস্থা নির্বাচন, বিচার ইত্যাদি কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটারি, এই দুই অংশে রাজকার্য্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেই রূপেই ছিল। ব্রাহ্মণেরা সিবিল কর্ম্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরি। এখনও যেমন মিলিটরি অপেক্ষা সিবিল কর্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই সর্বদা রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদিগের উপরও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্বদা রাজা ছিলেন, এমন নহে। বোধ হয়, আদ্যকালে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য্য প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্র ব্রাহ্মণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত সঙ্করজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই- কেন না, তাঁহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, এবং কার্য্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকতরূপে রাজপুরুষপদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।

৭০.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

আধুনক ভারতবাসী 'Independence' কথাটির অর্থ 'স্বাধীনতা'ই করবেন এবং সেই অর্থেই গোটা ভারতবর্ষে আজ এটি চলিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই অর্থে Liberty শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই প্রকার পার্থক্যের প্রথা ছিল। কিন্তু আমাদের অন্য কথা মনে হয়। ফরাসি বিপ্লব বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল, নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই। কাজেই ফরাসী 'Liberte' (< ল্যাটিন Labertatis) শব্দজাত ইংরেজি 'Leberty' হয়তো এদিকে তাঁকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। স্বাধীনতা' অর্থে বঙ্কিমপ্রদত্ত Leberty শব্দটি হারিয়ে গেছে কেন, তাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাসতত্ত্বের কথা বলেছেন, সে ইতিহাসতত্ত্ব কাদের উদ্দেশ্যে লিখিত? সে কি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির জন্য? না কি সাধারণভাবে যে কোন বাঙালির জন্য? এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-চিন্তার কথাও ওঠে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর (ভারতবর্ষীয় সভা') সদস্য হন, তখন শিক্ষা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের মতভেদ উপস্থিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিম্ন স্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অর্থাৎ সমাজের উপরিস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটলে সেই শিক্ষাধারা চুঁইয়ে নীচের স্তরে পৌঁছবে, এই ধারণার দ্বারা চালিত হন এবং শিক্ষাকে কেবল সমাজের উপরিস্তরেই আবদ্ধ রাখতে চান। এখন বঙ্কিচন্দ্র প্রবর্তিতত এই ইতিহাস চর্চা ও চিন্তার ধারা, তখনকার পরিস্থিতিতে, কেবল যদি সমাজের উপরিস্তরেই আবদ্ধ থাকে, স্বভাবতই তবে তার প্রসারণ ঘটবে না। অবশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকশিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাতত্ত্বের কথা এবং তাঁর ইতিহাস চিন্তার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইতিহাসতত্ত্বের রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট কোন কর্মপন্থার উল্লেখ করেন নি, রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাত্র ও নবযুবকদের একটি কর্ম-নির্দেশ করে দেন ঃ প্রত্যেকের নিজ-নিজ অঞ্চল থেকে যা কিছুই ইতিহাসের উপকরণ ছড়ানো আছে, তাকে সংগ্রহ করে আনতে বলেছিলেন। তাঁর অন্যান্য ইতিহাস-বিষয়ক রচনার মধ্যে কবির ধ্যানদৃষ্টির সঙ্গে দার্শনিকের বোধ যুক্ত হয়ে এক অখণ্ড-সমগ্র দৃষ্টির নিদর্শন মেলে। অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচর্চার মধ্যে একটি তথ্যনিষ্ঠ তত্ত্ব ও যুক্তিময় দিক উপস্থিতি। একথা এই প্রসঙ্গে কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না, যে, একজন মূলত ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক; অপরজন মূলত কবি।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে একজন দক্ষ প্রশাসক ও অভিজ্ঞ বিচারক ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অধীনেই রাজকার্য করেছেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিল। প্রশাসক-বিচারকের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি প্রাচীন ভারতের রাজকার্যকে যেন পর্যবেক্ষণ করেছেন।

প্রবন্ধটির প্রথমাংশের রচনাগত বিশেষত্ব হল, ইতিহাসের প্রতিটি রাজ্য-রাজপাট-রাজা সম্পর্কে তথ্য এবং সেই তথ্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে দৃষ্টান্ত চয়ন। যেন লেখক এখানে বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন। স্বতন্ত্রও পরতন্ত্রতা—এই দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি যে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, তাতে তাঁর ইতিহাসবোধের সঙ্গে স্বাধীনতাবোধের মিশ্রণ ঘটেছে। বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীর মনের মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রশাসন সম্পর্কে যে অস্পষ্ট ও ভুল ধারণা ছিল, তাও তিনি ভেঙে দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণাধিকার সম্পর্কে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন, মুঘল-ভারতপ্রসঙ্গেও সমপ্রকার পর্যবেক্ষণ করলে প্রবন্ধটি সুসম্পন্ন হতে পারত। ইতিহাসের দিক থেকেও তা হত একটি অখণ্ড ও সমগ্রদৃষ্টির পরিচায়ক।

৭০.৭ সারাংশ (প্রথম অংশ)

"Independence" কথাটির অর্থ 'স্বতন্ত্রতা' এবং 'Liberty' কথাটির অর্থ—'স্বাধীনতা'। আপাতদৃষ্টিতে এই কথা দু'টি সমার্থক হলেও এই রচনায় একটি পারিভাষিক দিক থেকে লেখক এ দু'টির মধ্যে একটি পার্থক্যের রেখা টেনেছেন। 'স্বাধীনতা'র বিপরীতে যেমন আছে 'পরাধীনতা' তেমনি 'স্বতন্ত্রতা'র বিপরীতে আছে 'পরতন্ত্রতা'। কোন দেশের রাজা বা শাসনকর্তা ভিন্ন জাতীয় হলেই সেই দেশকে 'পরতন্ত্র' বলা যায় না; তেমনি আবার শাসনকর্তা স্বজাতীয় হলেই সে দেশকে 'স্বতন্ত্র' বলা যায় না। যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনরূঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ 'পরতন্ত্র'। দুটি রাজ্যের রাজা বা শাসনকর্তা একজন হলে একটি পরতন্ত্র, অন্যটি স্বতন্ত্র। যে দেশের রাজা বা শাসনকর্তা বাস করেন, সেটি 'স্বতন্ত্র' আর, যে দেশে রাজা বাস করেন না, সেই দেশ 'পরতন্ত্র'। অবশ্য, ইতিহাসে এই তত্ত্বের নানা বিপরীত এবং ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত মেলে। ওইসব বিপরীত দৃষ্টান্তের দেশে পারতন্ত্র্য ঘটেছিল কিন্তু পরাধীনতা ঘটে নি। স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার মধ্যে যেমন প্রভেদ আছে, তেমনি পরাধীনতা এবং পারতন্ত্র্যের মধ্যেও প্রভেদ আছে। এইদক থেকে বিচার

করলে কখনও কখনও পরতন্ত্র দেশকে স্বাধীন দেশ এবং স্বতন্ত্র দেশকেও পরাধীন দেশ বলা যায়। বিশ্বের ইতিহাস থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত সংকলন করে লেখক এই তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্ত্বটিকে প্রাচীন ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল। কিন্তু সেই প্রাচীন ভারতেরও পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতার অস্তিত্ব ছিল। লেখক প্রথমে পরতন্ত্রতার কথা বলেছেন। পরতন্ত্রতার ফলে দেশে দু'টি অনিষ্ট ঘটে। প্রথমত, রাজা যদি দূরে বা অন্যত্র বাস করেন, তবে প্রশাসনের ক্ষেত্রে নানা বাধা-বিঘ্ন দেখা দেয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে বাস করেন, সেই দেশের প্রতি তাঁর কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখা দিতে পারে; এর ফলে দুরস্থ রাজ্যের মঙ্গলহানি ঘটতে পারে; একই রাজার অধীনস্থ প্রজাদের অবস্থার তারতম্যও দেখা দিতে পারে। হয়তো সেই সব প্রজাদের কর-খাজনা বেশি পরিমাণে দিতে হতে পারে। রাজা দেশেই বাস করলে তাঁর ব্যক্তিগত দোষ-দুর্বলতা প্রজারা সাক্ষাৎ ভাবেই জানতে পারে। এর দ্বারা তারা নিজেরাও প্রভাবিত হয়।

পরতন্ত্রতার পর প্রবন্ধকার প্রাচীন ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরাধীন দেশের অবস্থানের কথা বলেছেন। ইংরেজ যেমন ভারতবাসীর উপর পীড়ন করে—ভারত ইংরেজের অধীন বলে—প্রাচীন ভারতে তেমনি উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষের উপর পীড়ন করত। তখন ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আধুনিক ইংরেজের মতো স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণই বৃহৎ সংখ্যক শূদ্রে উপর আধিপত্য করতেন। প্রাচীন ভারতের রাজকর্ম দুটি অংশে বিভক্তি ছিল। যুদ্ধ প্রভৃতির ভার ছিল ক্ষত্রিয়দের উপর; রাজব্যবথা নির্ধারণ ও বিচার কর্মের ভার ছিল ব্রাহ্মণদের উপর। ক্ষত্রিয়গণই রাজা হবেন বটে, কিন্তু কার্যকালে ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য থাকত। আবার সব সময়েই ক্ষত্রিয়গণও রাজা হতেন। বৌদ্ধ যুগে মৌর্য প্রভৃতি সঙ্কর জাতির রাজারও দেখা গেছে। কাজেই বলা যায়, প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়দের প্রভাব চিরকাল সমান ছিল না। অথচ, ব্রাহ্মণদের গৌরব কখনও লঘু হয়ে পড়েনি। তার কারণ, ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন পণ্ডিত, সুশিক্ষিত এবং কার্যক্ষম। কাজেই প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন প্রকৃত রাজপুরুষ এবং নীচ বর্ণের মানুষের প্রতি পীড়নকারী;—আধুনিক যুগে ইংরেজ যেমন সাধারণ ভারতবাসীর উপর করে থাকে।

৭০.৮ অনুশীলনী-১

ক. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। প্রবন্ধটি কোন নামে এবং 'বঙ্গদর্শনে'র কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়?

২। প্রশাসক রূপে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এ যুগের কাদের তুলনা করেছেন লেখক?

৩। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচর্চার বিশেষত্ব কী?

৪। আধুনিক ইতিহাসচর্চার দু'টি ধারার উল্লেখ করুন।

৫। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত, ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ সমালোচনার দুটি নিদর্শনের উল্লেখ করুন।

৬। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে Independence এবং Liberty-এই কথা দুটির ব্যাখ্যা করুন ও অর্থ বলুন।

৭। প্রবন্ধটির রচনাগত বিশেষত্ব প্রসঙ্গে মন্তব্য করুন।

খ. নীচের প্রশ্নগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করুন ঃ

১। ইতিহাস চর্চা নিয়ে বঙ্কিচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটি তুলে ধরুন।

২। বঙ্কিচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে স্বদেশচেতনা কিভাবে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করে বোঝান।

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-বিষয়ক কয়েকটি রচনার নামোল্লেখ করুন।

৪। প্রাচীন ভারতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে পরাধীনতার নিদর্শন কিভাবে মেলে?

৭০.৯ মূলপাঠ ঃ প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর?

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত; আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই রূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজনিত; রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কার্য্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজ-শাসিত ভারতে, এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্ত্তমান ছিল দেখা যাউক।

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য। কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট?

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন "রামরাজ্যে" তিনি কোথা থাকিতেন?

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজই প্রাপ্য, কিন্তু কিয়ৎপরিমাপে দেশীয়েরাও উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন শূদ্র, কখন কখন রাজসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শূদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করত তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচারকার্য্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে,—প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচারকার্য্য শূদ্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে, একথা স্থির বলিতে পারিনা। অনেক বিচারকার্য্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদসকলও যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয়।

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে; কেন না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি-ইংরেজরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে-আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না-জাতীয় গুণে স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক।

তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতার যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর এক দিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লেকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে পুণরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে।

১। ভিন্নজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।

ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

বিদেশেনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৩। কিন্তু তুলনায় উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা কি পরিমাণে দুঃখী তাহাই বিবেচ্য।

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গালার্থ শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশের অমঙ্গাল ঘটাইয়া থাকেন কি না? স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎকারণে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গাল ঘটিতেছে বটে।

কিন্তু রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না।

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল।

৬। আধুনিক ভারতে কার্য্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার অপূর্ব স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমারা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব— সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণত প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।

৭০.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

ইংরেজ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন অনেক ভারতীয়ই বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। ভারতবাসীর মধ্যে তখন সুস্পষ্ট দুটি মনোবাব দেখা যেত ঃ একদিকে ছিল উগ্রস্বাদেশিকতার কারণে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ; অপর দিকে প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজের পদলেহন। আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সুস্থ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির সমর্থক। প্রাচীন ভারতের শাসকগণ, ব্রাহ্মণের রূপ ধরে যেমন সাধারণ মানুষের উপর পীড়ন-অত্যাচার করত, আধুনিক যুগে ইংরেজ সেই একই কাজ করে। বরং দণ্ডবিধি ও ন্যায় বিচারের দিক থেকে এ যুগের ভারতীয়গণ প্রাচীন ভারতের তুলনায় বেশি সুযোগ

পাচ্ছে। ইংরেজের বিচার ও শাসনব্যবস্থা প্রাচীন ভারতের তুলনায় অনেকটাই নিরপেক্ষ। সেই দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের প্রশংসা করেন।

প্রসঙ্গটি তিনি এই প্রবন্ধের পরবর্তীকালে, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেও তুলেছেন। ভারতবাসীর সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য কিছুদিন ইংরেজের এ দেশে শাসকরূপে থাকার দরকার বলে তিনি জানিয়েছেন। স্বভাবতই উগ্রস্বাদেশিকগণ এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা করেছিলেন। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তিনি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করেন।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিচন্দ্রের স্বাদেশিকতা ব্যক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পথে। ইংরেজের বিচার ও শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেও, যেখানে প্রতিভাধর ভারতবাসীরা প্রশাসনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছেন না ফলে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হতে পারছে না, জাতীয় প্রতিভার সেই অকারণ অপচয়ের মধ্যেই তিনি তাঁর স্বাদেশিকতাকে ব্যক্ত করেছেন। জাতীয় প্রতিভার এই অকারণ অপচয়ের ফলেই সমগ্র ভারতের উন্নতিও যেখানে ব্যাহত হচ্ছে,— সেটাই তাঁর আক্ষেপের মূল কারণ।

ইংরেজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বিশেষ ভাবে তুলনীয়। বঙ্কিচন্দ্রের মৃত্যুর কিছু কম অর্ধ শতক পরে রবীন্দ্রনাথেরও মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কালে সেই আস্থা-বিশ্বাস অনেকটাই বিগত। রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকটে' রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, ইংরেজের প্রতি তাঁর সব বিশ্বাস 'দেউলিয়া' হয়ে গেছে। ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই করেছেন; আমাদের বক্তব্য শুধু এই অর্ধশতকের ব্যবধানে, ইংরেজ সম্পর্কে দুই মনীষীর আস্থা-বিশ্বাসের পার্থক্য ঘটে গেছে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ নয়, প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, একটি ঐতিহাসিক সত্যকে যাচাই করা। সেটি এই ঃ "প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না?" স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি তাই স্বভাবতই এখানে গৌণ ও অপ্রধান। কেবল প্রসঙ্গের আকর্ষণে যতটুকু এসেছে, ততটুকুই। তবে, বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার একটি সংযোগ আছে বলেই আমরা স্বাধীনতার কথাটিও প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচনা করেছি।

প্রবন্ধের উপস্থাপনা সম্পর্কে পূর্বেই একবার মন্তব্য করেছি। এখন পুনরাবৃত্তি করে বলা যায়, প্রথমে একটি তত্ত্বের উথাপন পরে সেই তত্ত্বটিকে প্রাচীন ভারতের প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে। পরিশেষ মোট ছয়টি সূত্রে আকারে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সংক্ষেপে আবার বলেছেন। এতে প্রবন্ধের মূল বক্তব্যটি পাঠকের মনে সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৭০.১১ সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-শূদ্রদের মধ্যে যে ভেদ ছিল, আধুনিক ভারতবর্ষের ইংরেজ-ভারতবাসীর বৈষম্যের সঙ্গে লেখক তার তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। রাজা যদি ভিন্ন জাতীয় হন,তবে দু'টি কারণে রাজা-প্রজার মধ্যে বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক, আইন-ব্যবস্থার পার্থক্য; রাজার নিজ জাতীয়দের জন্য এক প্রকার দণ্ডবিধি-কিন্তু শাসিত প্রজাগণের জন্য ভিন্ন দণ্ডবিধি। দুই রাজার অনুগ্রহ তাঁর নিজ জাতীয়গণ পেল, কিন্তু শাসিতপ্রজাগণ বঞ্চিত হল। লেখক তুলনা করে দেখাচ্ছেন, এই দুই দোষের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ-শাসিত ব্যবস্থার তুলনায় আধুনিক ইংরেজ-শাসিত ভারতে দোষের প্রকার-পরিমাণ অনেকটাই কম; বরং প্রাচীন ভারতেরই তা ছিল বেশি। ইংরেজেরে বিচার-ব্যবস্থায় দেখা যায়, একজন ইংরেজ বিচারক-কর্তৃক দণ্ডিত হতে পারে বটে, কিন্তু একজন ইংরেজ একজন ভারতীয় বিচারক কর্তৃক দণ্ডিত হতে পারে না। বৈষম্য কেবল এইটুকুই। নয়তো আইন ও দণ্ডবিধি কি ভারতীয়ের পক্ষে কি ইংরেজের পক্ষে— একই। হত্যাজনিত অপরাধের শাস্তি ইংরেজেরে যা, একজন ভারতীয়েরও তাই। কেবল বিচারালয় পৃথক। কিন্তু প্রাচীন

ভারতে শাসক-শাসিতের দণ্ডবিধির মধ্যেই ছিল বিরাট বৈষম্য। যেমন, শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডবিধির মধ্যে বৈষম্য ছিল। সুতরাং বিচার-ব্যবস্থা এবং দণ্ডবিধির দিক থেকে ন্যায়-নিরপেক্ষতা ব্রাহ্মণ-শাসিত প্রাচীন ভারতের তুলনায় ইংরেজ-শাসিত আধুনিক ভারতে অনেক বেশি।

অতঃপর প্রবন্ধকার দ্বিতীয় দোষটির কথা বলেছেন। ইংরেজের রাজত্বে ভারতীয়গণ রাজকার্যে যতটুকু সুযোগ পায়, ব্রাহ্মণ-শাসিত প্রাচীন ভারতে শূদ্রগণ কোনমতেই ততটুকু সুযোগ পেত না। ইংরেজ শাসনে প্রাথনিক বিচারকার্য প্রায় ভারতীয় বিচারকগণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। প্রাচীন ভারতে কিন্তু প্রাথমিক বিচারকার্য কখনওই শূদ্রদের দ্বারা হতে পারত না। কি বিচারপতি, কি সেনাপতি কিংবা অন্য কোন উচ্চপদে কর্মচারী নিযুক্তকরণের ক্ষেত্রে কেবল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রাই প্রাধান্য পেত, শূদ্রের কোন সুযোগই এ বিষয়ে ছিল না। শূদ্র ব্রাহ্মণের দ্বারাই পীড়িত হোক, আর ইংরেজের দ্বারাই পীড়িত হোক—পীড়নের প্রকার দুই ক্ষেত্রে একই। অধিকাংশ ভারতবাসীর কাছে দুই অবস্থা তুল্যমূল্যের। তাদের অবস্থা প্রাচীন ভারতে যেমন ছিল আধুনিক ভারতেও তেমনি আছে।

তবে, উচ্চবর্ণের শিক্ষা-বুদ্ধি-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলায় একথা খাটে না। প্রাচীন ভারতে তারা যে সুযোগ পেতেন, আধুনিক ইংরেজ-শাসিত ভারতে হয়তো সেই পরিমাণে সুযোগ তাঁরা পাচ্ছেন না; রাজ্য রক্ষা এবং রাজ্যপালনের ক্ষেত্রে হয়তো তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত হচ্ছেন না। এর ফল জাতীয় স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, জাতীয় গুণের স্ফূর্তিলাভ হচ্ছে না। সে জন্য পরাধীনতা ভারতের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। অবশ্য, অপরদিকে ইংরেজ শাসনের সুফলও আছে ঃ ইংরেজের অধীন না হলে ভারতবাসী ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ থাকত।

৭০.১২ অনুশীলনী-২

ক. নীচের প্রশ্নগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন ঃ

১। প্রাচীন ভারতে রাজা যদি ভিন্ন জাতীয় হতেন তবে প্রশাসনের ক্ষেত্রে কি কি দোষ দেখা দিতে পারত?

২। এই প্রবন্ধটির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী?

৩। ইংরেজেরে বিচার-ব্যবস্থার বিশেষত্ব কী?

৪। শাসক রূপে ইংরেজ না এলে এদেশের কী ক্ষতি হত?

৫। ভারতীয় কর্মচারীরা ইংরেজের রাজত্বে যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃতি না পাবার ফলে দেশের ক্ষতি কিভাবে হচ্ছে?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ আলোচনা করুন ঃ

১। ইংরেজের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের তুলনা করুন।

২। প্রাচীন ভারতের রাজকর্মে শূদ্রগণের সুযোগের সঙ্গে ইংরেজের রাজত্বে শূদ্রগণের সুযোগের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে (পরবর্তী সংস্করণে) ইংরেজ সম্পর্কে বঙ্কিচন্দ্রের মনোভাবটি ব্যাখ্যা করুন।

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার কোন্ পরিচয় প্রবন্ধটিতে মেলে?

৫। প্রবন্ধটির উপস্থাপনা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

একক ৭১ ❑ কালান্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

৭১.১ উদ্দেশ্য
৭১.২ প্রস্তাবনা
৭১.৩ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য
৭১.৪ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ
৭১.৫ মূলপাঠ-১
৭১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭১.৭ সারাংশ-১
৭১.৮ অনুশীলনী-১
৭১.৯ মূলপাঠ-২
৭১.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭১.১১ সারাংশ-২
৭১.১২ অনুশীলনী-২
৭১.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৭১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

- প্রবন্ধ রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- তাঁর ইতিহাসবোধ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন;
- তাঁর স্বাদেশিকতা ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৭১.২ প্রস্তাবনা

'কালান্তর' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'পরিচয় পত্রিকার ১৩৪০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের সংখ্যায়। বর্তমানে প্রবন্ধটি লেখকের কালান্তর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এটি লিখেছেন। কাজেই আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত মতামত এতে পাওয়া যাবে।

প্রবন্ধটি মূলত বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিকায় লিখিত। কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ যে সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, আলোচ্য প্রবন্ধটি তারই প্রমাণ। প্রবন্ধটির রচনাকালীন বিশ্বরাজনীতি এবং ভারতীয় রাজনীতি প্রত্যক্ষ ছাপ এতে বর্তমান। ভারতীয় রাজনীতি তখন এক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে চলছিল। এই সন্ধিক্ষণটিকেই 'কালান্তর' নাম দিয়েছেন। 'কালান্তর' কথাটির বর্তমান প্রসঙ্গে অর্থ হল ঃ এক যুগ বা 'কাল' অতীত হয়ে গিয়ে আর এক যুগ বা 'কালে'র আগমন বা প্রবর্তন। 'কালান্তর' গ্রন্থে (১৯৩৭) কালান্তর বলতে ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্বের পরাধীন মানুষের নবচিন্তার সূত্রপাত বলে মনে করা হয়েছে। প্রবন্ধটির রচনার পটভূমিকা হল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) বেশ কিছুটা পরবর্তীকালের। এই কালপর্বে বিশ্বের দু-একটি রাষ্ট্র পরাধীনতা থেকে মুক্ত হল। স্বভাবতই ভারতবাসীর মধ্যেও এক আশার সঞ্চার হল। নিখিল বিশ্বের এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে, ইংরেজ ভারতবাসীর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের

কোন চেষ্টাই করল না। অথচ ইংরেজের কাছে ভারতবাসীর প্রত্যাশা ছিল অনেক। মুসলমান আমল এবং ইংরেজ আমলের শাসন-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, মুসলমান শাসনকগণের তুলনায় ইংরেজ অনেক উদার, শাসিতগণের স্বাধিকার সম্পর্কে সচেতন। ইংরেজ ভারতবর্ষে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছে ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতা সম্পর্কে তখন অনড় মনোভাবের পরিচয় দিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার প্রত্যাশায় ভারতবাসীর মনে যে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজ যদি মনোভাবে সাড়া না দেয় তবে তা ইংরেজের পক্ষেও যুগোচিত কর্ম হবে না। এই প্রবন্ধটির সঙ্গে লেখকের জীবনের শেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট'-এর ভাবগত মিল আছে। এখানে যাকে বলেছেন 'কালান্তর', সেখানে তাকেই বলেছেন 'সংকট'। দুই প্রবন্ধের এই ভাবগত ঐক্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৭১.৩ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য একান্ত ভাবেই তাঁর নিজস্ব ভাবকল্পনা এবং প্রকাশরীতির কথা। তিনি মূলত কবি। সকলেই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর প্রবন্ধের গদ্যে, রূপক উপমা চয়নে, শব্দ নির্বাচনে, প্রবন্ধের উপস্থাপনায় ও কায়া গঠনে আপন কবি সুলভ ভাবাদর্শকেই মুখ্য করে তুলেছিল। 'প্রবন্ধ' নামটিকেও তিনি বিশেষ এক অর্তে ব্যবহার করেছেন। যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'প্রবন্ধ' অভিধাটি ব্যবহার করেছেন ঠিক সেই অর্থেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'প্রবন্ধ' অভিধার প্রয়োগ করেন নি। 'প্রবন্ধ' বলতে সাধারণত আমরা যে যুক্তি-তর্কের কঠিন বন্ধনকে মনে করি লেখকের হৃদয়ের উত্তাপ যাতে একেবারেই নেই, -রবীন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধ' সেখানে ভিন্ন প্রতিবেশ রচনা করে, পাঠককে দেয় বিশুদ্ধ সাহিত্য পাঠের আনন্দ। এমন কি, তিনি যখন কোন সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন, কিংবা কোনো রাজনৈতিক প্রবন্ধ তখনও তাঁর ভাবোদ্দীপক কল্পনা শঙ্কিত এবং শিল্পীর হৃদয়ের উত্তাপ আমরা অনুভব করি। এ তাঁর যেমন প্রশংসা, তেমনি অনেকেই আবার মনে করেন, খাঁটি প্রবন্ধকার হিসেবে এখানে তিনি তেমন সফল নন। এই কথা তাঁর নাটক সম্পর্কেও শোনা যায়।

'ভারতী', 'সাধনা', 'প্রবাসী', 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'ভাণ্ডার' 'সবুজ পত্র' 'বিচিত্রা', প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকাটিতে তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। সমসাময়িক নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক প্রসঙ্গ নিয়ে এই সব পত্রিকায় জীবনের প্রথম দিক থেকে শেষ দিক পর্যন্ত প্রবন্ধ লিখে গেছেন। কোন একটি বিশেষ বা বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে সে বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত মত গ্রহণ করা চলবে না। তাঁর বক্তব্যকে বিচার করতে হবে ক্রমবিকাশের ধারায় বিন্যস্ত করে নিয়ে। তা যদি না করা হয়, তবে তাঁরগ উপর অবিচার করা হবে।

তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর অন্ত নেই। কোন বিষয় নেই, যা নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন নি। সাহিত্য, সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্য সমালোচনা (প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের), লোকসাহিত্য, ছন্দ, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভ্রমণকাহিনীমূলক প্রবন্ধ, পত্র–প্রবন্ধ, আত্মস্মৃতি ও আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধ সবদিকেই তিনি তাঁরলেখনী সঞ্চালন করেছিলেন।তাঁর সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সেগুলিতে যেন তাঁর নিজেরই সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সে কথা কখনও প্রকট হয়ে উঠে সাহিত্যিক দিক থেকে কোন বিঘ্নের সৃষ্টি করে নি। তাঁর লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তিনি দেশের সাহিত্যের ভিত্তি অন্বেষণ করেছেন। তাঁর স্বাদেশিকতারও পরিচয় এগুলি। তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তাও উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি যেমন জাতীয়তাবাদী তেমনি আধুনিক মনস্ক। শান্তিনিকেতনে তিনি যেমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন তেমনি নিজেই শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণও হয়েছেন। এই শিক্ষা যাতে ছাত্রদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি গ্রামীণ অর্থনীতিকে এবং সমবায় প্রথাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামজীবনই ছিল তাঁর অর্থনীতির আলোচনার মূল প্রেক্ষাপট। আবার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে (যেমন 'স্বদেশ', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি গ্রন্থে) তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, একটি অখণ্ডতার দর্শনের প্রতি। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন পূর্বাপর ভারতীয় ইতিহাসকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন। জাভা, জাপান, পারস্য, রাশিয়া- যেখানেই তিনি ভ্রমণ করতে গেছেন, সেখানেই তিনি মানুষকে খুঁজেছেন—কোনো দেশকালের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নয়, তাকে দেখেছেন চিরন্তন সত্যের আলোকে সেখানে যে সব ক্ষেত্রে ফাঁক-ফাঁকির অসঙ্গত দিক আছে, তাঁর দৃষ্টিতে

তার সবই ধরা পড়েছিল। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাধু এবং চলিত-দুই ভাষারীতিই গ্রহণ করেছেন। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও তিনি এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেন এবং বহু লেখক সেই রীতির অনুসরণ করে নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর নিজস্ব মনন ও অধ্যাত্মদৃষ্টির সম্মিলন। এই অধ্যাত্মদৃষ্টির মূল ভিত্তি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শ হলেও তিনি তার মধ্যে যুক্ত করেছেন আপন উপলব্ধির অভিজ্ঞতা। তাঁর কবিদৃষ্টি এখানেও ক্রিয়াশীল হয়েছে। হয়তো পিতা দেবেন্দ্রনাথ এদিকে তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা এতোই অধিক যে, এই প্রবন্ধ ধারার মাধ্যমে বাঙালির মনন-মনীষা এবং সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস যেন স্বতই ধরা পড়েছে। প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহে'র ভূমিকায় (১৯৫২) অতুলচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেন ঃ "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ।....এরকম প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে দুর্লভ," প্রবন্ধের মধ্যেও তিনি কোথাও-কোথাও অতি সূক্ষ্ম হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর প্রবন্ধকে বিশুদ্ধ সাহিত্যরসে সিঞ্চিত করে তুলেছে।

৭১.৪ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ

যে বুদ্ধি-মনীষা, উদার মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতা, কবিজনোচিত প্রকাশভঙ্গিমা, ইতিহাস চেতনা ও সুস্থ জীববোধ তাঁর অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধের মধ্যে প্রতিফলিত, তা রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধমালার মধ্যেও দেখা যাবে। এইখানেই তাঁর মানসের ঐক্য ও অখণ্ড তার দিক-সব বিষয়ের প্রবন্ধের মধ্যেই একটি চিন্তাসাম্য ও ভাবগত ঐক্য তিনি পূর্বাপর রক্ষা করে গেছেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর রচনাকালে তিনি কিন্তু কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না; আপন চিন্তা ও মতবাদ দ্বারা তিনি এক্ষেত্রে চালিত হয়েছেন। এইজন্য তখনকার অনেক মান্য নেতার সঙ্গে তার মতভেদ দেখা দিয়েছিল, যেমন, চরকা-আন্দোলন বা অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এক সময়ে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়েও নিয়ে গিয়েছিলেন,—'একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা' বলে নিজের সাহিত্যক্ষেত্রে ফিরে গিয়েছিলেন। মূলত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫ খ্রীঃ), স্বদেশী আন্দোলন, শাসন ব্যাপারে ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগিতা, সন্ত্রাসবাদ—প্রভৃতি নিয়েই তখন ভারতীয় রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথ এই সব প্রসঙ্গ (issue) গুলিকে যেমন তাঁর কাব্যে-গান-নাটকে-উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন, নিজের চিন্তা অনুসারে, তেমনি এই সব বিষয়গুলিকেই তাঁর প্রবন্ধমালায় সম্যকরূপে তুলে ধরেছেন। জাতীয় জীবনের এই প্রসঙ্গগুলি আজ ইতিহাসে পরিণত, দূরের থেকে সেগুলির ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করা আজ যত সহজ, সমকালীন জীবনে কিন্তু তা করা ততখানি সম্ভব ছিল না। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তব্যকে তখনকার ঘটমান ঘটনার আলোকে বিচার না করে, একটি ঐতিহাসিক সামগ্রিকতা ও অখণ্ডতার আলোকে বিচার করা উচিত। 'কালান্তর' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ঃ

"যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।....রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে।" রবীন্দ্রনাথ বলেন, সেই 'ঐক্যসূত্রটি'কেই প্রথমে আবিষ্কার করতে হবে এবং পরে তারই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তখন ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা প্রসঙ্গে বই লিখলে রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিক্রিয়ায় একথা জানান।

ইতিহাসের দিক থেকে ভারতবাসীর জীবনে বহিরাগত শাসকরূপে প্রথমে মুসলমানগণ এবং পরে ইংরেজগণ আঘাত হানে। এই দুই শাসকবর্গের শাসনপ্রণালী এবং ভারতীয় জীবনে অভিঘাত প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলির একটি প্রধান আলোচ্য দিক। কিন্তু এই আলোচনা পর্যবেক্ষণের মধ্যে একদিকে যেমন শাসকবর্গের প্রতি তাঁর

অশোভন বিদ্বেষ দেখা দেয় নি, তেমনি ভারতীয়গণের দিক থেকে কোনো উগ্রস্বাদেশিকতার পরিচয়ও দেন নি। এখানেই তাঁর রাজনীতিচর্চার বিশেষত্ব। তেমনি তাঁর সমকালীন বা প্রথম যুগের রাজনীতিবিদ্‌গণের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ মতগত পার্থক্য ছিল। ইংরেজের মানবতাবোধ, উদারতা ও ন্যায়বোধকে শ্রদ্ধা মান্য করে অনেক ভারতীয় রাজনীতিবিদের স্বাধীনতা অর্জনের মুখ্য পথ ছিল—ইংরেজের কাছে এজন্যে প্রার্থনা করা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ ছিল—'আবেদন-নিবেদেন'র রাজনীতি। এ রাজনীতিতে একদা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মেহাচ্ছন্ন ছিলেন, জীবনের শেষে তাঁর সেই বিশ্বাস' দেউলিয়া' হয়ে গেছে বলে নিজেই আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনের একটি সত্যকেও অনুধাবন করে নিতে পেরেছিলেন। ধরা যাক, নিজগুণে ইংরেজ একদিন ভারত ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তখন ভারতবর্ষকে সর্ব বিষয়ে, বিশেষত অর্থনৈতিক দিক থেকে যে স্বাবলম্বী ও স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবেই, নইলে দেশের অগ্রগতি বিনষ্ট হতে বাধ্য,—রবীন্দ্রনাথ সেই অবস্থা পরিস্থিতিটি কল্পনা করে নিয়ে পূর্বাহ্নেই ভারতবাসীর স্বয়ংভরতার দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই জন্য এই প্রসঙ্গ ধরে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা এই দুটি দিককে ভিত্তি করেছিল; এক, দেশের মানুষদের মনেই নানা সংস্কার, অনৈক্য, অশিক্ষা, আলস্য এবং আধুনিক চেতনার অভাব, যে অভাব ভারতবর্ষকে অগ্রগতির বদলে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। ইংরেজের অপশাসন অপেক্ষা দেশবাসীরই দোষ-প্রদর্শন রবীন্দ্রনাথের কাছে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। দুই, ইংরেজের শাসনপদ্ধতির মধ্যে যে এক পরিবর্তন এসেছিল, ন্যায় এবং মানবতাবাদী ইংরেজ যখন সর্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ধারক হয়ে উঠল, তখন সেই ইংরেজের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস রক্ষা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ইংরেজ যে কিছু প্রসাদ কণিকা দিয়ে ভারতবাসীকে সাময়িকভাবে শান্ত করতে চেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সে পথকে গ্রহণীয় বলে মনে করেন নি। ভারত ছেড়ে যাবার কালে ইংরেজ যে শিক্ষায়, অর্থনীতিতে অপুষ্ট অনগ্রসর এক দীন-হীন ভারতবর্ষকে পেছনে ফেলে রাখে যাবে, এ তিনি তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকেই অনুমান করেছিলেন। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেই ভারতবাসীকে আত্মশক্তিতে অধিষ্ঠিত হতে হবে এবং সেই আত্মশক্তিজাত স্বয়ংভরতাই ভারতবাসীকে খাঁটি স্বাধীনতা এনে দেবে। কাজেই, ইংরেজের কাছে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে স্বাধীনতা ভিক্ষা করা নয়, আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন তাঁর লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে কখনই উগ্রস্বাদেশিক হবার চেষ্টা করেন নি। উগ্রস্বাদেশিকতার মধ্যে দেশাত্মবোধের পূর্ব ও বিশুদ্ধ রূপের বিকাশ নেই, তা সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক এবং মানবতাবাদ থেকে দূরে অবস্থিত। এই একই কারণে তাঁর রচনার মধ্যে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষের বীজ ছড়ান নি, কিংবা ইংরেজের মাহাত্ম্যকেও তিনি ক্ষুণ্ণ করতে চাননি। ইংরেজের যে দিক প্রশংসার্হ, অকুণ্ঠচিত্তে যেখানে তিনি তাদের প্রচশংসা করেছেন। শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগ প্রদর্শন কিংবা সন্ত্রাসবাদকেও তিনি সমর্থন করেন নি। এইখানে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতভেদের কথাটিও উল্লেখযোগ্য। যে গান্ধীজীই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথেকে 'গুরুদেব' বলে আখ্যা দেন, সেই গান্ধীজীর সঙ্গে প্রবর্তিত চরকা আন্দোলন এবং অসহযোগিতাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি। যে কৃষক বছরের এক বিশিষ্ট সময় ব্যাপী কৃষিকর্ম করে, তাকে তার অবসরকালে সেই কৃষিরই উন্নতিসূচক এবং অর্থদায়ক কোন কর্ম দিতে হবে, চরকা নয়। অসহযোগিতার মধ্যে তিনি নেতিবাচকতাকে দেখেখেন, সৃষ্টিধর্মী কোন দিক এর মধ্যে তিনি দেখেন নি। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গটিকেও তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। দৈনন্দিন জীবন যাপনে, ভাষা ব্যবহারে, জাতীয় সংস্কৃতির চেতনার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যেন এই দেশকে আপন দেশ বলে মনে করেন এবং সর্বপ্রকার ঐক্য রক্ষা করেন। এই সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গটি আলোচনার মধ্যেও তাঁর উদারতা ও মানবিকতার দিকটি ধরা পড়েছে। রাজনীতির চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শেষে বিশ্বচারী হয়ে উঠেছেন। বিশ্বের যেখানেই মানবতা অপমানিত, স্বাধীনতা বিঘ্নিত, সেখানেই তিনি তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে নিজেকে উন্নীত করেছিলেন। তাঁর রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এই ঃ 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'সমূহ' (১৯০৮), 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১), মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'সমবায়নীতি' (১৯৫৪)।

৭১.৫ মূলপাঠ-১

কালান্তর

একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়াপড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগদ্বেষে, গল্পে গুজবে, তাসে-পাশায় এবং তার সঙ্গে ঘন্টা-তিনচার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিত্তানুশীলনের যে আয়োজন হত সে ছিল যাত্রা সংকীর্তন, কথকতা, রামায়ণপাঠ, পাঁচালি কবিগান নিয়ে। তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনী ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত। যে-জগতের মধ্যে বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বার বার হয়েছে আবর্তিতত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই সকল কঠিন সংস্কারের ইঁটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগত তাদের পরস্পরের সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।

বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে-মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্যসংগঠন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এই জন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর -এক বাঁধ মতের. রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যায় স্বাক্ষর পড়ে নি।—একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে পার্সি-পড়া স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ ছিল, এক মঙ্গলকাব্য আর-এক বৈষ্ণবপদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মসুলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিংবা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে, বৈষ্ণবগীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় পার্সি শব্দ জমেছে বিস্তর, তা ছাড়া সেদিন অন্তত শহরে, রাজধানীতে পারসিক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে, পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলেনি। তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করেনি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-ভাঙাভাঙি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি যাতে বাহিরেরর বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে। সেইজন্য পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।

তার পরে এল ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে—তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না কষে ভাগেরই অঙ্কফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর, তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা তালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সব চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।

ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ তে ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে

এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির' পরে ; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। এই চেষ্টা যে-ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম। আমরা য়ুরোপের কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত করে নিপুণ ভঙ্গিতে খোঁট দিয়ে থাকেন। একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্‌বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রবাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না—এই দেওয়া নেওয়ার প্রভাব সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে, চিত্ত জেগে আছে।

বর্তমান যুগে চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কী। একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেইখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে। সত্য সন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাত প্রতীয়মান সাদৃশ্যে প্রাচনি পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভেলাতে চায় নি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্মমভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছায় সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।

যদিও আমাদের চারদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্য করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ, মানুষেরক বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, যা অহেতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম, অণুতম, বৃহত্তম প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকা করতে চায়; এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্যের কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রমাণিকতা দাবি করতে পারে না।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে-আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা অপরাধের পঙ্‌ক্তি একই, তার শাসনও সমান— কোনো মুনি ঋষির অনুশসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ দৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ কথাটা এখনো আমরা সর্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই। সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে তাদেরও আজ দেবালয় প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও একদল লোক নিত্যধর্মনীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্ছেন, তবু সেই আপ্তবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ম জোর পাচ্ছে না। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজছে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জেরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।

মুসলমান-আমলের বাংলাসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন-শাসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি। সেই নিষ্ঠুর বলের হার-জিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা-অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হত। ধর্মের নিয়ম মেনে চলবে সাধারণ মানুষ, সেই নিয়মকে

লঙ্ঘন করবার দুর্দাম অধিকার অসাধারণের। সন্ধিপত্রের শর্ত অনুসারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে, কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে স্ক্র্যাপ্ অফ্ পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্ধা রাখে। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্ম-সাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্ব লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', এই কথাটার অর্থ এই যে জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর প্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেছে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্ত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবি। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজসাম্রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না যে, উইলিঙডনো বা জগদীশ্বরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ-শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে, এ কথা মনে করি নে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে এক জায়গায় ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানুভূমিতেই দাঁড় করিয়েছে।

যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম, যে জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য, তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; এ কথা ভুলে যায় যে ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব এক দিকে আমাদের সামনে এনছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের জন্যে যে কোনো চেষ্টা করছি, সেই এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে সকল দাবি আমরা কোনোদিন মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারি নি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকশা পেয়েছে, 'A man is a man for a' that।

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্তমান যুগে—অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারোশো খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় নাম দিয়ে এখনকার যুবকের হাসাহাসি করে থাকে। য়ুরোপের যে-অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বর্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অললক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ কথা কেউ সেদিন মনেও করে নি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উল্টে দিকে তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্মেশন যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনযুগে য়ুরোপ যে-মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাটসিনি-গারিবালডির বাণীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাডস্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতেরস্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে

স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর এক দিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসন-কর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম। কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি। মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়। অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ার সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবি, শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারে নি। তা হোক। আচণে পদে পদে প্রতিবাদসত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পুঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়ে নি। তবু য়ুরোপের বিদ্যা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমাদের মনের মধ্যে সম্মান পাচ্ছে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয় যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বে বলেছি, য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। এতে করেই সকল প্রকার অভাবত্রুটিসত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে। এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই আজ পর্যন্ত আমরা স্বজাতি-সম্বন্ধে দুঃসাধ্যসাধনের আশা করছি, এবং প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করছি সেই প্রবল পক্ষেরই বিচারের আদর্শ নিয়ে। বলতেই হবে এই চিত্তগত চরিত্রগত সহযোগ ছিল না আমাদের পূর্বতন রাজদরবারে। তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই মূলগত দূরত্ব ছিল যাতে করে আমরা আকস্মিক শুভাদৃষ্টক্রমে শক্তিশালীর কাছে কদাচিৎ অনুগ্রহ পেতেও পারতুম, কিন্তু সে তারই নিজ গুণে, বলতে পারতুম না যে, সার্বজনীন ন্যায়ধর্ম অনুসারেই, মানুষ বলেই মানুষের কাছে আনুকূল্যের দাবি আছে।

৭১.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রবন্ধ গ্রন্থ 'কালান্তর' (১৯৩৭) এবং 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১)-এর মধ্যে কালগত ব্যবধান বেশি নেই, কিন্তু ভাবগত ব্যবধান বিস্তার। এই প্রবন্ধের মূল সূর মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ও স্বাধীনতাকামী বাঙালির ইংরেজের প্রতি মনোভাবকে ভিত্তি করে,—যদিও ইংরেজের প্রতি আস্থা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাঙালি মানসে ফাটল রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলোচ্য 'কালান্তর' প্রবন্ধটির কয়েকটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ 'যুগান্তর/কালান্তর' প্রসঙ্গ; 'রষ্ট্রীয় সহযোগিতা যুগ' এবং 'পরাভব' প্রসঙ্গ। বিশ্বের মানবতাবাদ ও স্বাধীনতার প্রত্যাশা, বিশ্বের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে, যে এক নব-ভাবনার সূচনা করেছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে কালান্তর/যুগান্তর বলেছেন। এই কালান্তর/যুগান্তর কেবল ভারতবর্ষেই ঘটে নি, সমগ্র বিশ্বেই ঘটেছে। ফলে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটিকে কেবল ভারতীয় রাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি, এটিকে নিখিল বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির একটি আলোচ্য প্রসঙ্গ করে তুলেছেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। এইখানেই প্রবন্ধটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এটির পটভূমিকা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ এবং উদার মানবিকতার বোধ এর সঙ্গে যুক্ত।

এই বিশ্বব্যাপী ভাবনাটিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে এসেছেন। অপরিহার্যরূপে এসে পড়েছে শাসক ইংরেজের প্রসঙ্গ। ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সর্বপ্রকার উত্থান-পতনের দিক। উত্থান-পতনের দিক বলতে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের চতুর্থ দশ পর্যন্ত (রবীন্দ্রনাথের জীবৎকাল) ইংরেজ ভারতবাসীর সম্পর্কের দিক। ইংরেজ জ্ঞান সত্য, স্বাধীনতা, মানবতা, ন্যায়-নীতির ধারক বলে রেনেস্যান্ট বাঙালী ইংরেজের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে;

এবং সেই আস্থার জোরেই ভারতবাসীর মধ্যে এই আশ্বাস জাগে—স্বাধীনতা মানবতাবাদী ইংরেজ একদিন আপন উদারতায় ভারত ছেড়ে চলে যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতি, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুসারে, এই আস্থা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনীতি বলতে ইংরেজকে তার কর্তব্যটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আলোচ্য 'কালান্তর' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে সেই মনোভাবেরই জের টেনেছেন যেন।' রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার যুগ' বলতে একাধিক অর্থ ও প্রসঙ্গকে বুঝতে হবে। প্রথমত, পূর্বতন মুসলমান শাসকগণ ভারতীয় চিত্তক্ষেত্রে এমন কোনো আন্দোলনের সৃষ্টি করে নি, যার ফলে ভারতীয়গণ রাজনীতি বা শাসন বিষয়ে মুসলমানগণের সহযোগিতা করতে উদ্যোগী-উৎসাহী সাহসী হবে। ইংরেজ ভারতবাসীর চিত্তক্ষেত্রে সাড়া জাগাতে পেরেছে বলেই ইংরেজের সঙ্গে 'রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা'র কথা উঠেছে এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— "এতে করেই সকলপ্রকার অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে দিয়েছে।" তিনি তাই বলেছেন "এই যুগে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগীতারই যুগ'। কেননা, য়ুরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় ভারতীয়দের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। কোন কারণে ভারতবাসী যদি সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের, আধুনিকতা ও মানবিকার পাঠ নিতে অক্ষম ও বিফল হয়, তবে সেটা ভারতবাসীরই এক ধরেনর পরাভব হবে! "বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের আমাদের শিক্ষার অসহযোগ সেইখানেই আমাদের পরাভাব।" য়ুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার ফলে ভারতীয় মানসের আধুনিককীকরণটিকেই রবীন্দ্রনাথ এক 'আত্মসম্মান'-এর গৌরব বলে মনে করেন এবং "এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই আজ পর্যন্ত আমরা স্বজাতি সম্বন্ধে দুঃসাধ্য সাধনের আশা করছি...' অর্থাৎ এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দাঁড়াল এই ঃ ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা চাই, নইলে ভারতীয় মানসের 'পরাভব' ঘটবে; ইংরেজই তার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয়দের আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে গিয়ে তিনি বললেন, সাম্রাজ্যবাদের কারণে ইংরেজেরই আজ পরিবর্তন এসেছে। ইংরেজের প্রতি আস্থা রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রবন্ধটির উপস্থাপনার বিশেষত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ। সমকালীন পৃথিবীর রাজনৈতিক তথ্যাদির আলোকে তিতিন তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইতিহাস একটি বিশেষ আলোচ্য দিক, যা বঙ্কিমচন্দ্রও করেছেন। এই ইতিহাসের আর একদিক হল, বাঙালীর জীবনকে ইতিহাসের পটভূমিকায় লক্ষ্য করা ঃ মধ্যযুগীয় বাঙালীর জীবনযাপনের ধারা, মুসলমান যুগে বাঙালীর সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক বিশেষত্বের দিক—সবই তিনি এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে যেন প্রত্যক্ষ করেছেন। ইতিহাস চর্চা এখানে অনেকটাই এক অন্তর্ভেদী কল্পনাশক্তির উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, এই প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলকভাবে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন, মুসলমান শাসনপ্রণালীর বিশেষত্বের সঙ্গে ইংরেজের শাসনপ্রণালীর বিশেষত্বের তুলনা। বঙ্কিমচন্দ্রও অবশ্য তাঁর এই ধরনের প্রবন্ধে তুলনামূলকভার আশ্রয় নিয়েছেন। এর ফলে প্রবন্ধের বক্তব্যের বিন্যাসটি যথাযথ হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রবন্ধটির কায়া বা কাঠামো নির্মাণের বিশেষত্ব। লেখক ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুটিত করেছেন। প্রথমে মধ্যযুগীয় বাঙালীর জীবন, তারপর মুসলমান যুগ, ইংরেজের যুগ, ইংরজেরে অবদান—অবশেষে ইংরেজের মতগত পরিবর্তন প্রদর্শন। এইভাবে স্তরেস্তরে প্রসঙ্গগুলিকে বিন্যস্ত করে নিয়ে রবন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধের কায়াটি নির্মাণ করেছেন।

৭১.৭ সারাংশ-১

ভারতবাসী সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনকে একাধিক কাল বা যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যুগ হল,—প্রাক্ মুসলমান যুগ। বাঙালি তথা ভারতবাসীর জীবন তখন ছিল নিস্তরঙ্গ। বাইরের পৃথিবীর নানা সমস্যা থেকে তারা ছিল দূরে। চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারী তলায় বসে, গল্প করে যাত্রা-পাঁচালি দেখে শুনে তাদের সরল অনাড়ম্বর জীবন কেটে যেত। তারপর এল দ্বিতীয় যুগ—মুসলমান শাসনের যুগ। কিন্তু এই শাসকগণ নিজেরাই ছিলেন প্রাচীন পন্থী, কাজেই ভারতবাসীকে তাঁরাও কোন নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন নি। ভারতবাসীর চিত্ত ক্ষেত্রের

বাইরেই থেকে গেছেন তাঁরা। আইন শৃঙ্খলা এবং শাসনপ্রণালীর ক্ষেত্রেও তাঁরা নিরপেক্ষ ছিলেন না। নিজেরা যেমন ছিলেন বাহুবলের ধারক, শাসনব্যবস্থার মধ্যেও তেমনি দেখা যেত প্রবলের জন্য একপ্রকার আইন, দুর্বলের জন্য ভিন্ন প্রকার আইন। যিনি সেই আইনের ধারক, তিনিই যেন জগদীশ্বর। দিল্লীশ্বর আর জগদীশ্বরে কোন তফাত নেই। তাঁদেরই প্রতীক প্রতিভূ ব্রাহ্মণগণও ব্রাহ্মণেতর জাতি বর্ণের প্রতি অত্যাচারী। মুসলমান শাসনকগণের প্রতাপ এবং ন্যায়হীনতা তৎকালীন সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। যেমন, মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীদের চরিত্র-পরিকল্পনায় ওই শাসকগণেরই ন্যায়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার ছাপ পড়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রচুর পার্সী শব্দ বাংলায় গৃহীত হলেও ওই সংস্কৃতির ছাপ পূর্ণরূপ সাহিত্যেও প্রতিবিম্বিত হয় নি।

কিন্তু ইংরেজ এল য়ুরোপের চিত্তদূর হয়ে। এসেই ভারতবাসীর চিত্তকে সে সর্বদিকে উন্মুক্ত করে দিল। সে হয়ে উঠল ভারতের অন্তরঙ্গ। বিদেশ থেকে আগত আর কোন শাসকদল ভারতবাসীর চিত্তকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দেয় নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গামশক্তি ভারতীয় চিত্তের স্থাবর ভূমিতে ফলিয়ে তুলল জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের নানা ফসল। ইংরেজ তখন এক বিশ্ববিজয়ী জাতি। তার সত্যানুসন্ধানের সততায় সে জ্ঞানের জগৎকে জয় করে চলেছিল প্রতিদিন। ভারতবাসীর জীবনেও সে নিয়ে এল জ্ঞানের বিশ্বরূপকে। জ্ঞানের রাজ্যে সব কিছুই যে যুক্তি শৃঙ্খলার অপরিহার্য বন্ধনে বাঁধা,—ভারতবাসীকে সে তাই শেখালে। তবে, ইংরজের সব চেয়ে বড়ো অবদান আইন-শৃঙ্খলার দৃঢ় প্রতিষ্ঠায়। আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগে। উচ্চ-নীচ সব মানুষের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন আইনের প্রবর্তন ফলত মানুষে-মানুষেও একাত্মতা অনুভব করবার এক উপায়। ইংরেজি সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য-বিদ্যার মধ্যেই এক উদার মানবতাবাদের পরিচয় ছিল—যার ফলে সেই ভাবাদর্শের দ্বারাই চালিত হয়ে ভারতবাসীও ইংরেজের কাছে স্বাধীনতার দাবী তুলতে সমর্থ হয়েছে, মুসলমান আমলে যা ছিল অকল্পনীয়। ভারতবাসীর মনের এই অবস্থানতরকেই রবীন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' আখ্যা দিয়েছেন। য়ুরোপ এবং ইংরেজের চরিত্রের প্রতি ভারতবাসীর এই আস্থা-বিশ্বাসের দিকটিকে বলা হয়েছে,—য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবাসীর 'রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার যুগ'। যেখানে য়ুরোপীয় ও ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কার-বিজ্ঞান-রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ভারতবাসীর 'অসহযোগ', সেখানে ভারতবাসীর 'পরাভব'। একদিকে মানুষ হিসেবে, ইংরজের যেমন চাই ভারতবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা, অপরদিকে ভারতবাসীরও তেমনি চাই ইংরজের প্রতি আস্থা।

দুর্ভাগ্যের কথা, ইংরজের আজ পরিবর্তন ঘটেছে, ধনবলে ও বহুবলে সে আজ মত্ত। পৃথিবী জুড়ে সব পরাধীন জাতি স্বাধীনতার জন্য যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে শুরু করেছে, তারই আলোকে ভারতবাসীর নবজাগ্রত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সে স্বীকৃতি দিতে চাইছে না—তাদরেই প্রবর্তিত মানবতাবাদকে তারা লঙ্ঘন করতে চাইছে।

৭১.৮ অনুশীলনী-১

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

(ক) 'কালান্তর' প্রবন্ধটি কোনই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? 'কালান্তর' কথাটির অর্থ কি?

(খ) মুসলমানগণের শাসনকালীন ভারতীয় মানসের সঙ্গে ইংরেজের শাসনকালীন ভারতীয় মানসের তুলনা করুন।

(গ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'—এই দুই গ্রন্থে 'প্র বন্ধ' আখ্যাটির যে ভিন্নতা ঘটেছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করুন।

(ঘ) কোন্ কোন্ সাময়িক পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে?

(ঙ) যে-যে বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলি লিখিত হয়েছে। সেই বিষয়গুলির নাম উল্লেখ করুন।

(চ) রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদকে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে?

(ছ) ইংরেজ ভারতবাসীর জীবনে ও মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সে বিষয়ে মন্তব্য করুন।

২। **নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলির বিশদ আলোচনা করুন ঃ**

(ক) 'প্রবন্ধ' সাহিত্যের লক্ষণ নির্দেশ করুন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে মন্তব্য করুন।

(খ) রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন।

(গ) 'কালান্তর' প্রবন্ধটি উপস্থাপনার বিশেষত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(ঘ) রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলিরতে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার কিভাবে ধরা পড়েছে?

(ঙ) রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলির ভাষা ও প্রকাশরীতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৭১.৯ মূলপাঠ-২ কালান্তর

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চলল। বহুকালের সুপ্ত এইশয়ায় দেখা দিল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতিসংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্তমান কালের মধ্যেই বর্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যকরূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেন প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে। অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্র-জাতির রথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও মনে ছিল যে, এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ-শাসনের প্রধান গর্ব 'ল' এবং 'অর্ডার', বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বার নব নব পথে ধন-উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাই নে, কেননা-দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল 'ল' এবং 'অর্ডারের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।

আজ ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের খুব মোটা। কিন্তু এর দ্বিগুণ মেটাও যদি হত, তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হত না, দেনদার দেশে যদি কেবলমাত্র 'ল' এবং 'অর্ডার' বজায় রেখে তাকে আর-সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত। যদি তার অন্নসংস্থান রইত আধপেটা-পরিমাণ' তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে শতকরা পাঁচ-সাত জন মানুষের মতো শিক্ষার ব্যবসথা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজানানুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্বলতা নিহিত করে দেওয়া সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টপ্রায় থাকত তার আরোগ্যবিধান। কিন্তু যেহেতু জীবনযাত্রার সভ্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এ সকল অভাব একেবারেই মারাত্মক, এইজন্যে পাওনাদারকে এমন কথা বলতে শুনলু যে আমরা দেনাশোধ করব না। সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারে না যে, এই প্রাণ-দেউলে করা তোমাদের দুর্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারব না যাতে বর্বরদশার জগদ্দল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে। বর্তমান যুগে য়ুরোপ যে-সভ্যতার আদর্শকে উদ্ভাবিত করেছে য়ুরোপই কি স্বহস্তে তার দাবিকে ভূমণ্ডলের পশ্চিম সীমানাতেই আবদ্ধ করে রাখবে। সর্বজনের সর্বকালের কাজে সেই সভ্যতার মহৎ দায়িত্ব কি য়ুরোপের নেই।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামনের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয়নি—এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিস্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশের নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছি'; তার বেদনা অনতিকাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল,

তখন সভ্য য়ুরোপ কী রকম করে দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানীন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্বসচিব শুস্টারের Strangling of Persia বইখানা পড়লে। ও দিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য ভিড় করে আসে।

তার পরে মহাযুদ্ধ এস অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা, এত বীভৎস হিংস্রতা, নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি। তারা আসত কালো আঁধির মতো ধুলায় আপনাকে আবৃত করে, কিন্তু এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত উৎস উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে দগ্ধ করে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে; একদা ইংরজের সংস্রবে আমরা যে-য়ুরোপকে জানতুম কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একাট সংকোচ ছিল, আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই। আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভাতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। সভ্য য়ুরোপর সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়ারল্যাণ্ডে রক্তপিঙ্গালের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজ্‌মের নির্বিচারর নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশর স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবারকথা অল্পবয়সে আমরা য়ুরোপের বেদী থেকে শুনতে পেতুম, আজ সেখানে যারা খৃস্টের উপদেশকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, যারা শত্রুকেও হিংসা করা মনে করে অধর্ম, তাদের কী দশা ঘটে তার একটি দৃষ্টান্ত থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

যুদ্ধবিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইম লিখছেন ঃ

So after the war I was sent to Guiana...Condemend to fifteen years' penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness, but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment-banishment for life. One arrives in Guiana sound in health, young, vigorous, one leaves (if one leaves), weakly, old, ill...One arrives in Guiana honest -a few months later one is corrupted...They (the transportess) are an easy prey to all the maladies of this land-fever dysentery, tuberculosis and most terrible of all, leprosy.

পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কিরকম দুঃসহ নরকবাস, সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জার্মান। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না! যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চার দিকে উদ্‌ঘাটিতত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছাবে আজ। মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে— বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা। কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি, তুমি অশ্রদ্ধেয়,অভিসম্পাত

দিয়ে বলতে পারি 'বিনিপাত', বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়, এই তো সকল দুঃখের সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারি নে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রপলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল। তার পরে আসুক কল্পান্ত।

শ্রাবণ ১৩৪০

৭১.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

সার্বিকভাবে বিচার করলে 'কালান্তর' প্রবন্ধটিকে একটি আশাবাদের প্রবন্ধ বলা যায়। বিশ্বের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ এক নব মানবশক্তির আবির্ভাবের জন্য প্রত্যাশা-প্রতীক্ষায় আছেন, যে নব মানবশক্তি ভারতবর্ষ থেকেই আবির্ভূত হবে এবং কেবল ভারতেরই পরাধীন-পরাভূত-পদানত মানবকে নয়, বিশ্বের তাবৎ এই ধরনের মানুষ মুক্তি লাভ করবে। ইংরেজ ভারতবাসীর সঙ্গে এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ন্যায় এবং মানবতার পাঠ দিয়ে ভারতবাসীর মনের মধ্যে মানবমুক্তির ভাবনাকে সৃষ্টি করে কার্যকালে তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেনি, এটাই সেই বিশ্বাসঘাতকতা। ভারতবাসীকে স্বাধীনতা প্রদানের পরিবর্তে 'ল' অ্যাণ্ড অর্ডার'কে কঠোরতর করেছে। কিন্তু এ জন্যে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করলেও ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন নি। তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাবাদের (Terrorism) রাজনীতি দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকেও সমর্থন করেন নি। ইংরেজ প্রশাসনের সঙ্গে অসহযোগিতারও (Non-Cooperation) অনুমোদন করেন নি তিনি।

এই পরিস্থিতিতে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের জীবন থেকেই এক নব মানবশক্তির আবির্ভাবের কল্পনা করেছেন, যে মানবশক্তি নায়কপুরুষকে তিনি 'মহামানব' আখ্যা দিয়েছেন। এই নবোদ্ভূত মানবশক্তির মহানয়ক রূপে যে মহামানব, তাঁরই নেতৃত্বে এক 'কালান্তর' আসন্ন—রবীন্দ্রনাথ সেই 'কালান্তর' এবং যুগনায়ককে স্বাগত জানিয়েছেন এই প্রবন্ধে— তাঁর আশাবাদ এখানে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। ভারতবাসীর জীবনে এক 'কালান্তর' ঘটেছিল ইংরেজের আগমনের ফলে, ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে। আবার দ্বিতীয় আর এক কল্পান্ত-কাকলাতর আসন্ন। এইবার সে কালান্তরে সূত্রপাত হবে ভারতবর্ষের জীবনসম্ভূত এক মহানায়কের দ্বারা। অবশ্য কেবল 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের শেষেই যে রবীন্দ্রনাথ সেই মহামানবের আগমনী গান গেয়েছেন, তা নয়। তার আগেও তিনি এই ধরনের কল্পনা করেছেন। পৃথিবী যখন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, চারিদিকে যখন নিত্য-নিঠুর দ্বন্দ্ব', জীবনের পথ যেখানে 'ক্ষোভ-জটিল', কিংবা 'কাম-কুটিল' তখন এক নবতম নায়কের আবির্ভাবের কথা তিনি বলেন।

নূতন তব জন্ম লাগি', কাতর যত প্রাণী,
করো প্রাণ, মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী।।

'কালান্তর' প্রবন্ধটির সবচেয়ে বড়ো কথা হল,— ভারতবর্ষের জীবন থেকেই এক নব মানবশক্তির আবির্ভাব এবং এক মহানায়কের দ্বারা সেই মনবশক্তিকে পরিচালিত করবার কল্পনার মধ্যে। প্রবন্ধের একেবারে শেষে এই প্রসঙ্গটি, উত্থাপিত হয়েছে এবং বছর চারেক পরে লেখা 'সভ্যতার সংকটে' সে ধারণাটি স্পষ্টতর ও ব্যাপকতর হয়েছ, এই অর্থে 'কালান্তর, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দুটি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, একটির ভাবনা স্পষ্টতর ও পূর্ণায়ত হয়েছে অপরটিতে। ইংরেজের যে কর্তব্য 'কালন্তর' প্রবন্ধে লেখক কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে, তাতে ঈষৎ পরিমাণে হলেও, পরোক্ষে তখনও ইংরেজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিছু আস্থা বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সভ্যতার সংকটে' সেই আস্থা-বিশ্বাসের শেষ কণিকাচিত্ত নিশ্চিহ্ন। এরই ফলে 'মহামানবে'র কল্পনাটি সেখানে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

ভারতের জাতীয় জীবনের অন্তর তেকেই যে নব মানবশক্তির আবির্ভাব ঘটবে, একথাও রবীন্দ্রনাথ পূর্বাপর বলে এসেছে। ভারতবাসীর আত্মশক্তির উপরেই নির্ভর করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে কিংবা জাতীয় জীবনে স্বাবলম্বী হতে হবে। এই জন্যেই তাঁর প্রথমদিকের একটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম ছিল—'আত্মশক্তি' (১৯০৫)। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন তিনি বলেছেন, দুঃখ-বিপদের মধ্যেই মানুষেরক ভেতরের শক্তি বাহিরে দেখা দেয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব এবং তাঁর রাজনীতি-বিষয়ক চিন্তা এখানে বিশেষ সাদৃশ্য রক্ষা করেছে। দুই ক্ষেত্রেই 'আত্মশক্তি'র উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

৭১.১১ সারাংশ-২

ইতিহাসের ধারাপথ ধরেই একদিন এশিয়ার কোন কোন দেশে বিশেষ জাগরণ এবং উন্নয়ন দেখা দিল। প্রাচ্য জাতিরা য়ুরোপ এবং ইংলণ্ডের সংস্রবে এসে সেই নবযুগের দিকে যাত্রা করল। ভারতবাসীর বুকেও সেদিন সেই আকাঙ্ক্ষার ঢেউ লাগে। সকলেরই নিশ্চিত প্রত্যাশা ছিল, বিশ্বের ইতিহাসে জড়াগরণ ও অগ্রগতির যে সূচনা হয়েছিল, ভারতবাসীও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাবে। স্বাধীনতা এবং মানবতার পূজারী ইংলণ্ড এ বিষয়ে এক সহায়ক শক্তি হয়ে উঠবে।

কিন্তু ইংরেজ ভারতবাসীর সেই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হল। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের পরিবর্তে সে দিল 'ল' অ্যাণ্ড অর্ডার', অর্থাৎ বিধি এবং ব্যবস্থা। সেই বিধি এবং ব্যবস্থাকেই দৃঢ়তর করবার দিকে ইংরেজ তখন বেশি পরিমাণে দৃষ্টি দিয়েছে। সমগ্র বিশ্ব যে তখন নতুন এক যুগের পথে চলতে শুরু করছে এবং ভারতবর্ষে যে তার প্রভাব এসে পড়েছে, ইংরেজ সেই মনোভাবকে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারে নি। যে ভারতবাসীকে ইংরেজ একদা স্বাধীনতা ও মানবমুক্তির পাঠ দিয়েছিল, কার্যকালে সেই ইংরেজই তার অনুসরণ করতে ব্যর্থ হল। ইংরেজ যেমন ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাল, ভারতবাসীও তেমনি ইংরেজের মহত্ত্ব ও উদারতার প্রতি আর আস্থা রাখতে পারল না। য়ুরোপ-আমেরিকা এবং ইংলণ্ড ধনগর্বে ও বহুবলে মত্ত হয়ে উঠে বিশ্বব্যাপী বর্বরোচিত অত্যাচারে সক্রিয় হল। সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে তথ্য আহরণ করে লেখক সেই নৃশংস অত্যাচারের বিশদচিত্র রচনাটিতে উপস্থিত করিয়েছেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধনোৎপাদনের ক্ষমতা কোন দিক থেকেই ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে নি। উপরন্তু তার তাবৎ সম্পদ তারা আত্মসাৎ করেছে। এও শাসকরূপে তাদের এক বড়ো ব্যর্থতা।

এই প্রকার অবস্থা-বিপর্যয়েরগ মধ্যে লেখক কিন্তু নিরাশ হয়ে পড়েন নি। কিংবা বর্বরের আচরণের প্রতিবাদ তিনি বর্বরতা দিয়েই করবার প্রস্তাব করেন নি। তিনি চান, ভারত ও ইংলণ্ডের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা। এ জন্যে তিনি দু'পক্ষেরই কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। বিশ্ব জুড়ে স্বাধীনতা ও মানবমুক্তির জন্য যে নবযুগের সূচনা তখন হয়েছিল, ইংরেজের উচিত সেই যুগগত ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়া। বর্তমান যুগে য়ুরোপ যে সভ্যতার আদর্শকে উদ্ভাবিত করেছে, য়ুরোপ যদি তা ভূমণ্ডলের পশ্চিম দিকেই আবদ্ধ রাখে, তবে তা ভূল করা হবে। সর্বজনের সর্বকালের কাছে সে সভ্যতাকে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব য়ুরোপেরই। অপরদিকে, এই পটভূমিকায়, ভারতবাসীরও এক বিশিষ্ট কর্তব্য আছে। আজ ভারতের দুঃখ দৈন্যের মধ্যে চাই সেই মানুষকে— যিনি অত্যাচারী বলবানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে তার বিচার করবেন, মাথা তুলে সেই বর্বর শক্তিকে ধিক্কার দেবেন। এক কঠোর বাণী উচ্চারণের জন্য প্রাণ পন করবেন তিনি। লেখকের ভাষায় ঃ "এই তো সকল দুঃখের সকল ভয়ের উপরের কথা।" আজ আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা এবং অধিকার যদি ভারতবাসী হারায়, তবে এ কথাই সত্য হবে— "এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ কড়া পর্যন্ত দেউলে হল।" আর, যদি যুগের দাবী অনুসারে আপন কর্তব্য করতে ভারতবাসী সক্ষম হয়, তাহলে" তারপরে আসুক কল্পান্ত।" 'কল্পান্ত' মানে— প্রলয়কাল তাকেই লেখক এখানে অপরার্থে বলেছেন 'কালান্তর'। প্রবন্ধটির মধ্যে দুই 'কালান্তরে'র কথা আছে। এক

'কালান্তর' ইংরেজের ব্যর্থতার ফলে, ভারতবাসীর নিজ নতুন ককর্তব্য পালনের ফলে ঘটবে। এই কর্তব্য পালনের জন্য যে একজন নায়কের আবির্ভাব হবে, জীবনের শেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকটে' রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই বলেছেন— 'মহামানব'। কেবল ভারতবর্ষেরই নন, সমগ্র বিশ্বেরই তিনি হবেন মুক্তিদাতা।

৭১.১২ অনুশীলনী-২

১) **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ**

(ক) 'ল' এবং অর্ডার বলতে প্রবন্ধকার বর্তমান ক্ষেত্রে কী বুঝিয়েছেন?

(খ) প্রবন্ধটির রচনাকালীন পরিস্থিতিতে, য়ুরোপ এবং ইংলণ্ডের কর্তব্য কী ছিল?

(গ) য়ুরোপীয় বর্বরতার যে তথ্য রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তার বিবরণ দিন।

(ঘ) "য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার' পর বিশ্বাস হারিয়েছে"—এই উক্তির ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) "এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ কড়া পর্যন্ত দেুলে হল"—এর অর্থ কী?

২) **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিশদ আলোচনা করুন ঃ**

(ক) প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী য়ুরোপীয় মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(খ) 'কালান্তর', 'কল্পান্ত', 'যুগান্তর' অভিধার কী?

(গ) এই প্রবন্ধের ভাষা-রীতি সম্বন্ধে আপনার মত কী?

৭১.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'কালন্তর' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ

(২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রজীবনী (প্রাসঙ্গিক অংশ)

(৩) ক্ষুদিরাম দাশঃ রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়

(৪) অধীর দে ঃ আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা।

একক ৭২ ❑ সভ্যতার সংকট ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

৭২.১ উদ্দেশ্য
৭২.২ প্রস্তাবনা
৭২.৩ মূলপাঠ-১
৭২.৪ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭২.৫ সারাংশ-১
৭২.৬ অনুশীলনী-১
৭২.৭ মূলপাঠ-২
৭২.৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭২.৯ সারাংশ-২
৭২.১০ অনুশীলনী-২
৭২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

- গদ্য ও গান রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন;
- ইতিহাসবোধ, সত্যতাবোধ এবং স্বাদেশিকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৭২.২ প্রস্তাবনা

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। এটিই রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের আশি বৎসর পূর্তি উৎসবে (১লা বৈশাখ, ১৩৪৮) শান্তিনিকেতনে এটি পড়া হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর অসুস্থতার কারণে এটি পাঠ করেন, ক্ষিতিমোহন সেন। এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সর্বশেষ জন্মোৎসব। প্রবন্ধটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হয়। এটিতে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র পৃথিীর ইতিহাস ও রাজনীতির দিকে শেষবারের মতো দৃষ্টিপাত করেছেন এবংসেই সূত্র ধরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯), রবীন্দ্রনাথ তার ফল-পরিণাম দেখেযেতে পারেননি, কিন্তু সে যুদ্ধের উত্তাপ অনুভব করেছেন। তবুও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) শেষ রেশ তাঁর মনের মধ্যে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। য়ুরোপ এবং বিশেষত ইংরেজের আগ্রাসী ও উদ্ধত মনোভাবের ফলে পৃথিবীর বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে যে সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে এসেছিল, প্রবন্ধটিতে তারই আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মধ্যে একদিকে তাঁর মনের নৈরাশ্য এবং অপরদিকে এক মহামানবের আগমনের আশা ব্যক্ত হয়েছে। লেখক মনে করেন, সেই মহামানবই সমগ্র মানবজাতিকে সভ্যতার এই সংকট থেকে উদ্ধার করবেন। এই মহামনব রবীন্দ্রনাথেরই বিশ্বমানবিকতা বোধের একটি দিক। প্রাবন্ধিকের ভাবনা অপেক্ষা কবির আশাদীপ্ত রোমান্টিক কল্পনা রচনাটিতে প্রাধান্য পেয়েছে।

৭২.৩ মূলপাঠ-১

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য পরিবেশনে প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গাভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্‌সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনের বসিয়েছিলাম। তখনো সাম্রাজ্য মদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।।

'সিভিলিজেশন' যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তা যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভাত্যার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত— তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করল।

আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেইসঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম-সভ্যতাকে যারা চরিত্র উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমারে সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক, অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি; অবশেষ দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ওদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছ তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদ্‌বান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষ্যা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি আসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল— দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থ সম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে— এক ইংরেজ, আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তি নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্মসাধনে প্রবৃত্তি হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুষ্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভগ্যের প্রধান কারণ এই যে সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদি এখনো ঘটেনি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ

রয়েছে তার একমাত্র কারণ-সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

৭২.৪ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'কালান্তর' প্রবন্ধটির সঙ্গে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটির ভাবগত এবং রূপগত সংযোগ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দুটিতেই দেখা যাবে, প্রথমে নানাদিক থেকে ইংরেজের প্রশংসা, পরে ইংরেজের ঔদার্য এবং মানবিকতাবোধের প্রতি লেখকের আস্থা-বিশ্বাস হারানো। দুই ক্ষেত্রেই লেখকের মানসিক বিক্ষোভ ধরা পড়েছে। 'কালান্তর' এবং 'সংকট' শব্দ দুটির মধ্যেও একটি দূর ও পরোক্ষ সাদৃশ্য আছে।

তাঁর বাল্যকালে লেখক মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় পেয়েছিল ইংরেজের চরিত্রে। ইংরেজের ঔদার্যের প্রতি তখন তাঁদের ছিল গভীর আস্থা। ইংরজের সভ্যতার মধ্যেই তাঁরা সভ্যতার চরম নিদর্শন দেখেছিলেন এবং জীবনে তারই অনুসরণ করতেন তাঁরা। ভারতীয় 'সদাচার'কেও তাঁরা তেমতন গুরুত্ব প্রদান করতে না। ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে ছিল—বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। এজন্যে তাঁদের মনে কোন হীনমন্যতার বোধ ছিল না। ইংরেজের যে সাহিত্যে লেখকের মন পুষ্টিলাভ করেছিল, তার প্রভাব তাঁর পরিণত বয়সেও বজায় ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ইংরেজের যে সাহিত্যে লেখরে মন পুষ্টিলাভ করেছিল, তার প্রভাব তাঁর পরিণত বয়সেও বজায় ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ইংরেজের দ্বারাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অজন করা সম্ভব হবে। যে সব দেশ তখন স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করেছিল, তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ড।

কিন্তু কালক্রমে সেই ইংরেজের মধ্যে এলো সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, বলদর্পিতা ও মদমত্ততার দিক। ইংরেজের অপশাসনের দুটি দিককে লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। প্রথমত, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষের সৃষ্টি করা; দ্বিতীয়ত, ভারতবাসীকে যন্ত্রচালনার দীক্ষা না দিয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে রাখা। দুটি প্রসঙ্গেই তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রথম প্রসঙ্গটির দৃষ্টান্ত নিয়েছেন রাশিয়া থেকে; আর দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি দৃষ্টান্ত নিয়েছেন জাপান থেকে। রাশিয়ার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের কর্তৃত্ব নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, ভারতবর্ষে যেমন ইংরেজ ঘটিয়েছে। তেমনি জাপান যন্ত্রচালনার শিক্ষার ফলে অতি দ্রুত সর্বতোভাবে সম্পদবান্ হয়ে উঠেছিল, —ইংরেজ সে সুযোগ ভারতবাসীকে দেয়নি।

আলোচ্য প্রবন্ধটির উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হল— সমকালীন পৃথিবীর থেকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দৃষ্টান্ত আহরণ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তার তুলনা। এইখানে আরো একটি বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতো। স্বাদেশিকতার নামে তখন বিশ্বের কোন কোন দেশে chauvinism বা উগ্রস্বাদেশিকতার ধারার প্রবর্তন ঘটে। এরই অপর দিক হল, Jingoism, অর্থাৎ স্বদেশ প্রেমের প্রকাশের ক্ষেত্রে যুদ্ধবাদী মনোভাবের প্রকাশ করা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কখনই এই ধরনের স্বদেশপ্রেমকে প্রশয় দেন নি বা সমর্থন করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কিন্তু সেই ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীকে কখনই বাহুযুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেননি। আলোচ্য 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটিতে তিনি ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীর সমস্যার কথা উত্থাপন করেছেন এবং ভারতবাসীদের মধ্য থেকেই এক নব মানবশক্তির আদর্শ উদ্ভুত হয়ে সেই সংকটের সমাধান করবে বলে তিনি বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তখন তিনি যেমন এক নতুন শিল্পীর আগমন প্রত্যাশা করছিলেন, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও তেমনি।

৭২.৫ সারাংশ-১

জীবনের প্রথম দিকে, ইংরেজি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জীবননের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তাঁর সেই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সম্পূর্ণই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজের মহৎ ও উদার সাহিত্য

যেমন তাঁদের জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দিয়েছিল, তেমনি ইংরেজের জাতীয়চরিত্রও তাঁদের কাছে সভ্যতার আদর্শ হয়ে উঠেছিল। এমন কি, ভারতীয় সদাচার-লোকাচারও তাঁরা এ কারণে বিসর্জন দিয়েছিলেন। ক্রমে ইংরেজের মধ্যে এসে পড়ল-সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ভারতবর্ষের প্রতি উপেক্ষা, প্রশাসনের ক্ষেত্রে এল পীড়ন। ভারতবর্ষের মানুষের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য,—কোন বিষয়েই ইংরেজ কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। অথচ, রাশিয়ায় দেখা গেছে, অজ্ঞ অঞ্চলগুলি সম্পর্কে প্রশাসকগণের সহযোগিতার মনোভাব। তাই সেখানে এসেছে উন্নতি, মানবিকতার বোধের প্রসার এবং আসাম্প্রদায়িকতার মনোরম দিক। য়ুরোপীয় প্রশাসকগণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ একটি ত্রুটি লক্ষ করেছেন। পারসিক এবং জরথুষ্ট্রিয়ানদের মধ্যে উন্নতির সূচনা তখনই হয়েছে, যখন তাঁরা য়ুরোপীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়েছে। যে যন্ত্রচালনার চর্চার ফলে ইংরেজ তখন বিশ্ব কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল, ভারতবাসী ছিল সে প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত, জাপান সেই যন্ত্রচালনার চর্চার ফলে ইংরেজ তখন খুব দ্রুত উন্নতি অর্জন করে ফেলেছিল। আফগানিস্থানের মধ্যে যে শিক্ষা ও সমাজনীতির অগ্রগতির সূত্রপাত হচ্ছিল, তার মূল কারণ— কোন য়ুরোপীয় জাতি কখনও তাদের পরাভূত করতে পারেনি। অর্থাৎ যেকানেই তথা য়ুরোপীয় ও ব্রিটিশ শাসন উপস্থিত ছিল, সেখানেই দেখা গেছে— সে দেশ অনগ্রসর হয়েই আছে। ভারতবর্ষও তাই। যে ইংরেজেকে লেখক তাঁর প্রথম জীবনে জীবনে এক সভ্যজাতি বলে বিশ্বাস করেছেন, তারাই যে মানবতা ও সভ্যতার আদর্শকে এমন বিকৃত করে ফেলতে পারে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সেটা বিশ্বাস করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দুঃখদায়ক হয়ে উঠেছিল।

৭২.৬ অনুশীলনী-১

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) আলোচ্য প্রবন্ধটি কী উপলক্ষে এবং কবে লিখিত হয়েছিল? প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোথায়?

(খ) আলোচ্য প্রবন্ধটির পটভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(গ) প্রাবন্ধিকের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কবির রোমান্টিক কল্পনা কী রূপ ধরে এখানে প্রকাশিত?

(ঘ) সাম্প্রদাকিতার বিষ-বাষ্প ভারতে ছড়িয়ে দেবার জন্য ইংরেজের ভূমিকা কী ছিল? রাশিয়াতে এ বিষয়ে কোন নীতি অবলম্বিত হয়েছিল?

(ঙ) যন্ত্রচালনার শিক্ষআ জাপানে কী ফল ফলিয়েছিল? এ বিষয়ে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করুন।

২। নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ আলোচনা করুন ঃ

(ক) ইংরেজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে শেষ জীবনের বিশ্বাসের তুলনা করুন।

(খ) প্রবন্ধটির উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য কী?

(গ) 'সভ্যতার সংকট' এবং 'কালান্তর' প্রবন্ধ দুটির ভাবগত সাদৃশ্যের ওপর আলোকপাত করুন।

৭২.৭ মূলপাঠ-২

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্তসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতি প্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের তলায় ইংলণ্ড কিরকম

কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময় এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি, তবু য়ুরেপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শেকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত শাসনযন্ত্রের উধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামার্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order. বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে সে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহাদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে অ্যান্ড্রাজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষবয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্রঅকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্ক শয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমাদের বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমারে পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশের ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলেরল সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষের জয়যাত্রার অভিযানে

সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জদয়তি সমূস্তু বিনশ্যতি।।
ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সূরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন

১ বৈশাখ ১৩৪৮

৭২.৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

এই প্রবন্ধে সমকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে লেখকের বিশেষ চেতনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে লেখক ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষের পরিস্থিতি বিচার করেছেন,— একটি তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ এখানে ক্রিয়াশীল। গোটা য়ুরোপের নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থার কথা বললেও লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল, ইংরেজের শাসনব্যবস্থার কুফল পর্যবেক্ষণ করা। প্রবন্ধের এই অংশে লেখকের দৃষ্টিকোণও খুব বাস্তব ও আধুনিক। যন্ত্রচালনার শিক্ষা এবং তজ্জাত অর্থনৈতিক মুক্তি ও অগ্রগতিকেই তিনি এখানে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমকালীন বিশ্ব ও সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে তবেই তিনি এ প্রবন্ধ রচনার হস্তক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রাজনৈতিক প্রবন্ধে দেখা যায়, ভারবর্ষের জাতীয় জীবনের অনগ্রগতির জন্য তিনি ভারতবাসীকেই দায়ী করেছেন; নানা সামাজিক কুসংস্কার, সম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা জাতি-বর্ণভেদ, প্রভৃতি। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তাঁর দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত। এখানে ভারতের জাতীয় জীবনের অনগ্রসরতার কারণ রূপে ইংরেজের অপশাসনকেই তিনি দায়ী করেছেন। মূল কারণ হল, ইংরজেরে প্রতি লেখকের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা। একদিন ইংরেজের প্রতি তাঁর এবং সমকালের ভারতবাসীর বিশ্বাস ছিল ঃ ইংরেজ তার মানবিক ঔদার্যের কারণেই ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করবে; ভারতবাসীর জাতীয় কর্ম তাই সেই স্বাধীনতার রূপায়ণের জন্য নিজেদের প্রস্তত করা। এই জন্যেই ইংরেজের শাসনব্যবস্থার চেয়ে ভারতবাসীর জাতীয় প্রস্তুতিকে রবীন্দ্রনাথ তখন বড়ো করে দেখেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ইংরেজ সম্পর্কে তার

মোহভঙ্গ ঘটেছে, তাঁর বিশ্বাস 'দেউলিয়া' হয়ে গেছে। এই জন্যে ভারতবর্ষের জাতীয় অনগ্রসরতার কারণ রূপে তিনি ইংরেজের অপশাসনকেই দায়ী করেছেন।

ভারতের এবং পৃথিবীর সকল নিপীড়িত ও অনুন্নত দেশের সমস্যার সমাধানকারী রূপে রবীন্দ্রনাথ এক মহামানবের আগমনের প্রত্যাশা করেছেন। এই প্রত্যাশা মধ্যে তিনি যতো না প্রাবন্ধিক, তার চেয়ে বেশি একজন কবি। এখানেই প্রবন্ধটি রচনাগত দিক থেকে দ্বিতীয় আর একটি মাত্রা অর্জন করেছে। অবশ্য কবিরূপে, এর কিছু পূর্ব থেকেই যেমন নতুন এক শিল্পীর পদধ্বনি তিনি শুনছিলেন, এখানে সেই নতুন শিল্পীরই আর একরূপ যেন রাজনৈতিক নেতা, কিংবা কেনো 'মহামানব'। ইনি কেবল ভারতবর্ষের নিপীড়িত মানুষকেই উদ্ধার করবেন না, সকল দেশের নিপীড়িত মানুষকেই উদ্ধার করবেন। কাজেই ইনি কেবল সংকীর্ণ অর্থে বিশেষ এক দেশের উদ্ধারকর্তা নন—মানবমাত্রেরই উদ্ধারকারী। সেই দিক থেকে বিচার করলে এই 'মহামানবে'র আইডিয়ারির একটি ব্যাপকতা আছে। মনে হয়, 'Super man'-এর বাংলা প্রতিশব্দরূপে তিনি পদটিকেই গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু 'মহামানব' বলতে তিনি আরো অতিরিক্ত কিছুকে বুঝিয়েছেন।

কিন্তু এই 'মহামানব' কোনো ব্যক্তি বিশেষ নন, তিনি যেন একটি নৈর্ব্যক্তিক concept। তাই তিনি যুগের প্রয়োজনে, ইতিহাসের ধারাপথ বেয়ে, এক শক্তি রূপে আবির্ভূত হন। গীতার কল্পনার সঙ্গে এ বিষয়ে রবীন্দ্রকল্পনার কিছু পার্থক্য আছে। গীতায় বলা হয়েছে, সাধুদের পরিত্রাণ করবার জন্য, দুস্কৃতদের বিনাশ করবার জন্য, দেশে যখন নানা গ্লানি দেখা দেবে, শ্রীকৃষ্ণ তখন, যুগে যুগে সম্ভাবিত হবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মহামানবের কল্পনা কিছু ভিন্ন। যদিও রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছেন প্রাচ্য দেশ থেকেই এই মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে, তথাপি তিনি যেন নিখিল বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত এক সত্তা; তাঁর কোনো নির্দিষ্ট দেশের বন্ধন নেই; এমন কি, তিনি নিজে একক কোনো সত্তা নন; নব চিন্তায় উদ্বোধিত এক নির্বিযে, মানব শক্তির সংকেত তিনি। কাজেই তাঁর আগমনের জন্য একদিকে সুরলোকে ধ্বনিত হয় মঙ্গল শঙ্খ; অপদিকে মর্ত্যলোকের ঘাসে-ঘাসে তাঁর পদধ্বনি শোনা যায়। তাঁর অস্তিত্ব তাই আভূমিনতো, তিনি অণুর চেয়ে অণু, মহতের চেয়েও মহীয়ান। এই জন্যেই শেষে সংযোজিত গানটির মধ্যে 'মানব-অভ্যুদয়ে'র কথা আছে, কোন বিশিষ্ট ও একক মানুষের কথা নয়।

যদি 'কালন্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দুটির শেষাংশ এই প্রসঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ের বক্তব্যের মধ্যে একটি ক্রমবিকাশ দেখা যায়। 'কালান্তরে' তিনি একটি সম্মিলিত মনবশক্তির আবির্ভাবের দিকটিকেই যেন মুখ্য বলে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। আর 'সভ্যতার সংকটে' একক একজনের কথা বলেও সেই সম্মিলিত মানবশক্তির কথাই যেন ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই দুই চিন্তার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। যিনি একক, তিনিই সম্মিলিত মানবত্তা। এই একক ও সম্মিলিত মানবশক্তিই কবির কল্পিত এক 'মহামনব',— জীবনের প্রথম দিকে রচিত গানে (জন-গণ-মন-অধিনয়াক....' ইত্যাদি পূর্ণ গানটিতে) যাঁকে তিনি বলেছেন, 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্থার' ঐতিহাসিক পথে তিনি সারথি ('হে চিরসারথি....'), —'যুগযুগধাবিত' যাত্রা পথের সকল বিপদের তিনিই 'সংকট দুঃখ ত্রাতা'। সভ্যতার সংকট' এর প্রসঙ্গে এই 'সংকট' শব্দটির প্রয়োগ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৭২.৯ সারাংশ-২

য়ুরোপ তথা ইংরেজের অপসাশন ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে বিশ্বের অনেক দেশেই তখন জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছে। ফলে সে সব দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির সূচনা হয়েছে। কিন্তু ভারত অনগ্রসরই থেকে গেছে। এক্ষেত্রে ভারতবাসীর নিজেদের দোষ অপেক্ষা ইংরেজে কূট-রাষ্ট্রনীতিকেই লেখক দায়ী করেছেন। ইংরেজের নৃশংস কূটশাসনের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের এক বিরাট ক্ষতি হয়েছে। সে ক্ষতি ভারতের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ক্ষতি নয়। ইংরেজ ভারতবাসীর মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির। অবশ্য, ইংরেজ ভারতকে দিয়েছে শাসন ক্ষেত্রে Low and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা। কিন্তু লেখকের মতে, ভারতীয় জাতীয় জীবনে তার মূল্য সামান্যই। জাপান

কোনো য়ুরোপীয় জাতিদ্বারা পরাভূত নয় বলেই সে দেশ তখন উন্নত ও জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ যেখানে ইংরেজের বর্বর শাসনদ্বারা জর্জরিত। একারণেই ভারবর্ষের অগ্রগতির সূচনা হয়নি। কেবল ইংরেজই নয়, গোটা য়ুরোপই তখন মানবপীড়নে মেতে উঠেছিল এবং বিশ্বের মানবের সমগ্র সভ্যতার ক্ষেত্রে এক সংকটের সৃষ্টি করেছিল। লেখকের আশা, এই সংকটকালে প্রাচ্য দেশ থেকেই এক মহামানবের আবির্ভব ঘটবে। কেবল ভারতবর্ষকেই নয়, বিশ্বের সমগ্র পীড়িত মানবজাতিকেই তিনি ত্রাণ ও উদ্ধার করবেন। ইংরেজের সাম্রাজ্য একদিন ভেঙে যাবে, কারণ-অধর্মের দ্বারা যে প্রাপ্তি, একদিন তার বিনাশ ঘটবেই। সেই মহামানব এক নবজীবনের আশ্বাস নিয়ে আসবেন,—তাঁর জয়গানে আজ দশদিক মুখরিত।

৭২.১০ অনুশীলনী-২

১। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ**

(ক) তৎকালীন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারবর্ষের অনুন্নতির কারণ কী।

(খ) 'সভ্যতার সংকট'—প্রবন্ধের এই শিরোনামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(গ) 'মহামানবে'র কর্তব্যভূমি কেন সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান?

২। নিম্নলিখিত প্রশঅনগুলির বিশদ আলোচনা করুন। ঃ

(ক) রবীন্দ্রনাথের 'মহামানবে'র ধারণাটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন।

(খ) 'সভাতার সংকট প্রবন্ধটিতে যেভাবে প্রাবন্ধি এবং কবির সম্মিলিন ঘটেছে, তা আলোচনা করে দেখান।

৭২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

(১) রবীন্দ্রজীবনী ঃ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত পাল।

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালান্তর।

(৩) অধীর দে ঃ আধুনিক বংলা প্রবন্ধে সাহিত্যের ধারা।

(৪) ক্ষুদিরাম দাশ ঃ রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়।

একক ৭৩ ❑ শূদ্র জাগরণ ঃ স্বামী বিবেকানন্দ

গঠন

৭৩.১ উদ্দেশ্য
৭৩.২ প্রস্তাবনা
৭৩.৩ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ জীবন কথা
৭৩.৪ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য
৭৩.৫ মূল পাঠ-১
৭৩.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭৩.৭ সারাংশ-১
৭৩.৮ অনুশীলনী-১
৭৩.৯ মূলপাঠ-২
৭৩.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭৩.১১ সারাংশ-২
৭৩.১২ অনুশীলনী-২
৭৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৭৩.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করলে আপনি স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- তৎকালীন বিশ্বের ও ভারতবর্ষের শূদ্রজাতির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

৭৩.২ প্রস্তাবনা

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেবল ধর্মতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেননি; তিনি ছিলেন-কর্মবীর। কর্মের মধ্য দিয়েই তিনি জগৎকে দেখেছিলেন। সেই কর্মের দিক থেকে জগৎকে দেখবার ফলে ইতিহাস, রাজনীতি এবং স্বদেশপ্রেমকে তিনি বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের সব বাঙালী মনীষীই তাদের স্বদেশে প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিহাস এবং রাজনীতিকে বিশেষ ভাবে ভিত্তি করেছেন এবং দেশে-দেশে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথেরও স্বদেশপ্রেম ইতিহাস ও রাজনীতির পটভূমিকায় আলোচিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও সেই পথে চারণা করেছেন, তবে তা একান্তভাবে তাঁরই অনুগত পথে। আলোচ্য 'শূদ্র জাগরণ' (এটি তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ থেকে গৃহীত) প্রবন্ধটিতেও তিনি ভারতবর্ষের শূদ্র জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানটি গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন। শূদ্র বলতে তিনি কেবল ভারতীয় একটি বিশিষ্ট বর্ণকেই বোঝান নি; বিশ্বের যেখানেই যতো অনুন্নত, পীড়িত মানুষ আছে, তাদেরও বুঝিয়েছেন। এখানেই তিনি মানবতাবাদী, এখানেই তাঁর দৃষ্টি কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় শূদ্রকে তিনি ইংরেজের শাসনাধীন যে কোনো ভারতীয়কেই বুঝিয়েছেন। এই ভাবে তিনি প্রবন্ধটির ভাব ও অর্থগত সীমাকে

বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিচিত্র অর্থে 'শূদ্র' বর্ণটিকে গ্রহণ করে তাদের সর্বপ্রকার সমস্যার উৎস যেমন নিরূপণ করেছেন তেমনি সেই সমস্যার পথও নির্দেশ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য কথা হল,— ইংরেজের প্রসঙ্গের উত্থাপন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় জীবনের সমস্যার ক্ষেত্রে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা, ইংরেজের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজের মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। সব ভারতীয় আলোচকই ভারতীয় জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যাকে দু'দিক থেকে লক্ষ করেছেন ঃ একদিক হলো ভারতবাসীর নিজের কর্তব্য, অপরদিক হলো শাসক রূপে ইংরেজের কর্তব্য। এই দুই দিকের কর্তব্য যখন একসঙ্গে মিলবে, তখনই শূদ্রদের জাগরণ সম্ভব ও সার্থক হবে। সমগ্র বিশ্বের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে-বিস্তৃত পড়াশোনা ছিল, এই প্রবন্ধটি থেকে তা প্রমাণিত হয়। তাঁর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর মনীষার শুভ সংযোগের ফলে এটি একটি বিখ্যাত প্রবন্ধরূপে পরিচিত লাভ করে।

৭৩.৩ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ক'জন কর্মবীর ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্নতিবিধনকল্পে আত্মনিয়োগ করেন, স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ জন্ম ঃ ১২.১.১৮৬৩। প্রয়াণ ঃ ৪.৭.১৯০২) তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য পুরুষ। রোমাঁ রোল্যাঁ, ভগিনী নিবেদিতা, সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অসংখ্য লেখক-লেখিকা তাঁর জীবন ও কর্মসাধনা নিয়ে তথ্যবহুল, বিশ্লেষণীধর্মী আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ পরস্পরের সম্বন্ধে তেমন আলোচনা করেনি। রবীন্দ্রনাথ স্বল্পকথায় তাঁর কর্মসাধনার মূল্যায়ন করেছেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ও পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও বামদিকে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরদিন সংকীর্ণতার মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। তিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মিলন সেতু রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার ও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।"

বিবেকানন্দ জেনারেল এসেম্বলি কলেজের (পরে যার নাম হল— স্কটিশচার্চ কলেজ) স্নাতক। ছাত্রাবস্থাতেই দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। বিজ্ঞানের মধ্যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার প্রতি তংার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সমকালীন পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা স্বভাবতই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তিনি ছিলেন তর্কনিপুণ, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করতেন। তাঁর মধ্যে ছিল নেতৃত্ব করবার শক্তি ও ব্যক্তিত্ব। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ, নিজে সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত যে গানটি শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি ঃ 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি ঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর/ভাবো ব্যোমে ছায়াসম, ছব বিশ্ব-চরাচর'। আসলে তাঁদের বাড়ীতেই ছিল সঙ্গীত-চর্চার ধারা। এই সংগীত-প্রিয়তা ও সংগীত প্রতিভা তাঁর মানসকে এক বিশেষ স্তরে উন্নীত করে। তাঁর জীবনের এক বিশেষ ঘটনা আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান এবং সেখানে তাঁর পরিচিত। ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, এই মহাধর্ম সম্মেলন শুরু হয়, ১৭ দিন ধরে তা চলে। তিনি চার বছর ধরে (১৮৯৩-১৮৯৭) আমেরিকা ও ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করেন, বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে, বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষকে জানবার জন্য তিনি ভারত ভ্রমণ করেন, তারই অভিজ্ঞতা 'পরিব্রাজক' নামে তাঁর গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি ভাবনা-চিন্তা করেছেন। তাঁর ধর্ম মানুষ তৈরির ধর্ম। তিনি বলতেন ঃ "যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন" একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি এবং বিজ্ঞান পড়াতে হবে। দিতে হবে টেকনিক্যাল এডুকেশন, যেধে যাতে ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে। তাঁর এ চিন্তা এ যুগের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক। তিনি আরো বলেছেন ঃ "জনশিক্ষা বিস্তারই জাতীয় উন্নতির মূল।"

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল— প্রাচীন ভারতের আদর্শকে উজ্জীবিত করা, তাঁর জীবনের ভিত্তি হল—অদ্বৈত বেদান্তবাদ। তাঁর সাধনা—ত্যাগ ও সেবার সাধনা, নানাপ্রকার অস্পৃশ্যতাকে পরিহার করা। জীবই তাঁর কাছে শিব। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" ভারতবর্ষের দরিদ্রজনের অস্পৃশ্যজনের হীনজনের প্রতীক ও প্রতিনিধি তিনি। দেশের যুবশক্তির প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা, সর্বপ্রকার কর্মে তিনি তাদেরই আহ্বান করেছেন। তিনি নিজেই বলতেন ঃ "আবার ভারতকে জগৎ জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবন-স্বপ্ন।" নারীজাতির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা। 'হিন্দুনারীর আদর্শ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত রচনাও তিনি লিখেছিলেন।

শ্রী অরবিন্দ এই জন্যেই তাঁকে "এক শক্তিধর পুরষ' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

৭৩.৪ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য

অকাল মৃত্যুর কারণে বিবেকানন্দের অনেক রচনাই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ইংরেজি এবং বাংলা—দুই ভাষাতেই তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন; ইংরেজি—বাংলাতে আছে তাঁর পত্রাবলী। যাকে বলে 'পত্র-প্রবন্ধ', এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সেই ধারার। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে পত্র-প্রবন্ধ বিশেষ পরিচিতি লাভ করে, যদিও প্রথম বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথও ভ্রমণ-পত্র ইত্যাদি লিখে এসেছেন।

বাংলা ভাষায় বিবেকানন্দের প্রবন্ধের ও পত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল— কথ্য বাংলাকে গুরুত্ব দেওয়া। তাঁর সাধু ভাষায় লেখা গদ্য যেমন সহজ-সাবলীল, কথ্য ভাষায় লিখিত গদ্য তেমনি স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী। যে সময়ে অন্যান্য গদ্য শিল্পীরা সাধু বাংলায় রচনাদি লিখছেন, সেই সময় কথ্য গদ্যকে এসব স্বীকৃতি দান বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় কথ্য গদ্যই ব্যবহৃত হতে থাকে।

বিবেকানন্দের কর্ম ও সাধনার দিকটি তাঁর প্রবন্ধে ও পত্রে সম্যক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়—'উদ্বোধন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দুটি সমায়িক পত্রে। প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল ঃ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৫), 'ভাববার কথা' (বিভিন্ন বিষয়ের রচনার সংকলন, ১৯০৭), এছাড়া পত্র সংকলন 'পত্রাবলী'। 'ভাববার কথা' বইতে তিনি কথ্য বাংলা ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

"....স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনওকালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে— যেন সাফ ইস্পাৎ মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর— আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"

ধর্মচিন্তা রাজনৈতিক ও স্বাদেশিকতার চিন্তা, শিক্ষা ও ইতিহাস-চিন্তা তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের নানা দিক। 'রাজযোগ' গ্রন্থে ধর্মগত জটিলতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। নব্য ভারতকে তিনি রজোগুণ ও কর্মযোগের সম্মিলনে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর 'সংস্কারক কে?' রচনাটির উল্লেখযোগ্য। খাঁটি সংস্কারক বলতে তিনি এই বুঝিয়েছেনঃ

"যদি তুমি দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে চাও, তবে তোমার তিনটি থাকা চাই-ই চাই। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা। তোমার ভাইদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে?...তারপর চাই-কৃতকর্মতা। বল দেখি, তুমি দেশের কল্যাণের কোন নির্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি?.... আরও একটি জিনিসের প্রয়োজন-প্রাণপণ অধ্যবসায়।"

বিবেকানন্দের পূর্বে মূর্খ, চণ্ডাল, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য এমন করে কেউ ভাবেন নি। আলোচ্য 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটি তারই ফল। এই মানুষদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতার কারণে দূরে ঠেলে রাখা, তাদের

সামাজিক ঊর্ধ্বায়ন—প্রভৃতিকে তিনি একদিকে আবেগ, অপরদিকে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-দুদিক থেকেই দেখেছেন। বেদান্তধর্মকে তিনি জীবনের Practical ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন এভাবেই। তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, কিন্তু সে সন্ন্যাস কর্মময় সন্ন্যাস। নিষ্কাম কর্মসাধনাই তাঁর মূল সাধনা। তাঁর গদ্যের স্টাইল হল একদিকে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা (সংস্কৃতে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, সংস্কৃতে তিনি কয়েকটি কবিতাও লিখেছেন), আবার অন্যদিকে শ্লেষ-ব্যঙ্গকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর বাংলা ভাষায় লেখা প্রবন্ধের পরিমাণ ইংরেজির তুলনায় কম। মানুষকে একটি বিশেষ ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত করবার জন্যই তাঁর ভাষা এই বিশেষত্ব অর্জন করেছিল।

৭৩.৫ মূল পাঠ-১ শূদ্র-জাগরণ

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান, ভারতের দেসের 'ভারবাহী পশু' সে-শূদ্রজাতির কি গতি?

এদেশের কথা কি বলিব? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকিরণে; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা! ভারতের দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশজনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।

কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইওরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুত পদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খধ্পতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষমতাপত্তি ও তুরস্ক-স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতন্য এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্ম কর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেররা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্[১] প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্রপশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।

পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে

১. সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ

বিদ্যার্জন বা ধন সংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হন, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের ভাগ পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্যসকল শূদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ[১] ও নারদ[২], দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল, ধাবর[২] ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ-দ্রোণ-কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল; তাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর বা সারথিকুলের কি লাভ হইল বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শূদ্রকুলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের স্বসমাজত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোকসকলের ধীরে ধীরে উন্নতিবিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে, জাতিনির্বিশেষে দণ্ড পুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।

সমাজে নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়। তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তৎকালীন প্রাজসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তি ও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখাক খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যাকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহাচতা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি-সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী[৩] পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মোধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রানস-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনওমতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে।

সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ

১. বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত-ঋগ্বেদ, ৭।৩৩।১১-১৩

২. ধীবরজননীর পুত্র

৩. পশু শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে যে।

প্রজোৎপাদন ও 'যেন তেন প্রকারেণ' উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থ সিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের—ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

৭৩.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

এই নিবন্ধটি বিবেকানন্দের প্রতিভার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। শূদ্র জাগরণের বিষয়টিকে তিনি সমকালের বিশ্বের যুগস্বভাবের দিক থেকে, ইতিহাসের তথ্যমালার উপস্থাপনের প্রেক্ষাপটে, এবং সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের পটভূমিকায় পর্যবেক্ষণ করেছেন; আলোচনার মূল দৃষ্টিকোণটি হল—তুলনামূলকতার দিক। সবার শেষে আছে—সাহিত্যিক দিক থেকে বিষয়টির প্রকাশগত দিক। এই সবগুলি মিলিত ও একত্র হয়ে রচনাটিকে করে তুলেছে একান্তভাবেই বিবেকানন্দীয়।

প্রবন্ধের প্রাথমিক পর্বেই দেখা যায়, লেখক প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক ভারতের ইংরেজ প্রশাসনের (Administration) তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তুলনাটি সমাজব্যবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার। দুই ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা। ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনা বলেই তা প্রতিভার পরিচায়ক। লেকখ বলেন ঃ ইংরেজ আজ ব্রাহ্মণ, ইংরেজই আজ ক্ষত্রিয় এবং পুনশ্চ ইংরেজই আজ বৈশ্য। একা ইংরেজ প্রশাসনই প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছে। আরগ সেই ইংরেজের দ্বারা শাসিত গোটা ভারতীয়গণই আজ শূদ্রে পরিণত। এইভাবে 'শূদ্র' এই আখ্যাটিকে একটি অভিনব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পটভূমিকায় দেখা হয়েছে। লেখকের আক্ষেপ, এই রাজনৈতিক 'শূদ্রত্ব' ঘোচাবার জন্য ভারতবাসীদের মধ্যে কোনো প্রয়াস নেই, উদ্যম নেই তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অপরদিকে ভারতবাসীদের নিজেরে মধ্যেই আছে ঈর্ষা ও অনৈক্য, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেমন জাতিগত দিক থেকে শূদ্রদের নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা-অনৈক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, রাজনৈতিক শূদ্র অর্থাৎ পরাধীন ভারতবাসীদের মধ্যেও তাই দেখা যায়। একদিকে ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, অপদিকে শূদ্রগণের মধ্যেও তাই। এই স্বাভাবিক কারণেই শূত্রগণ আজ একটি পতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর লেখক রচনাবলীর বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণে রত হয়েছেন এবং সমগ্র সমকালীন বিশ্বের একটি লক্ষণকে খুঁজে পেয়েছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন—'যুগস্বভাব'। এই 'যুগস্বভাব'কে তিনি অবহেলিত উপেক্ষিত বিধ্বস্থ শূদ্রগণের পক্ষে আশাব্যঞ্জক বলে মনে করেন। বিধ্বস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে তখন দেখা যাচ্ছিল যুগ প্রভাবে বা কাল প্রভাবে সমাজের উচ্চবর্ণ ক্রমেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ নিম্নবর্ণে পরিণত হচ্ছে, বর্ণভেদ ঘুচে যাচ্ছে, শূদ্রদের পক্ষে তা শুভ ঘটনা। লেখকের মন্তব্য ঃ "কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্র জাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে।" সমকালীন ইতিহাস থেকে তিনি তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন, রোমরাজ্যের পতনের পর ইউরোপের নানা পরাধীন দেশের উত্থান ঘটেছে; মহাবল চীনের পতন ঘটছে, নগণ্য জাপান রাজনৈতিক উচ্চবর্ণ প্রাপ্ত হচ্ছে। গ্রীস-ইতালি-তুরস্ক-স্পেনের নিম্নাভিমুখ পতনও এখানে উল্লেখযোগ্য। সর্বত্রই উচ্চশক্তির পতন পরাভব এবং নিম্নশক্তির উত্থান সূচিত হচ্ছিল। বিশ্বের এবং ভারতের শূদ্রগণের পক্ষে এইসব ঘটনা বিশেষ উদ্দীপনার সূচক, সন্দেহ নেই। বিশ্বের এবং ভারতের শূদ্রগণের পক্ষে এইসব ঘটনা বিশেষ উদ্দীপনার সূচক, সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য জগতে এই যে উচ্চশক্তির ক্রমাবনতি, তার পেছনে কারণ হিসেবে আছে সোস্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ), এনর্কিজম্ (নৈরাজ্যবাদ) এবং জাইহিলিজম (জাতিবাদ)। ইউরোপের এইসব রাজনৈতিক মতবাদগুলিকেই লেখক "বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা" বলে মনে করেন। এই সব বিপ্লবের ফলেই উচ্চশক্তির পরাভব ঘটে চলেছে। এরই ফলে, অর্থাৎ ইতিহাসের এক অমোঘ নির্দেশের ফলে ও বলে ভারত ও বিশ্বের শূদ্রগণের উন্নতি আসন্ন।

কিন্তু শূদ্রগণের এই বিশ্বব্যাপী আসন্ন উন্নতি প্রসঙ্গে লেখকের দুটি বিশেষ বক্তব্যও এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, শূদ্রের যে জাগরণ ও উন্নয়ন ঘটবে, তাতে শূদ্রগণ তাদের নিজস্ব ধর্ম-কর্ম-সংকার-সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেলবে না,—"শূদ্র' ধর্ম-কর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।' দ্বিতীয়ত, সেইটি আয়ত্ত করতে গেলে শূদ্রদের নিজেদেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে, তার জন্য জাতিগত প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ "যুগ-যুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র পশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এবং দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।" অর্থাৎ কেবল যুগস্বভাব বা কালপ্রবাহের কারণেই নিতান্ত অনায়াসে ও অবলীলাক্রমেই শূদ্র-জাগরণ ঘটবে না; তাদের পক্ষ থেকেও তাদের জাতীয় কর্মসম্পাদন করতে হবে,—তবেই জাগরণ ও উন্নতি সম্ভব হবে।

লেখক এরপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজকাঠামোর দৃঢ়তা ও স্থায়ী দিকে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং সমাজে শূদ্রগণের অবস্থানের নিশ্চয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। প্রথমেই লক্ষণীয়, পাশ্চাত্য জাতি 'গুণগতজাতি'। এর অর্থ হল, ব্যক্তির নিজস্ব quality বা গুণ অনুসারে সমাজে সে উচ্চ বা নীচ স্থানে অবস্থান করে। পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও এই গুণগত জাতির দিক একটি দোষের বা অনিষ্টের কারণ। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই 'গুণগতজাতি' তত্ত্ব "শূদ্রগণকে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল"। 'গুণগতজাতি' তত্ত্ব পাশ্চাত্যের পক্ষে অনিষ্ঠের আর ভারতে পক্ষে ইষ্টের কারণ কেন? আপন প্রতিভাবলে কোন শূদ্র ধনশালী বা বলবান হলে, তাকে সমাজের উপরিতলে স্থান দেওয়া হত, এতে তার জাতি আপন বিশুদ্ধতা নিয়ে আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। তবে এ প্রথার বড়ো দোষ উন্নত ও প্রতিভাশীল শূদ্রের বিদ্যা-বুদ্ধি-ধনের ভাগ তার নিজের জাতি পেতে পারে না। তেমনি আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকুল থেকে পতিতেরা স্বাভাবিক কারণেই শূদ্রকুলে গৃহীত হত। এই শূদ্রের সংখ্যাও বেড়ে যেত।

কিন্তু আধুনিক ভারতে, ইংরেজের শাসনের ফলে কোন শূদ্র পণ্ডিত বা ধনবান হলেও, তার নিজের সমাজ ত্যাগের অধিকার নেই। "কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে।" এর ফলে আপন বৃত্তমধ্যগত শূদ্রগণের ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। ভারতে যতোদিন ইংরেজ শাসনব্যবস্থার এই বিধি প্রচলিত থাকবে, ততদিন নীচ জাতিদের এইভাবে উন্নতি হতে থাকবে। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে এইভাবে লেখক অর্থনৈতিক দিকটি জড়িত করে নিয়েছেন।

এইবার সমাজের নেতৃত্ব শক্তির সঙ্গে সমাজের সাধারণ প্রজাগণের সম্পর্কের ফলাফল ব্যক্ত করছেন লেখক। প্রজাগণই সমাজের মূল শক্তি। কাজেই এই শক্তির সঙ্গে নেতৃত্বশক্তির যদি বিচ্ছেদ ঘটে তবে, তা ওই নেতৃত্বশক্তিরই পতনের কারণ হয়। ইতিহাসেও তাই দেখা গেছে পৌরোহিত্য শক্তি রাজশক্তির কাছে, রাজশক্তি বৈশ্য শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে। অতঃপর এই বৈশ্য শক্তি শূদ্রশক্তির কাছে পরাভূত হবে। প্রতিক্ষেত্রেই পরাভবের কারণ কর্তৃসম্প্রদায় ক্ষমতাগর্বে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল।

কিন্তু এখানেও শূদ্রগণের প্রতি বিবেকানন্দের সাবধানী বাণী উচ্চারিত হয়েছে। শূদ্রশক্তির আধিপত্যের দিন সমাগত। তবে সে জন্য চাই শূদ্রদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য, প্রীতি ও সহানুভূতি। ইতিহাসেও দেখা যায়, স্বজাতি বাৎসল্য এবং শত্রুবিদ্বেষই কোনো জাতির উন্নতির মূল কারণ। স্বার্থই জীবনের শিক্ষক। ব্যক্তি ও ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষাই দেশ-জাতি-সমষ্টির উন্নতির কারণ হয়ে ওঠে। অবশ্য ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত স্বার্থের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হওয়াটাই যেন শেষে বড়ো না হয়ে ওঠে। বর্তমান ভারতে সাধারণ ভারতবাসী কোন প্রকারে উদরপূর্তিতেই সন্তুষ্ট; উচ্চবর্ণের ভারতবাসী কোনপ্রকারে ধর্মরক্ষাকেই জীবনের বড়ো আশা বলে মনে করে। লেখকের মতে, এখানেই আত্মস্বার্থ রক্ষা কোনো বৃহৎ জাতীয় স্বার্থরক্ষার সোপনে না হয়ে সমাপ্তি হয়ে থাকে, যা বিশেষ শোচনার কারণ। আত্মস্বার্থ ও ব্যষ্টি স্বার্থ রক্ষাই হবে বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার প্রাথমিক স্তর।

লেখকের এই বক্তব্য এক বিশেষ গদ্যশৈলীতে ব্যক্ত হয়েছে। মানুষকে, দেশবাসীকে আবেগচালিত করবার জন্য তিনি প্রথমাংশে নিয়েছেন পুনরাবৃত্তির আশ্রয়, একটু বা ব্যঙ্গাত্মক তির্যক দৃষ্টির অনুসরণ। নতুবা এই রচনাটিতে ইতিহাসবোধ ও যুক্তি নিষ্ঠা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশেষ প্রশংসার কারণ। শব্দচয়নের মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে, তা প্রবন্ধটিরই অন্তর্নিহিত দৃঢ়তার সূচক।

তবে, বক্তব্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি অসম্পূর্ণতা ঈষৎ পীড়াদায়ক ঃ 'গুণগত জাতি' সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য আর একটু প্রসারিত হবার অপেক্ষা রাখে। 'গুণগত জাতি' পাশ্চাত্য দেশের শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের পক্ষে কিভাবে দোষ বা অনিষ্টের কারণ হয়ে উঠেছে, সাধারণ পাঠক তা সহজে ধারণা করতে উঠতে পারে না। তেমনি, বিপরীত দিকে, সেই তত্ত্বটি প্রাচীন ভারতের শূদ্রকুলকে কি ভাবে "দৃঢ়বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল" তাও স্পষ্টতর হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

৭৩.৭ সারাংশ-১

প্রাচীন ভারতের সামাজিক কাঠামোটি ছিল এইরকম ঃ সবার উপরে ব্রাহ্মণ, তার নীচে ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য এবং সবার নীচে শূদ্রগণ। স্বভাবতই এই শূদ্রগণ ছিল সমাজে অবহেলিত ও অনুন্নত। উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা শোষিত। লেখক এই অর্থে 'শূদ্র' বর্ণকে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনি আর একটি অর্থাৎ এটিকে প্রয়োগ করেছেন ঃ ইংরেজের রাজত্বে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-মারাই, যে কোন ভারতীয় শূদ্রে পরিণত। অর্থাৎ সব ভারতবাসীই তৎকালীন ইংরেজ রাজশক্তির দ্বারা দলিত, পরাভূত। সব ভারতীয়ই তখন তাই শূদ্রের সমান। এইভাবে লেখক 'শূদ্র' আখ্যাটিকে একটি প্রসারিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কেবল সব ভারতীয়ই নয়,—পৃথিবীর যেখানে যত দলিত উপেক্ষিত-অনুন্নত সমাজ ও গোষ্ঠী আছে, তারাও যেন শূদ্র। এইভাবে ক্রমে-ক্রমে শূদ্র আখ্যাটিকে প্রবন্ধকার প্রসারিত ও বিস্তৃত করে নিয়েছেন। এই শূদ্রের জাগরণ ও উত্থান প্রসঙ্গটি আলোচ্য প্রবন্ধের বিবেচ্য। এই উত্থান ও জগরণের আছে দু'টি দিক ঃ একদিকে শূদ্রদের নিজেদের মধ্যে চাই ঐক্য-সংহতি-প্রীতর প্রতিষ্ঠা; অন্যদিকে তাদের সঙ্গে শাসকগণের সহয়োগিতা। লেখকের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য দেশে তৎকালে যে নানা রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার দেখা গেছে, তা শূদ্র-জাগরণেই পূর্বাভাস ও তার পরিপোষক। অবশ্য উচ্চবর্ণের মানুষেরা সেজন্য ভীত ও উদ্বিগ্ন। শূদ্রের এই জাগরণ হবে—শূদ্রদেরই নিজস্ব ধর্ম-কর্ম—সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার করে নিয়ে তাদেরই জীবনবৃত্তের মধ্যে এবং সর্বদেশর শূদ্রের সমাজে।

সমাজের প্রচলিত কাঠামোটিকেও এজন্য দৃঢ় করা প্রয়োজন। দেখা যায়, কোনো মানুষের গুণ বা দোষ অনুসারে সে সেই সমাজের উঁচু স্তরে ওঠে বা নীচু স্তরে নেমে যায়। এতে সমাজের বাঁধুনির দৃঢ়তা থাকে না। আবার, গুণ বা প্রতিভাবলে কোন নীচু বর্ণের মানুষ যদি সমাজের উচ্চস্তরে উঠে যায়, তবে তার নিজস্ব সমাজ তার গুণ বা প্রতিভার সুফল পায় না। তেমনি কোন ব্যক্তিগত দোষের ফলে সমাজের উঁচু তলার মানুষ নীচে নেমে এসে নীচু সমাজের আবর্জনা বাড়ায়। সমাজে ব্যক্তি মানুষের এই ওঠা-নামাটি বন্ধ করতে হবে। তবেই শূদ্রজাতির উত্থান ও উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। আধুনিক ভারতে কোন শূদ্র মহাপণ্ডিত হলে কিংবা বিশেষ ধনবান হলেও আপন বর্ণ ও সমাজ পরিত্যাগ করতে পারে না। এটিকে শূদ্র-জাগরণের একটি সহায়ক কারণ বলা যায়। এতে শূদ্রের ধন এবং প্রতিভা তাদের নিজ সমাজেরই কাজে লাগবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নীচ জাতির উন্নতি হতে থাকবে।

মানুষের সমাজ সর্বদাই বিবর্তনশীল। তাই প্রাচীন পৌরোহিত্য শক্তি একদিন রাজশক্তির নিকট পরাভূত হয়েছে; রাজশক্তি আবার পরাভূত হয়েছে বৈশ্য শক্তির কাছে। এইবার বৈশ্য শক্তি ও শূদ্রশক্তির কাছে পরাভূত হবে বলে আশা করা যায়। ইতিহাসই এ কথা বলে। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, উপরের বর্ণ বা শক্তি নীচের বর্ণ বা শক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবার ফলে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। বৈশ্য শক্তিও তেমনি শূদ্রশক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে নিজেদের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। ফলে শূদ্রের আধিপত্যের দিন সমাগত। এই অবস্থায় শূদ্রদের আশু কর্তব্য হল, নিজেরা একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 'জাতি' বা 'দেশ' গঠন করুক। কেননা, ইতিহাসে দেখা গেছে, স্বজাতির প্রতি প্রীতি এবং শত্রুর প্রতি বিদ্বেষেই এক-এক দেশ বা জাতির উন্নতি হয়েছে।

৭৩.৮ অনুশীলনী-১

১। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) স্বামী বিবেকানন্দকে কেন 'কর্মবীর' বলা হয়?

(খ) কোন্ কোন্ দৃষ্টির সমন্বয়ে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য রচিত?

(গ) 'শূদ্র' বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন?

(ঘ) শূদ্র-জাগরণের প্রাক্‌কালে শূদ্রদের কর্তব্য প্রসঙ্গে স্বামীজীর নির্দেশ ব্যক্ত করুন।

(ঙ) তাঁর সংগীতপ্রিয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(চ) বিশ্ব ধর্মমহাসভা ক'দিন চলেছিল?

(ছ) কে তাঁকে 'শক্তিধর' পুরুষ বলেছিলেন?

(জ) বিবেকানন্দের রচনাবলী কোন্ কোন্ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়?

(ঝ) তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

(ঞ) কথ্য বাংলা সম্পর্কে বিবেকানন্দের বক্তব্য বলুন।

১। নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

(ক) বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যয়নটি তুলে ধরুন।

(খ) বিবেকানন্দের প্রবন্ধসাহিত্য সম্পর্কে দু-কথা বলুন।

(গ) বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তার বিশেষত্ব কী?

(ঘ) তাঁর মতে খাঁটি সংস্কারক কে?

(ঙ) 'শূদ্র জাগরণ' প্রবন্ধটির গদ্য শৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(চ) 'বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

৭৩.৯ মূল পাঠ-২

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ এই যে, পাটলিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্যপ্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর-এ দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গালের প্রবল লিঙ্গ[১] দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুন, ক্ষতি নাই; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা-যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার

১. চিহ্ন

কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমার মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য বস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহত শক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোন প্রজারই রাজশক্তির নিয়মে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশ ভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমাক-শাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত ইহুদীবংশোদ্ভূত হইয়াও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পোল (St. Paul) কেশরী (Caesar) সম্রাটের[১] সমক্ষে আপনার অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে; এবং মুর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি' পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে? প্রাচ্য আর্যাবর্তে সকলজাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরা 'মারাঠা' জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমর্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরেজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজজাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার-রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূপ রাখা। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয় হয়। ভারতনিবাসী ইংরেজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতিবলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন যে সদাজাগরূপ বিজ্ঞান-সহায় বাণিজ্য-বুদ্ধিবলে সর্বধনপ্রসূ ভারতভূমিও ইংলণ্ডের প্রধান পণ্যবিথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরজের থাকিবে এমন ভারতরাজ্য—শত শত লুপ্ত হইলেও শত শত আবার অর্জিত হইবে। কিন্তু যদি ঐ সকল গুণ প্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরবঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে? এজন্য এ সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বও অর্থহীন 'গৌরব' রক্ষারক জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক। উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ।

৭৩.১০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশ যেমন লেখকের প্রতিভার দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল, দ্বিতীয়াংশ তদ্রূপ নয়। আসলে প্রথম অংশেই ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং বিশ্লেষণী প্রতিভার যে প্রয়োজন ছিল, দ্বিতীয়াংশে সে প্রয়োজন যেন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রথমাংশে শূদ্রজাগরণের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর দ্বিতীয়াংশে শূদ্রজাগরণের ক্ষেত্রে ইংরেজের ভূমিকাটিই লেখকের দৃষ্টিকে কেড়ে নিয়েছে। আবার, এই ইংরেজের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্গিকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যে পথে চারণা করেছেন, সমস্যার পটভূমিকাটি অভিন্ন বলে, বিবেকানন্দও মোটামুটি সেই পথে

১. রোমক সম্যাট সীজার

গিয়েছেন। সকলেই ইংরেজের মধ্যে দুই বিপরীত সত্তাকে দেখেছেন ঃ একটি ভালোর দিক, ভারতবাসী যার ফলে নানাভাবে উন্নত হবার সুযোগ পেয়েছে। অপরটি ইংরেজের দোষ-দুর্বলতার দিক। শূদ্র-ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র তুলেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে তোলেননি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের যে রাজনৈতিক-সামাজিক সুযোগ সুবিধের কথা তুলেছেন, আধুনিক ভারতে ব্রাহ্মণের রাজনৈতিক-সামাজিক সুযোগ সুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নতুবা বঙ্কিচন্দ্রের মতে, প্রাচীন ভারতীয় শদ্র আর আধুনিক ভারতের শূদ্রগণের মধ্যে কোনো তফাত নেই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণই ছিল ইংরেজবৎ। কাজেই তখন শূদ্রগণ অত্যাচারিত হত ব্রাহ্মনের দ্বারা, আধুনিক ভারতে ইংরেজের দ্বারা। কিন্তু শূদ্রের উন্নতির বা জাগরণের কোনো পথ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করেন নি। আলোচ্য প্রবন্ধে বিবেকানন্দ যা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ-তিনজনেই ইংরেজের সহযোগিতার প্রশ্নটি তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, বিবেকানন্দের মতে, ইংরেজের 'গৌরব রক্ষা', প্রভৃতি কারণে ইংরেজ ভারতবাসীর জন্য কল্যণকর্ম করতে রাজী নয়। শূদ্রের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের নিপীড়ণমূলক আচরণকে রবীন্দ্রনাথ কবি-সুলভ মানবিক দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, যাকে নীচে ও পশ্চাতে রাখা হয়, সেই উচ্চবর্ণকে ' পশ্চাতে টানিছে'। বিবেকানন্দ সেখানে ইতিহাসের নজির উত্থাপন করে বলেন, সমগ্র বিশ্বেই আজ উচ্চবর্ণের ও শক্তিধর রাষ্ট্রের পতনের পালা এবং শূদ্রের উত্থানের যুগ চলছে। স্বাভাবিক কারণেই বিবেকানন্দ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের দিকটিকে আশ্রয় করেছেন। অবশ্য, 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসের তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

বিবেকানন্দের 'শূদ্রজাগণে'র প্রসঙ্গে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' এবং তারই অন্তর্গত 'কবির দীক্ষা' রচনা দুটির উল্লেখ করে থাকেন। বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, বিচ্ছিন্ন করে রাখবার ফলে পৌরোহিত্য শক্তি রাজশক্তির কাছে এবং রাজশক্তি বৈশ্য শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে আসছে এবং এই সূত্রানুযায়ী এই বার শূদ্রের আদিপত্যের দিন সমাগত। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা' বিবেকানন্দের পরবর্তী কালে রচিত, স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ আরো পরবর্তীকালীন চিন্তার অবকাশ পেয়েছেন। রথের চাকা আর্য শক্তির টানে না চলে অনার্য শক্তির টানে যেখানে চলতে শুরু করেছে, সেখানে শূদ্র বা অনার্য শক্তির উল্লাসিত হবার কারণ নেই। কারণ, বিজয়লাভের পর তারাও যদি নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তবে তাদেরও পতন অনিবার্য। 'কবির দীক্ষা'র সন্ন্যাসী কি বিবেকানন্দ? বিবেকানন্দ হোন বা না হোন রবীন্দ্রনাথের রাজাগণ 'রাজর্ষি', একাধারে রাজা ও ঋষি। এই ঋষিবৎ নিরাসক্ত চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রথমাবধি আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রকল্পনারয় 'রথের রশি'র 'রশি' শেষে মানববন্ধনে পরিণত হয়েছে—'এখন আর দেরী নয় ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্গো।' উচ্চ নীচ সকলের হাতে হাতে বন্ধন তৈরি করে কালের রথ চালনা করা। আর যদি তা না করা হয় তবে শূদ্রদেরও একদিন পরাভব স্বীকার করতে হবে।

৭৩.১১ সারাংশ-২

প্রবন্ধের প্রথম অংশে শূদ্রদের অবনতিরও অনুন্নতির কারণ নির্দেশ করেছেন লেখক। সেই সঙ্গে নির্দেশ করেছেন— শূদ্রগণের জাতীয় কর্তব্য। আর, প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে আছে, বারতের তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর কর্তব্য কথা। ভারতের তৎকালীন শাসক বলতে-ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রাচীন ভারতের মৌর্যযুগের পর ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার মত এত সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা আধুনিক ভারতে আর দেখা যায়নি। তবে, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার দোষ এবং গুণ-দুইই আছে। গুণের দিকটি এই ঃ ব্রিটিশ জাতি যেন বৈশ্যজাতি, বৈশ্যের মতই বেনে। তবে ব্রিটিশ-বানিয়া দেশ-বিদেশ থেকে কেবল ভোগ্যপণ্যই ভারতে নিয়ে আসেনি; সঙ্গে এনেছে দেশ-বিদেশের নানা ভাব-ভাবনা। শূদ্র-ভারতবাসী দেশ বিদেশের সেইসব ভাব-ভাবনায় ক্রমে ক্রমেই উন্নত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় কিছু দোষের দিকও আছে; এই শাসন-ব্যবস্থা এত দৃঢ় ও নিয়মবদ্ধ যে তার ভারতবাসীর চিন্তা শক্তিকে হ্রাস করে দিচ্ছে। জাতীয় জীবনে তাকে জড় করে রাখছে।

অতঃপর লেখক রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র— এই দুই শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করে দেখাচ্ছেন, রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই প্রজার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়, — অন্তত ইতিহাসে সাক্ষ্য তাই। ইতিহাস থেকে লেখক তার দৃষ্টান্ত সংকলন করেছেন। রাজতন্ত্রে স্বোচ্ছাচারী রাজা কোন প্রজাকেই সুবিধা দেন না, কাজেই বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সুযোগ পাবার কোন সম্ভাবনাই সেখানে নেই। প্রজাদের মনের মধ্যেও এজন্য কোন অসন্তোষ থাকে না। রাজার কৃপা অর্জনের জন্য প্রজাদের মধ্যেও কোন প্রয়াস ও প্রতিযোগিতা থাকে না। কিন্তু প্রজাতন্ত্রে বা প্রজা নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থায় শাসক-শাসিতের মধ্যে বহু পার্থক্য এসে পড়ে। প্রজাদের স্ববশে রাখবার জন্য, শাসকগোষ্ঠী তাদের সব শক্তি শাসিতের কল্যাণের জন্য ব্যয় না করে নিজেকে দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে তা নিয়োগ করে। এতে শক্তির অপচয় এবং অপব্যয় ঘটে। ইংরেজের শাসপ্রণালীর বিশিষ্টতা ও দৃঢ়তা একদিকে শূদ্ররূপী ভারতবাসীকে জড়ত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, অপরদিকে শাসকরূপে ইংরেজ তার আপন শক্তিকে নিজ গৌরব প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করছে।

আজ ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য নিজেদের মধ্যে যে সংশয়-বিতর্ক-বিদ্বেষের ভাব আছে, তাকে সরিয়ে ফেলে একত্র হওয়া। অন্যদিকে ইংরেজও আজ ভুল করছে ঃ যে বীরত্ব, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে তারা একদিন ভারতবর্ষ জয় করেছে, তারা মনে করে, তাদের সেই জাতীয় 'গৌরব' রক্ষা করে চললেই বুঝি এদেশে তা চিরস্মরণীয় হবে। তাদের সব শক্তি তাই আজ সেই জাতীয় 'গৌরব' রক্ষার প্রতি নিয়োজিত। তাদের এই শক্তিকে তারা যদি শূদ্র-ভারতের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত করত, তবে ভারত ও ব্রিটেনে উভয় দেশেরই মঙ্গল হত। ফলে শূদ্র ভারতের জাগরণও উন্নতি ত্বরান্বিত হত।

৭৩.১২ অনুশীলনী-২

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার গুণের দিকটি কী?

(খ) ইংরেজকে 'বৈশ্য' কেন বলা হয়েছে?

(গ) কেন ব্রিটিশশাসন-ব্যবস্থায় ভারততবাসী 'জড়' হয়ে পড়ছে?

(ঘ) কেন ইংরেজগণ ভারতবাসীর মনে ইংরেজ জাতির'গৌরব' কে সদাই জাগিয়ে রাখতে চায়?

(ঙ) 'যেন তেন প্রকারেণ' —এই বাগধারাটি আলোচ্য প্রসঙ্গে কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

(ক) রাজতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দোষ গুণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রসঙ্গটি অবতারণার কারণ কী?

(খ) শূদ্রজাগরণের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সহজ কথা বিশ্লেষণ করুন।

(গ) 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৭৩.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বর্তমান ভারত।

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালান্তর। সভ্যতার সংকট। রথের রশি। কবির দীক্ষা।

(৩) অধীর দে ঃ আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা।

পত্রপত্রিকা ঃ 'কোরক' বিবেকানন্দ সংখ্যা ২০১৩

একক ৭৪ ❑ নিয়মের রাজত্ব—রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

গঠন

৭৪.১ উদ্দেশ্য
৭৪.২ প্রস্তাবনা
৭৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জীবন কথা
৭৪.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য
৭৪.৫ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)
৭৪.৬ সারাংশ
৭৪.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭৪.৮ অনুশীলনী-১
৭৪.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
৭৪.১০ সারাংশ
৭৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭৪.১২ অনুশীলনী-২
৭৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৭৪.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করলে আপনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- তাঁর গদ্যরীতির বিশেষত্বগুলি অনুধাবন করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে জানতে পারবেন।

৭৪.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর জীবনে যে রেনেসাঁস দেখা দেয়, তার ফল রূপে রস-সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় বাঙালী আপনাকে বিস্তৃত করতে আগ্রহী-উৎসাহী হয়। নানা সাময়িক পত্রে এবং গ্রন্থাদিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ—কেউই এ বিষয়ে গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি না লিখে পারেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেই সব লেখকের অন্যতম। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা নির্মাণে অধিকতকর উদ্যোগী ছিলেন এবং বাঙালী জীবনে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান-মনস্ক করে তোলবার দিকে মন দিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাদি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লিখিত হয়—যাতে সাধারণ বাঙালী সে সব রচনাদি পড়ে সচেতন হয়ে ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনের এক দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি দার্শনিকের মতো চিন্তা করেছেন, বৈজ্ঞানিকের বস্তুনিষ্ঠা নিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন এবং সবার শেষে সাহিত্যিকের রসবোধ দিয়ে তার প্রকাশ করেছেন। বাঙলা ভাষায় চার্লস ডারউইনের তত্ত্বকে তিনিই প্রথম বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় দর্শনের বেদান্তবাদও তাঁর আলোচ্য দিক। ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের মিশ্রণসাধন তাঁর একটি বড়ো অবদান। দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময়েই

সাহিত্য বা প্রাত্যহিক জীবনের নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটিকে হৃদ্য ও প্রাঞ্জল করে তুলতেন। তাঁর গদ্যও বিশেষত্বপূর্ণ। আলোচ্য 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪) থেকে গৃহীত। প্রবন্ধটি একটি সুলিখিত প্রবন্ধ এবং সে কারণেই এটি বহুপঠিত।

৭৪.৩ রামেন্দ্রসুন্দর ঃ জীবনকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১২৭১ বঙ্গাব্দ/ইং ১৮৬৪—১৩২৬ বঙ্গাব্দ/ইং ১৯১৯) পূর্বপুরুষ বুন্দেলখণ্ড থেকে বঙ্গদেশের ফতেপুরে আসেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার শঙ্কিতপুরের কাছে টেঙা বৈদ্যপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। কর্ম ও বিবাহসূত্রে এঁরা জেমো (কান্দি) রাজবাড়ীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে প্রথম হন, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ১৮৮৭-তে তিনি বিজ্ঞানে এম. এ. (তখন এম. এস, সি. চালু হয়নি) পাশ করেন, প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতার রিপণ কলেজের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিজ্ঞান বিভাগরে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হন,—আমৃত্যু সেই পদেই কর্ম করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র বলতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ দীর্ঘদিনের নানাভাবে। তাঁর দুই কন্যা—চঞ্চলা ও গিরিজা।

রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রভাবিত করেছেন একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষেদে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সাহিত্যের সহযোগীরূপে পান। বি.এ. পড়বার সময়েই 'নবজীবন' পত্রিকায় 'মহাশক্তি' (১২৯১ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাসে) তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, যদিও তা বেনামীতে। তিনি ছিলেন স্বভাষা ও স্বদেশানুরাগী, আদর্শনিষ্ঠ। বাঙলা ভাষায় বিজজ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃধ্বি করবার জন্যই তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষিক শব্দের বঙ্গানুবাদে ব্রতী হন। ভারতের প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাস একদিকে যেমন তাঁর প্রশংসার কারণ হয়েছে অপদিকে কেউ কেউ সে বিষয়ে সপ্রশংস হতে পারেন নি। 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে' বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধে বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের সমন্বয়কে প্রশংসা চোখে দেখেননি। নিজে বিজ্ঞানী বলেই সত্যেন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা আশা করেছিলেন। আসলে এ বিষয়ে যাঁরা রামেন্দ্রসুন্দরের সমর্থক তঁরা অন্য কথা বলতেন। আধুনিক পশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারায় রামেন্দ্রসুন্দর কোনো মৌলিক গবেষণা না করে প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের আলোকে তিনি বিজ্ঞানের 'ফাঁকি' ধরে ফেলেছিলেন, এতই তারা উল্লসিত হতেন।

মানুষ হিসেবে শিক্ষক হিসেবে একটি কলেজের প্রশাসনিক হিসেবে, আদর্শ একজন গৃহীরূপে, স্বদেশসেবক রূপে, রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্বের যে প্রমাণ-পরিচয় মেলে, তা খুবই প্রীতি প্রদ। শিক্ষক হিসেবে ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়টি বাংলা ইংরেজি—দু'ভাষাতেই পড়াতেন। তাঁর শিক্ষকসত্তা তাঁর প্রবন্ধের রচনারীতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সমালোচনক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে যে অতি-কথন দোষ আবিষ্কার করেছিলেন, মনে হয়, শিক্ষকরূপে পাঠকদের বোঝাতে গিয়েই সেটি ঘটেছে।

রাত জেগে পড়া শোনা করতেন তিনি। এর ফলে শীঘ্রই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। যকৃতের পীড়া মস্তিষ্কের রোগে তিনি আক্রান্ত হন। মাতা এবং কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুশোকে তিনি মানসিক দিক থেকে বিশেষ আহত হন। মাত্র ৫৫ বছর বয়সেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৭৪.৪ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্য

তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে রামসুন্দর বেশী পরিমাণে রচনাদি লিখে যেতে পারেন নি। জীবনের শেষ পর্বে তিনি যখন নব্য-ডারউইনবাদ এবং জগতের নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতাকে পরিত্যাগ করে এক দার্শনিক অনুভবের ক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছিলেন, সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। রোগাক্রান্ত হয়ে শেষের দিকে তিনি নিজে আর লিখতে পারতেন না, তাঁর বক্তব্য লিখে নেওয়া হত। তাঁর এই কথন ছিল বিচিত্র প্রসঙ্গকে ঘিরে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রণীত, প্রবন্ধগুলি এই ঃ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা' (১৯০৬)। 'মায়াপুরী' (১৯১১), 'কর্মকথা' (১৯১৩), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ (১৯১৪), 'শব্দকথা' (১৯১৭), 'মৃত্যুর পর প্রকাশিত— 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০), 'যজ্ঞকথা' (১৯২০), 'নানাকথা' (১৯২৪), 'জগৎকথা' (১৯২৬)। রামেন্দ্রসুন্দরের অধিকাংশ গ্রন্থের নামে 'কথা' শব্দটি আছে। এটি অকারণে নয়। তাঁর বক্তব্যকে দুরূহ প্রবন্ধের ভঙ্গিতে প্রকাশ না করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলার ভঙ্গিতে যেন প্রকাশ করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি বিচার করলেই তাঁর আলোচ্য বিষয়গুলি মোটামুটি জানা যায়। যেহেতু তিনি মূলত বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক, সেইহেতু বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক থেকে বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে লক্ষ্য করার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। জীবনের প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে উৎসাহী হন। বিভিন্ন বঙ্গীয় সাময়িক পত্রে (যথা ঃ 'প্রদীপ', 'জন্মভূমি', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'সাহিত্য ভারতী', 'সাধনা', 'নবপর্যায় বঙ্গ-দর্শন' 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী') তিনি অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ লিখে গেছেন।। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছিলেন চার্লস ডারউইন। ডারউইনের তত্ত্বকে যাঁরা বিস্তৃত করে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন-টমাস হেনরি হাক্সলি। হার্বর্ট স্পেনসারের Synthetic Philosophy অর্থাৎ সমন্বয়ী দর্শনের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত। এই সমন্বয়মূলক দর্শনকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন, হিন্দু ও খ্রীষ্টানের ধর্মচিন্তা, কর্ম ও বৈরাগ্যের বিরুদ্ধতার মধ্যে সম্মিলন,—ইত্যাদি ক্ষত্রেও প্রসারিত করে নিয়েছিলেন। 'চরিত কথা' গ্রন্থে জার্মান বৈজ্ঞানিক হেলস হোলৎজ এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী এবং সেগুলির অন্তর্নিহিত চিন্তার মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি রিপণ কলেজে রামেন্দ্রসুন্দরের সহকর্মী ছিলেন এবং এঁর সঙ্গেই রামেন্দ্রসুন্দর নিজের গভীরতম চিন্তাগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক গবেষণা করেননি, তথাপি প্রমথনাথ তাঁকে 'বিজ্ঞানের ঋষি' আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রমথনাথের মন্তব্য ঃ "যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞানের সৃষ্টি না করিলেও বীজমন্ত্রগুলি যাঁহাদের ধ্যানে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা বিজ্ঞানের কবি; রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, কেন না, তাঁহারা ধ্যানে বিজ্ঞান যেমন স্বরূপে ধরা দিয়েছিল, তেমন ধরা বিজ্ঞান সচরাচর দেয় না।" বিজ্ঞানের এই স্বরূপ যাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়বে, তিনিই বিজ্ঞানকে যথার্থভাবে আয়ত্ব করতে পারবেন। বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য হল, বিজ্ঞান নিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যা নতুন নিয়ম কালকের গবেষণায় তা মিথ্যে বলে প্রায়ই প্রমাণিত হয়। আলোচ্য 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির মধ্যেও পরোক্ষভাবে একথা বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব একটি স্থায়ী সত্যকে আবিষ্কার করেছিল ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্যা যা পারেনি। এইখানেই বিজ্ঞানবিদ্যা (বা অপরাবিদ্যা)-র ওপর পরবিদ্য বা দর্শনের জিত। রামেন্দ্রসুন্দর শেষ পর্যন্ত তাই বিজ্ঞানের ওপর দর্শনকে স্থান দিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'তে তিনি বিজ্ঞানের জগৎকেই মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপর 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর দার্শনিক চিন্তার ক্রমিক উন্মেষ ঘটতে থাকে। 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) বইতে তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তাঁর চিন্তার মধ্যে আমরা একটি বিবর্তন দেখতে পাই।

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের যে style বা শৈলটি তা সাহিত্যের দিক থেকে আজও তাঁকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং নানা ধরনের সাহিত্য থেকে আহৃত রূপ-উপমা-উদাহরণ দিয়ে পরিস্ফুট করতেন। এতে যেন এক ধরনের কথা শিল্পী সুলভ ভঙ্গি তাঁর রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠত। রামায়ণ-মহাভারত, ঈশপের গল্প, কালিদাসের সাহিত্য (আলোচ্য 'নিয়মের রাজত্বে' 'কুমারসম্ভব' থেকে একটি প্রসঙ্গকে উদাহরণ রূপে তিনি গ্রহণ করেছেন)। বঙ্কিমসাহিত্য (কখনো রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কিংবা তির্যক উল্লেখ), বিবিধ অভারতীয় সাহিত্য, এবং এমন কি সমকালীন নানা ঘটনার উল্লেখ করে তিনি তাঁর

বক্তব্যকে পাঠকের কাছে হৃদ্য ও মনোরম করে তুলতেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক william Kingdom Clifford (১৮৪৫-১৮৭৯) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় একটি উদ্ভট ছোটগল্প লিখেছিলেন। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রকৃতির মূর্তি' প্রবন্ধে কিংবা 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'অতিপ্রাকৃত প্রথম প্রস্তাব' প্রবন্ধে ক্লিপোর্ড-এর সেই গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশটির উল্লেখ করে আপন রচনার সুখপাঠ্যতা বৃদ্ধি করেছেন, যদিও ক্লিফোর্ড-এর নাম সেখানে করেন নি। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য খুব সচল এবং কৌতুক দীপ্ত ছিল।

৭৪.৫ মূল পাঠ (প্রথম অংশ)

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে-কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্ব্বত্রই নিয়ম, সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা। ভূতপূর্ব্ব আর্গাইলের ডিউক নিয়মের রাজত্ব সম্পর্কে একখানা বৃহৎ কেতাবই লিখিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্ত্তমান, তাহার একটাকেও ফাঁকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠ হইয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা মিরাকল্ বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময় নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাহারা মিরাকল্ মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্ব্বোধ পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কখনও বা উভয় পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধের পরিবর্ত্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ না মনে করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাকে বলে? দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূ-পৃষ্ঠে অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই ঊর্দ্ধমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল কেন, যে কোন দ্রব্য ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করে না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবা মাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে—লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে—লোকটা পাগল; কেহ বলিবে—লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হইতেও

বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্ত্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেহ না, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল,—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ-হেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে; আম ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাশূট-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পূর্ব্বে এক নিঃশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন-পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হঠিবার নহেন, তাঁহার বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে; শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিষটা উপরে উঠিতেছে, কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিষটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না। ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল উইতে তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইল।

উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে, কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ!

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্ব্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষা যোজনায় দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম ঃ—

ধারা।—কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধগামী হইবে।

ব্যাখ্যা।—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ।—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্ধ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এখন দেখা যাউক, কত দূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সুতরাং উহার ব্যভিতার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখনও বা উপরে উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্য প্রদেশে, পাম্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদ মধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহার ব্যাভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধিই এই বিষম সংশয় উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মানুষ বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি!

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া;—নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কি না, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই তেমনই মগ্ন দ্রব্য মাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে। যার যত্ জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"।

এখন এ পক্ষ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিবেন,—দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম; কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা—

১নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তু মাত্রই নিম্নগামী হয়।

২নং ধারা—তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই ঊর্দ্ধগামী হয়।

৩নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল-ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল-ফল মানুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে ঊর্দ্ধগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন না, পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান।

পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়, তাহা কিন্তু সকলে জানিত না। দুই শত বৎসরের অধিক হইল, এক জন লোক পৃথিবীতে জানান, অয়ি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ কেবল নারিকেল-ফলেই ও আতা-ফলেই

আবদ্ধ নহে; তোমার আকর্ষণ বহুদূরব্যাপী। তোমার অধম সন্তানেরা তাহা জানিয়াও জানে না। এই ব্যক্তির নাম সার আইজাক নিউটন।

তিনি জানাইলেন দূরস্থ চন্দ্রদেব পর্যন্ত পৃথিবী মুখে নামিতেছেন, ক্রমাগত ভূমিস্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল স্পর্শলাভটি ঘটিতেছে না। কেবল তাহাই কি? স্বয়ং দিবাকর, তাঁহার পার্ষদবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথিবী মুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ সকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন; স্বস্থানে স্থির থাকিতে কাহারও চেষ্টা নাই; সকলেই সকলর দিকে ধাবমান।

ধাবমান বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বিধানে; পৃথিবী সূর্য্য হইতে এত দূরে আছেন; আচ্ছা, পৃথিবী এইটুকু জোরে সূর্য্যের অভিমুখে চলিতে থাকুন। চন্দ্র পৃথিবী হইতে এতটা দূরে আছেন; বেশ, চন্দ্র প্রতি মিনিটে এত ফুট করিয়া পৃথিবী মুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজেও চন্দ্র হইতে এত দূরে আছেন, তিনিও মিনিটে চন্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাঁহার কলেবর কিছু গুরুভার, তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে চলিলেই হইবে; চন্দ্র পৃথিবীর তুলনায় লঘুশরীর; তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে না চলিলে হইবে না। তুমি বৃহস্পতি, বিশাল কায় লইয়া বহু দূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সূর্য্যদেব বর্ত্তমান; তুমি তাঁহার অভিমুখে এই নির্দ্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য; আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকেও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক্ দিয়াও একটু ঘুরিয়া চলিতে হইবে। আর শনৈশ্চর, কোটি কোটি লোষ্ট্রখন্ডের মালা পরিয়া গর্ব্ব করিও না, এই ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে উপহাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। নেপচুন, তুমি বহু দূরে থাকিয়া এত কাল লুকাইয়াছিলে; বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।

আবিষ্কৃত হইল বিশ্বজগতে একটা মহানিয়ম;—একটা কঠোর আইন; এই আইন ভঙ্গ করিয়া এড়াইবার উপায় কাহারও নাই। সূর্য্য হইতে বালুকণা পর্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, নির্দ্দিষ্ট বিধানে নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছে। খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিতে পারি, ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নকালে কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিবেন। এই যে কঠোর আইন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে প্রচলিত আছে, ইহার এলাকা কত দূর বিস্তৃত? সমস্ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যে কি এই নিয়ম চলিতেছে? বলা কঠিন। সৌরজগতের মধ্যে ত আইন প্রচলিত দেখিতেই পাইতেছি। সৌরজগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর পাওয়া দুষ্কর। খগোলমধ্যে স্থানে স্থানে এক এক জোড়া তারা দেখা যায়; তারকাযুগলের মধ্যে একে অন্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। যেমন চন্দ্র ও পৃথিবী এক জোড়া বা পৃথিবী সূর্য্য আর এক জোড়া, কতকটা তেমনই। পরস্পর বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার চেষ্টা দেখিয়াই বুঝা যায়, সৌরজগতের বাহিরেও এই আইন বলবৎ। কিন্তু সর্ব্বত্র বলবৎ কি না, বলা যায় না। কেন না, সংবাদের অভাব। দূরের তারাগুলি পরস্পর হইতে এতদূরে আছে যে পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামান্য যে, তাহা আমাদের গণনাতেও আসে না, আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরও হয় না।

৭৪.৬ সারাংশ

পার্থিব জগতে বা সৌরলোকে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের কোথাও কোন প্রকার অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা নেই। সর্বত্রই নিয়ম। নিয়মের রাজত্ব সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়মের মূল কারণ-বস্তু ও পদার্থের 'আকর্ষণ' এবং 'চাপ'। আকর্ষণ এবং চাপ-এর নিয়মটিকে তিনটি ধারায় ব্যক্ত করা যায়। প্রথমত, পার্থিব আকর্ষণে রপ্ত মাত্রই নিম্নগামী হয়। এই নিয়মের নাম 'ভৌম আকর্ষণ' বা 'মাধ্যাকর্ষণ'। দ্বিতীয়ত, তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই ঊর্ধ্বগামী হয়। তরল পদার্থ বলতে যেমন—জল, তেল বা পারদ। এইখানে বস্তু বা দ্রব্যের লঘু-গুরুর তারতম্যের দিকটি আছে। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের চেয়ে গুরু কি লঘু, তা দুটি সমান আয়তনের দ্রব্য নিয়ে ওজন করে দেখতে হবে। যেটি ওজনে গুরু, সেটি তরল বা বায়বীয়

পদার্থে নিম্নগামী হবে; আর যদি লঘু হয়, তবে উর্ধ্বগামী হবে। তৃতীয়ত, আকর্ষণ ও চাপ একই সঙ্গে কাজ করে; আকর্ষণ প্রবল হলে বস্তুকে নামায়;তা চাপ প্রবল হলে বস্তুকে ওপরের দিকে তোলে। সেখানে আকর্ষণ ও চাপ সমান, বস্তু সেখানে স্থির থাকে।

এই নিয়ম কেবল পার্থিব জগতের পদার্থের ক্ষেত্রেই খাটে না। স্যার আইজ্যাক নিউটন প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন— সৌরজগতও এ নিয়েমর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও চালিত। আকর্ষণ এখানেও কাজ করছে। পৃথিবীর আকর্ষণে সৌরজগতের চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীর দিকে আসতে চাইছে। পৃথিবীও আবার, সেই আকর্ষণের কারণেই, চন্দ্র-সূর্যের দিকে যেতে চাইছে। ফলত, সব গ্রহ-উপগ্রহই অপর গ্রহ-উপগ্রহের দিকে ধাবমান। তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট বটে, তবে তার পেছনেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এ হল, বিশ্বজগতের এক 'মহা-নিয়ম'। অঙ্ক কষে আগের থেকেই বলে দেওয়া যায়, কবে, কোনদিন কখন, কোন্ গ্রহ বা উপগ্রহ তার কক্ষ-পথের কোথায় অবস্থান করবে। সৌরজগতে যখন এই রকম নির্দিষ্ট নিয়মের আবর্তন বর্তমান তখন অনুমান করা যায়, সৌরজগতের বাইরেও যে জগৎ আছে, সেখানেও এই ধরনের কোন নিয়ম অনুসৃত হয় তবে, প্রবন্ধ রচনাকালীন সময় পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

৭৪.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের প্রথম অংশের উপস্থাপন রীতিটি খুবই হৃদ্য এবং মনোহর। লেখক এক কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে সম্মুখে রেখেছেন। এই কাল্পনিক প্রতিপক্ষ যেন একটার পর একটা প্রশ্ন করছেন আর লেখক তার উত্তর দিয়ে গেছেন। এইভাবেই প্রবন্ধটির কায়া নির্মিত হয়েছে। যেন একটা প্রশ্ন-উত্তরের ভঙ্গি, যা কথোপকথনেরই প্রসারিত একটি দিক। কাল্পনিক প্রতিপক্ষের প্রশ্নগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে করা হয়েছে। তার একটি ক্রমও অনুসরণ করা হয়েছে। এক একটি প্রসঙ্গ আসছে, সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে এবং পরবর্তী সূক্ষ্ম স্তরের প্রশ্ন আসছে এইভাবে সরল থেকে জটিল দিকে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম দিকে প্রসঙ্গের প্রবর্তন ঘটেছে। এর ফলে একটি বিশেষতত্ত্বকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অন্তরে ধারণ করা সহজতর হয়েছে। ইচ্ছে করেই লেখক এখানে এই Style বা শৈলীটি গ্রহণ করেছেন।

প্রবন্ধটির রচনাগত অপর বিশেষত্ব হল, সমগ্র রচনাটির মধ্যে আইনের রূপক গ্রহণ করা। যেহেতু প্রবন্ধটির নামের মধ্যে 'রাজত্ব' কথাটি আছে, সেই জন্য সেই রাজত্বের আইন-শৃঙখলা-নিয়ম অনুসরণের দিকও আছে। এজিন্য প্রবন্ধটিতে আইন প্রণয়ন, আইন প্রবর্তন মান্য করে চলা—এইসব দিকগুলির রূপকময় উল্লেখ আগা-গোড়া লক্ষ্য করা যায়।

প্রবন্ধটির রচনাগত তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, লৌকিক ও প্রাত্যহিক জগৎ থেকে অতি পরিচিতি দৃষ্টান্তমালা প্রয়োগ করে বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করা। অপরদিকে তেমনি সেই দৃষ্টান্তগুলিকে লঘু হাস্যরসাত্মক করে তোলা। এতে পাঠকের সঙ্গে একটি Intimacy বা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ক. ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক, তির্যক উক্তি ঃ "কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠ হইয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।"

খ. রসিকতা ঃ "যে দিন লোষ্ট্রপতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।"

গ. কারো গাছের নারিকেল বৃন্তচ্যুত হয়ে 'বেলুনে'র মতো আকাশে উঠতে দেখলে তাকে বলা হবে—সে 'মিথ্যাবাদী' বা পাগল বা বলবে 'লোকটা গুলি খায়' যিনি রসায়ন শাস্ত্র পড়েচেন তিনি হয়তো বলবেন ঃ "হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল।"

ঘ. "আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে, গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী।" 'গুরু' শব্দটি নিয়ে এখানে Pan বা ঘমক সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঙ. "রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।" এখানে ব্যক্তিকে পদার্থ রূপে কল্পনার মধ্যে রসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ. "যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"। এখানে প্রসঙ্গটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে গৃহীত। উমা তপস্যারতা ছিলেন, হঠাৎ মহেশ্বর তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত। উমা অগ্রসর হতেও পারছিলেন না, পেছতেও পারছিলেন না। একই স্থানে স্থির থাকলেন। উমার অবস্থাটি সমান আকর্ষণ ও চাপযুক্ত কোনো পদার্থের মতো।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হল। এই রকম উদাহরণ আলোচ্য অংশেই আরো আছে। বিশেষ করে আইজ্যাক নিউটন কর্তৃক প্রকৃতিকে 'মাতৃ' সম্বোধন করে উক্তিটি। কিংবা শনি, নেপচুন বা ইউরেনাস-প্রসঙ্গে লেখকের সকৌতুক মন্তব্য।

বিষয়বস্তুর বিন্যাসের দিক থেকে আলোচ্য অংশটির বিশষত্ব হল, লেখক তাঁর বক্তব্যকে দুটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম স্তরে আছে পার্থিব বস্তুর চাপ ও আকর্ষণের প্রসঙ্গ। আর দ্বিতীয় স্তরে আছে অপার্থিব ও সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ। এইভাবে দুটি স্তরে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করবার ফলে পাঠকের কাছে বিষয়টিও সহজবোধ হয়ে উঠতে পেরেছে। সৌরজগৎও যে একটা নিয়মের অধীন লেখক তার নাম দিয়েছেন—মহানিয়ম'। এটি তাঁর নিজের সৃষ্ট শব্দ,—এ ধরনের শব্দের সৃষ্টি ও ব্যবহারও রচনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

লেখক পাঠককে ক্রমে-ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্যের দিকে নিয়ে গেছেন। এ জন্যই তিনি বিশেষভাবে প্রবন্ধটির কায়া বিন্যস করেছেন এবং পাঠকের সঙ্গে communication সৃষ্টির জন্য প্রশ্ন-উত্তরের উপস্থাপন রীতিটি গ্রহণ করেছেন।

৭৪.৮ অনুশীলনী-১

ক. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা অপেক্ষা বিজ্ঞানের কোন্ দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন?

২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি কেন অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লিখিত হয়েছে?

৩। তিনি ভারতীয় দর্শনের কোনই দিকটিকে ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন?

৪। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি তাঁর কোনই প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে গৃহীত?

৫। রামেন্দ্রসুন্দরের মূল কর্মক্ষেত্র দু'টির নাম বলুন।

৬। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম কী?

৭। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে কী মন্তব্য করেছেন?

৮। রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষক-সত্তা তাঁর প্রাবন্ধিক-সত্তার মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল?

৯। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির নাম করুন।

১০। রামেন্দ্রসুন্দরকে কেন 'বঙ্গের হার্কুলি' বলা হত?

খ. **নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ**

১। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদির মূল্যায়ন করুন।

২। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাদির উপস্থাপন ও গদ্যগীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

৩। বিজ্ঞান থেকে দর্শনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রমানসের বিবর্তনের ধারাটি তুলে ধরুন।

৪। বস্তুর 'আকর্ষণ' ও 'চাপে'র যে নিয়মগুলির কথা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, সেগুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করুন।

৫। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির এই অংশে বিন্যাসের যে দুটি স্তর দেখা যায়, সে বিষয়ে মন্তব্য করুন।

৭৪.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

সম্ভবত এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। সমস্ত খগোলমধ্যে সকলেই সম্ভবতঃ এই আইনের অধীন। কিন্তু যদি কোন দিন আবিষ্কৃত হয় যে, কোন একটা তারা বা কোন একটা প্রদেশের তারকাগণ এই আইন মানিতেছে না, তাহা হইবে কি হইবে? যদি বিশ্ব-সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশের মধ্যে এই আইন না চলে, তবে কি ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না?

মনে কর, নিউটন সৌরজগতের মধ্যে যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা গেল, বিশ্ব-জগতের অন্য কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, সেখানে গতিবিধি অন্য নিয়মে ঘটে; তখন কি বলিব? তখন নিউটনের নিয়মকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিব, বিশ্ব-জগতের এই প্রদেশে এই নিয়ম; অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্য নিয়ম। এই প্রদেশে এই নিয়মের ব্যভিচার নাই, ঐ প্রদেশে ঐ নিয়মের ব্যভিচার নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই নিয়মের বন্ধন,—জগৎ নিয়মের রাজ্য। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম সর্ব্বত্র চলে না বটে, কিন্তু কোন-না-কোন নিয়ম চলে।

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন উপায় থাকিতেছে না। কোন একটা নিয়ম আবিষ্কার করিলাম; যত দিন তাহার ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখিলাম না, বলিলাম—এই নিয়ম অনিবার্য্য, ইহার ব্যভিচার নাই। যে দিন দেখিলাম, অমুক স্থানে আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি সংশোধনের ব্যবস্থা। তখনই ভাষা বদলাইয়া নিয়ম সংশোধিত ভাবে প্রকাশ করিলাম। বলিলাম—অহো, এত দিন আমার ভুল হইয়াছিল; ঐ স্থানে ঐ নিয়ম, আর এই স্থানে এই নিয়ম। আগে যাহা নিয়ম বলিতেছিলাম, তাহা নিয়ম নহে; এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেন ব্যাকরণের নিয়ম;—যেন ব্যাকরণের সূত্র। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্ব্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ, এই দুইটি বাদ দিয়া। এখানে সাবেক নিয়মের যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উহা প্রকৃত ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহা একটা নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব নিয়ম;—এরূপ স্থানে এইরূপ ব্যভিচারই নিয়ম। ইহার উপর আর কথা নাই।

অর্থাৎ কি না, নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ না কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে বলিবার উপায় নাই। জলে শোলা ভাসিতেছে, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনও না; এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্তমান আছে, তবে জলের চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না, এ স্থানে ইহাই নিয়ম। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষা ভাল হইল না; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না। এ বৎসর হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে; অথবা আফ্রিকার উপকূলে এবার অতিবৃষ্টি ঘটিয়াছে; এবার ত এ দেশে বর্ষা না হইবারই কথা; ঠিক ত নিয়মমত কাজই হইয়াছে। নিয়ম দেখা গেল, চুম্বকের কাঁটা উত্তরমুখে থাকে। পরেই দেখা গেল, ঠিক উত্তর মুখে থাকে না; একটু হেলিয়া থাকে। আচ্ছা, উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় যতটা হেলিয়া আছে, লন্ডন শহরে ততটা হেলিয়া নাই, না থাকিবার কথা; ইহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায়

এ বৎসর যতটা হেলিয়া আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ততঠা হেলিয়া ছিল না। কি পাপ, উহাই ত নিয়ম? চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমন কি কথা আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়; দুই শত বৎসর বরাবরই দেখিতেছি, ঐরূপ সরিয়া যাইতেছে; উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই তা। সময়ে সময়ে নাচাই ত নিয়ম। প্রতি এগার বৎসর একবার উহার এইরূপ নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। আবার সূর্য্যবিম্বে যখন কলঙ্কসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, যখন মেরুপ্রদেশে উদীচী ঊষার দীপ্তি প্রকাশ পায়, তখনও এই নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়ে। বাড়িবেই ত, ইহাই ত নিয়ম।

একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সরল রেখাক্রমে ঋজু পথে যায়। যতক্ষণ একই পদার্থের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবর একই মুখে চলে। জানালা দিয়া রৌদ্র আসিলে সম্মুখের দেওয়ালে আলো পড়ে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাহিয়া সম্মুখের জিনিষ দেখা যায়, আশ-পাশের জিনিষ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হইবে—আলোক ঋজু পথে চলে। নতুবা ছায়া পড়িত না; চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণ ঘটিত না। অতএব আলোকের সোজা পথে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম? অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো গেলে দেখা যায়, আলোক ঠিক সোজা পথে না গিয়া আশে-পাশে কিছু দূর পর্যন্ত যায়। শব্দ যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে চলে, সেইরূপ আলোকরশ্মিও সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে যাওয়াই নিয়ম। বস্তুতঃ এ স্থলেও প্রাকৃতিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই। যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্যন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্তু যে-কোন সময়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্দ্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নহে, ইহা পূরা সাহসে বলাই দায়।

অথবা যাহা দেখিব, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনা কোথায়? চিরকাল সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, দেখিয়া আসিতেছি; উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিয়া আছি; কেহ পশ্চিমে সূর্য্যোদয় বর্ণনা করিলে তাহাকে পাগল বলি। কিন্তু কাল প্রাতে যদি দুনিয়ার লোকে দেখিতে পায়, সূর্য্যদেব পশ্চিমেই উঠিলেন আর পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন, তখন সে দিন হইতে উহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু যদি ঘটে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক একজোট হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি?

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মটা কিরূপ, তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম। তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী; কাঁদিতেছ, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা ঘটে, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের ব্যভিচারের আর অবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিয়ম সোজা; কোন নিয়ম বা খুব জটিল। কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি, ঐখানে ঐ ব্যভিচার থাকাই নিয়ম। কাজেই নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

ফলে জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কতকগুলা সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলা একেবারে অসম্বন্ধ বা শৃঙ্খলাশূন্য নহে। মানুষ যত দেখে, যত সূক্ষ্ম ভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া থাকে। বহুকাল হইতে মানুষে দেখিয়া আসিতেছে, সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে কাষ্ঠরূপী ইন্ধনযোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইন্ধনযোগে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে। আলোক ও তাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সম্পর্কে নানা তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অল্প দিন মাত্র জানিয়াছে। যত দেখে, ততই শেখে, ততই জানে; যতক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর

হইলেই তৎসম্পর্কে একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি কোন্ নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষ্যের জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌঁছিবে, আজ তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহাদিগকে মিলাইয়া তাহাদের সাহচর্য্যগত ও পরম্পরাগত সম্পর্ক যাহা নিরূপণ করিতেছি, তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা কিছু ঘটে, তাহা যতই অজ্ঞাতপূর্ব্ব হউক না কেন, তাহা যতই অভিনব হউক না, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন স্থলে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে সেই ব্যতিক্রমকেই সেখানে নিয়ম বলিতে হয়। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড নিয়মের রাজ্য। ইহাতে আবার বিস্ময়ের কথা কি? ইহাতে আনন্দে গদগদ হইবারই বা হেতু কি? আর নিয়মের শাসনে জগদ্‌যন্ত্র চলিতেছে মনে করিয়া একজন সৃষ্টিছাড়া নিয়ন্তার কল্পনা করিবারই বা অধিকার কোথায়? জগতে কিছু না কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। এই ঘটনাটাই বরং আশ্চর্য্য—একটা কিছু যে ঘটিতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। জগৎ-ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, জানি না; ভক্ত বলেন, ইহা কোন অঘটন-ঘটনা-পটুর লীলা; বৈদান্তিক বলেন, আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু—আমার ইহাতে আনন্দ; বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।

৭৪.১০ সারাংশ

আইজাক নিউটন আবিষ্কৃত বিশ্বজগৎব্যাপী যে এক 'মহা নিয়মের' কথা প্রবন্ধের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে সেই মহা-নিয়মের ব্যাভিচার-ব্যতিক্রম সম্পর্কে লেখক আরো নতুন কথা বলেছেন। লেখকের প্রথম বক্তব্য ঃ সেই 'মহানিয়ম' যদি সর্বত্র নাও খাটে, তবু বলতে হবে, সেখানেও কোন না কোন নিয়মের অস্তিত্বও বন্ধ আছেই। কারণ, নিয়ম ছাড়া বিশ্ব জগতে কোন ঘটনাই কদাপি ঘটতে পারে না। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ঃ কোন ঘটনাকে সাবেক নিয়েমর ব্যাভিচার বা ব্যতিক্রম বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনে হতে পারে; কিন্তু সত্য নয়। আসল সত্য হল ঃ আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের অভাবে, যাকে সাবেক নিয়মের ব্যাভিচার বা ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত করেছি, —তা সেই প্রদেশেরই একটি নিয়ম,— সে কথা ভেবে দেখিনা। কাজেই, তা একটা 'নবাবিস্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব নিয়ম'—অভিজ্ঞতার অভাবে যা আমাদের জানা ছিল না। সেখানকার সেই 'অজ্ঞাতপূর্ব নিয়মটি' জানার ফলে আর সেগুলিকে পরিচিত নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বলে মনে হবে না। লেখকের তৃতীয় বক্তব্য হল এই ঃ বিশ্বজগতে যা কিছুই ঘটে, তাই-ই কোন নিয়মের বশে ঘটে; প্রতিটি ঘটনারই একটি 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলা থাকে বা আছে। আমাদের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণের ফলে, ক্রমে ক্রমে, সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আর কোন বে-নিয়মের ফল বলে মনে হয় না। যতদিন সেই 'সম্বন্ধ' বা শৃঙ্খলাটিকে আবিষ্কার করতে না পারি, কেবল ততদিনই ওই বিশেষ ঘটনা বা ঘটনা-ধারাকে মূল নিয়মের ব্যতিক্রম বলে ভুল করি। লেখক তাঁর প্রবন্ধ এই বলে শেষ করেছেন ঃ বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের বন্ধনকে দেখে আমরাদের বিস্মিত বা আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই। বরং এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সর্বত্রই এবং সর্বদাই কোন না কোন ঘটনা নিরন্তর ঘটেই চলেছে কিন্তু সেই সব ঘটনা যে ঘটে চলেছে, কী তার প্রয়োজন কেউ তা জানে না। নানা ধরনের মানুষ তার নানা উত্তর দেন।

৭৪.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশটির তুলনায় প্রথম অংশটিতে বক্তব্য যতখানি বিশদ ও বিস্তৃত, সেই কারণেই তা প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় অংশটিতে বক্তব্য জটিলতর, কিন্তু তা উপযুক্ত পরিমাণে বিস্তৃত করা হয়নি। এই অংশের একেবারে শেষে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা দুরূহ।

এই দ্বিতীয়াংশে পর-পর কেবলই ব্যতিক্রমাত্মক দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং সেগুলির যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। সেটি ঘটেছে একটি বিশেষ পথ ধরে। প্রথমে তাঁর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক দিকটি কার্যকরী হয়েছে, তার কথা বলি। লেখক জগৎব্যাপী নিয়মকে দেখেছেন—দুটি দিক থেকে। একদিকে তিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপী একটি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী অপদিকে বিশ্বচরাচর ব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নিরন্তরতায় বিশ্বাসী। একটি নিয়ম এখন পর্যন্ত স্থির, অপর নিয়ম নিরন্তর আবিষ্কৃত দিক। বর্তমানের দৃষ্ট সত্য ও নিয়ম এবং ভবিষ্যতের অ-দৃষ্ট অনাগত অনাবিষ্কৃত নিয়ম-দুই নিয়মেই তিনি সমপরিমাণে বিশ্বাসী। ফলে তাঁর বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টি ও মন একটি আধুনিক সচল দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেছে।

নিয়মের এই নিরন্তরতায় এবং নতুন নতুন নিয়মের আবিষ্কারের বিশ্বাস স্থাপন একটি সচল মনের পরিপোষক এবং এত এক ধরনের দার্শনিকতা বটে। কিন্তু এইখানেই বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে দার্শনিকের সত্যের একটি বিরোধও রামেন্দ্রসুন্দর লক্ষ্য করেছিলেন। বৈজ্ঞানিকের সত্য স্থির-স্থায়ী-ধ্রুব সত্য নয়। আজ যা সত্য, কাল তা অন্য সত্য আবিষ্কারের ফলে নাকচ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দার্শনিকের সত্য স্থির-স্থায়ী-ধ্রুব সত্য। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের সত্যের চাইতে দার্শনিকের সত্যের ওপরেই পরবর্তীকালে অধিকতর গুরুত্ব ন্যস্ত করেছেন।

তবে, বৈজ্ঞানিকের এই সত্যের নিরন্তরতা বা ক্রমে ক্রমেই নবতর আবিষ্কারেরর ফলে পূর্ববর্তী সত্যের খারিজ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো একটি কথাও বলেছেন ঃ জগদ্ব্যাপারে এই যে নিরন্তরতা, ক্রমে-ক্রমেই ঘটনাবলী কেবলই ঘটে চলেছে, তার কারণও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যে কথা বলেছেন,—তাও একটি দার্শনিক মন-প্রসূত। তিনি বলেছেন ঃ "জগতে কিছু-না-কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই।....একটা কিছু যে ঘটিতেছে ইহাই বিস্ময়ের বিষয় লেখকের এই উক্তিটিই একটি দার্শনিক উক্তি।

তাঁর উত্থাপিত শেষ প্রসঙ্গটি হল ঃ "জগৎ ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন...." তার উত্তরে অন্বেষণ করা। সেই উত্তর অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি নানা স্তরের নানা ধরনের মানুষের কাল্পনিক উত্তর প্রদান করেছেন, এবং তারই মধ্যে চিন্তাধারার বিস্তৃতি ধরা পড়েছে। প্রথমত 'অজ্ঞানবাদী'র 'অজ্ঞতাবাদ' (Agnosticism), যে তত্ত্বের মূল কথা হল—জগতের চরমতত্ত্ব চিরকাল অজ্ঞাত-বা অজ্ঞেয় থাকে। কাজেই উল্লিখিত নিয়ম সম্পর্কে প্রত্যাশিতভাবেই তাঁরা বলবেন—'জানি না'। বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, একাত্ম। কাজেই ব্রহ্মই এই সব ঘটাচ্ছেন, অর্থাৎ 'আমি'ই যেন তা ঘটাচ্ছি। বৈদান্তিকের উত্তর তাই ঃ "আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু।" বৌদ্ধদের নাস্তিক্যবাদের কারণেই লেখক সেই অনুযায়ী জগদ্ব্যাপী নিয়মের ব্যখ্যা তাঁদের মুখে দিয়েছেন।

আলোচ্য অংশটির রচনারীতি প্রথম অংশটিরই মতো। এখানেও সেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লেখক পাঠকের সঙ্গে একটি সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন। তারপর যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, ফলে একটি কথোপকথনের ভঙ্গি তাতে ফুটে উঠেছে। যেমন,

"চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমন কি কথা আছে? উহা একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়, ...উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত, সময়ে সময়ে নাচাইতে নিয়ম। প্রতি

এগারো বৎসরে একবার উহার এইরূপ নর্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে।" এখানে বাক্য ভঙ্গিতে অব্যয় 'ত' এর প্রয়োগ একটি সহজ স্নিগ্ধতার সৃষ্টি করেছে। তেমনি, চুম্বকের কাঁটার 'নর্তনপ্রবৃত্তি'র উল্লেখ মৃদু রসিকতার প্রবর্তন করেছে।

কিংবা আর একটি দৃষ্টান্তে— এখানে পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করে বক্তব্য বলা হয়েছে,

"তুমি সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম, তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী, কাঁদিতেছ, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।"

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে যাঁরাই বিজ্ঞানচর্চা করেছেন (যেমন, বঙ্কিচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু) তাঁরাই অতি সহজ, কৌতুক-স্নিগ্ধ সরস গদ্যে তা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর সেই ধারারই সাধক। ইংরেজী Popular science এর সঙ্গে তুলনীয়।

৭৪.১২ অনুশীলনী-২

ক. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। 'মহানিয়ম' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

২। প্রত্যেক ঘটনার 'সম্বন্ধ' ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য কী?

৩। বিশ্বজগতের সর্বত্রই নিয়মের অস্তিত্ব দেখে আমরা কি বিস্মিত বা আনন্দিত হব?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

১। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে ঘটেছে?

২। বিশ্বব্যাপী নিয়মের কারণরূপে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বক্তব্য কী?

৩। আলোচ্য অংশটির গদ্যশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

৭৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। অধীর দে—*আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা।*

২। নির্মলেন্দু ভৌমিক—*রামেন্দ্র রচনা সঞ্চয়ন (ভূমিকা)।*

৩। সুকুমার সেন।—*বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য।*

একক ৭৫ ❑ বই পড়া ঃ প্রমথ চৌধুরী

গঠন

৭৫.১ উদ্দেশ্য
৭৫.২ প্রস্তাবনা
৭৫.৩ প্রমথ চৌধুরী ঃ জীবনকথা
৭৫.৪ প্রমথ চৌধুরী ঃ প্রবন্ধ সাহিত্য
৭৫.৫ মূল পাঠ (প্রথম অংশ)
৭৫.৬ সারাংশ
৭৫.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭৫.৮ অনুশীলনী-১
৭৫.৯ মূল পাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
৭৫.১০ সারাংশ
৭৫.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭৫.১২ অনুশীলনী-২
৭৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৭৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি প্রমথ চৌধুরীর—

- গদ্যরীতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন;
- 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি বুঝতে পারবেন;
- একটি মমনধর্মী প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৭৫.২ প্রস্তাবনা

'পড়া' নানা ধরনের হতে পারে। 'বই পড়া' আর 'খবরের কাগজ' পড়ার মধ্যেও নানা পার্থক্য আছে। আবার, 'বইপড়া'রও নানা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সিলেবাসের বই পড়ার কথা লেখক এখানে বলেন নি। মনের খুশিতে, কেবল আনন্দের জন্যই, মনের প্রসারতা বাড়াবার জন্য যে বই পড়া হয়, তাহাই এখানে লেখকের উদ্দিষ্ট। এই যে মনের খুশিতে বইবড়া তা পার্থিব জীবনের কোনো উন্নতির সহায়ক হবে না ঠিকই, কিন্তু পাঠকের মনকে সংস্কৃত, পরিশীলিত উন্নত, মার্জিত করে তুলবে। এইভাবে প্রতিটি পাঠক যদি উন্নত-মার্জিত হয়ে ওঠে। তবেই সেই দেশ, জাতির সবাই সংস্কৃত শিক্ষিত হয়ে উঠবে। অবশ্য বই বলতে লেখক এখানে কাব্য-কবিতার বইকেই বুঝিয়েছেন। কাব্য কবিতাই মানুষের মনকে খুব উচ্চে এবং গভীরদেশে নিয়ে যেতে পারে। যে জাতি বা দেশের মানুষ যত বেশি পরিমাণে এই ধরনের বই পড়ে, লেখকের মতে, সেই দেশ জাতির মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারও তত বেশি। জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির পথ পদ্ধতি রূপে তিনি 'বইপড়া'কেই মুখ্যত গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি পৃথিবীর দুই প্রাচীন সভ্যতাকে—ভারতবর্ষ ও গ্রীস দেশের সভ্যতাকে ভিত্তি করেছেন। 'কালচার' বা সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করবার এ এক নতুন দৃষ্টিকোণ।

৭৫.৩ প্রমথ চৌধুরী ঃ জীবনকথা

'আত্মকথা' (১৯৪৬) নামে গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন। এঁরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। জন্ম ৭ই আগষ্ট, ১৮৬৮। মৃত্যু—২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন (১৮৯৯)। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করেন, প্রথম শ্রেণী পেয়ে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলেত যান এবং ব্যারিষ্টার হন। ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। ফরাসী সাহিত্যে তিনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গীতের প্রতিও বিশেষ অনুরাগ ছিল তাঁর। কিছুকাল 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদকতাও করেছেন।

গদ্য ছাড়া কবিতা ও গল্পও লিখেছেন। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম— 'বীরবল'। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বড়ো কৃতিত্ব চলিত বাঙলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, যদিও তাঁর পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকগণ চলিত বাঙলা ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। 'সবুজপত্রে'র প্রতিষ্ঠা (১৯১৪ খ্রীঃ) এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাতেই তাঁর রচনাদি অধিক পরিমাণে পত্রস্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকগণ এই পত্রের লেখক ছিলেন, সাধুভাষাতেও রবীন্দ্রনাথ এ পত্রিকাতে লিখেছেন। প্রবন্ধের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রবর্তন করেন তিনি। তাঁর প্রথমত কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩), এবং তারপর বের হয় 'পদচারণ' (১৯১৯)। গল্পগ্রন্থের মধ্যে আছেঃ 'চার ইয়ারি কথা', 'আহুতি', 'নীললোহিত'। তিনি একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

৭৫.৪ প্রমথ চৌধুরী ঃ প্রবন্ধ সাহিত্য

বাঙলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার। তাঁর মণীষা, চিন্তাধারা, যুক্তিবোধ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রবণতা এবং সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গিতে চলিত গদ্যরীতিকে গ্রহণ তাঁকে এ বিষয়ে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা প্রদান করেছিল. রবীন্দ্র-সমসাময়িক কালের একজন লেখক হয়েও তিনি আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন। তার প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি ঃ

'তেল নুন লকড়ি' (১৯০৬)। 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭)। 'নানা কথা' (১৯১৯)। 'আমাদের শিক্ষা' (১৯২০)। 'দু-ইয়ারকি' (১৯২১)। 'বীরবলেরর টিপ্পনী' (১৯২১)। 'রায়তের কথা' (১৯২৬)। 'নানা চর্চা' (১৯৩২)। 'ঘরে বাইরে' (১৯৩৬)। 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (১৯৪০)। 'বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' (১৯৪৪)। 'আত্মকথা' (১৯৪৬)। 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু মুসলমান' (১৯৫৩) প্রভৃতি।

প্রবন্ধের এই নামমালা থেকেই বোঝা যায় তিনি কতো বিচিত্র দিকে আগ্রহী ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দান তাঁর সাহিত্য-জীবনের এক বড়ো দিক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পী ছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন, "ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি।" কিন্তু কেবল ভারতচন্দ্রই নন, কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষারীতিকেও তিনি অনুসরণ করেছেন। এর ফলে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের মধ্যে এসেছিল একটি প্রতিভাদীপ্ত বৈদগ্ধ্যের ভাব; অলঙ্কারের মধ্যে অর্থালঙ্কারের চেয়ে শব্দালঙ্কারের প্রাধান্য। তাঁর ভাষারীতি এবং প্রবন্ধের কায়া গঠনের মধ্যে ফরাসী রীতিরও অনুসরণ দেখা গেছে। 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়' নামে প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন, ফরাসি সাহিত্য সব কিছুকে সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করতে চায়ঃ "....যে মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যে সত্য ধরা দেয় না, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দেয়, সে মনোভাবের সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসী সাহিত্যে বড় একটা পাওয়া যায় না।....যে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসি সাহিত্যের ধর্ম।" বলা বাহুল্য, প্রথম চৌধুরী নিজেও তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে এই দিকটি সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ ছিলেন। একদিকে ছিল তাঁর বিস্তৃত পড়াশোনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে নিজস্ব চেতনা ও বোধ আর অন্যদিকে ছিল তাঁর

বিশিষ্ট ভাষারীতি;—এই দুই দিক মিলিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য। তাঁর এই বিশিষ্ট ষ্টাইল বা রীতি একদা 'বীরবলী ঢং' নামে আখ্যা অজন করেছিল। তাঁর ব্যঙ্গ-রসিকতার মধ্যে কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য গ্রন্থের প্রভাব দেখেছেন। তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সমকালের অনেক লেখকেরই মতের মিল হয়নি। সেই সমস্ত মতান্তরের বিষয়গুলিই তাঁর প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। যাকে বলে Polemic Literature অর্থাৎ 'বিতর্কমূলক সাহিত্য', প্রমথ চৌধুরীর এই ধরনের প্রবন্ধগুলিকে তাই বলা যায়। এগুলির মধ্যেও এসে পড়েছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মনোভাব।

প্রথমদিকে দু-একটি রচনা সাধু বাংলা ভাষাতে লিখলেও যথা ঃ জয়দেব', 'আদিম মানব') তিনি তার মধ্যেও নিজ ভাষারীতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তথ্য ভাষার পক্ষে তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন ঃ 'কথার কথা', 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা', 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা', 'বাঙলা ব্যাকরণ', 'আমাদের ভাষা সংকট'। 'কথার কথা' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ 'যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।" সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধে তিনি সাধুভাষাকে 'কৃত্রিম ভাষা' বলেছেন।

তিনি ছিলেন অতি উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি। সাহিত্যকে তিনি দেখেছেন— বিশুদ্ধ সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। এ বিষয়ে তাঁর এই প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ 'সাহিত্যে খেলা', 'সাহিত্যে চাবুক', 'খেয়ালখাতা', 'কাব্যে অশ্লীলতা— আলংকারিক মত', 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?' প্রভৃতি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'সাহিত্যে খেলা' নামে প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়।..... সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়।.... কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।" নিজে ফরাসি সাহিত্যের একজন গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যে 'রিয়ালিজম' বা বস্তুতন্ত্রতার একটি প্রসারিত দিক 'ন্যাচারালিজম (অর্থাৎ 'প্রকৃতিবাদ'। ফরাসি চিত্র ও সাহিত্য শিল্পে যার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়) কে তিনি স্বীকার করেন নি।

শিক্ষা সম্পর্কেও প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ মতামত ছিল। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি নিজ-নিজ দর্শনতত্ত্ব অনুসারে শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে গেছেন। প্রমথ চৌধুরীও এ বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঃ 'আমাদের শিক্ষা', 'আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবনজিজ্ঞাসা', 'বাংলার ভবিষ্যৎ', 'নব বিদ্যালয়', 'নব বিদ্যালয়—২', 'নব বিদ্যালয় (ভাষা শিক্ষা)', 'শিক্ষার নব আদর্শ।' শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন—একদিকে মনুষ্যত্ব গঠনের দিক থেকে অপর দিকে সাহিত্যানুশীলনের দিক থেকে। আলোচ্য 'বইপড়া' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজনীতি বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তৎকালীন ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত মেলে।

৭৫.৫ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইনষ্টিটিউটের সাহিত্য শাখার অধিবেশনে পঠিত।

প্রবন্ধ আমি লিখি এবং সম্ভবত যত লেখা উচিত তার চাইতে বেশিই লিখি, কিন্তু সে প্রবন্ধ সর্বজনসমক্ষে পাঠ করতে আমি স্বভাবতই সংকুচিত হই। লোকে বলে, আমার প্রবন্ধ কেউ পড়ে না। যে প্রবন্ধ লোকে স্বেচ্ছায় পড়ে না, সে প্রবন্ধ অপরকে পড়ে শোনানোটা অবস্য শ্রোতাদের উপর অত্যাচার করারই শামিল।

এ সত্ত্বেও আমি আপনাদের অনুরোধে আজ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে প্রস্তুত হয়েছি তার কারণ, লাইব্রেরি সম্বন্ধে কথা কইবার আমার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে।

কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য পত্রে আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, আমি একজন 'উদাসীন গ্রন্থকীট'। এর অর্থ, কোনো কোনো লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, আমিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছি। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে আমি যে আজীবন সমাধিস্থ হয়ে রয়েছি, এ জ্ঞান

আমার অবশ্য ইতিপূর্বে ছিল না। যে যাই হোক, আমার আকৈশোর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতির দত্ত ও সার্টিফিকেটের বলে এ ক্ষেত্রে বই পড়া সম্বন্ধ দু-চার কথা বলতে সাহসী হয়েছি। লাইব্রেরিতে বইয়ের গুণগান করাটা, আমার বিশ্বাস অসংগত হবে না।

২

আজকের সভায় যে দু-চার কথা বলব, সে আলাপের ভাষায় ও আলাপের ভাবে, অর্থাৎ তাতে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা ঢের বেশি থাকবে। এই বিংশ শতাব্দীতে লাইব্রেরির সার্থকতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথা বলবার কি প্রয়োজন আছে? এ সম্বন্ধে যা বক্তব্য তা ইতিপূর্বে হাজারবার কি বলা হয় নি? তবে এই পড়ার অভ্যাসটা যে বদ অভ্যাস নয়, এ কথাটা সমাজকে এ যুগে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক; কেননা মানুষে এ কালে বই পড়ে না, পড়ে সংবাদপত্র। এ যুগে সভ্যসমাজ ভোরে উঠে করে দুটি কাজ; এক, চা-পান, আর সংবাদপত্র পাঠ। একটি বিলাতি কবি চায়ের সম্বন্ধে বলেছেন যে, The cup that cheers but not inebriates, অর্থাৎ, চা পান করলে নেশা হয় না অথচ ফূর্তি হয়। চা পান করলে নেশা না হোক, চা-পানের নেশা হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। তার পর অতিরিক্ত চা-পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়, অতিরিক্ত সংবাদপত্রপাঠের ফলেও মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়। আমরা দেশসুদ্ধ লোক আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং সাহিত্যচর্চা করবার প্রথাটা যে সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, এই সত্যটার চার দিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সংকল্প করেছি।

৩

কাব্যচর্চা না করলে মানুষে জীবনের একটা বড়ো আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোনো সভ্য জাতি কস্মিন্‌কালে তার দিকে পিঠ ফেরায় নি; এ দেশেও নয়, বিদেশেও নয়। বরং যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা-কলহে দিনযাপন করার চাইতে কাব্যচর্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতেই আছে। সংস্কৃত কবিরা সকলেই সংসার-বিষবৃক্ষের অনুতোপম ফল কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করবার উপদেশ দিলেও সেকালে যে উপদেশ কেউ গ্রাহ্য করতেন কি না, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। কিছুদিন পূর্বে আমারও ছিল। কোনো নিজের কলমের কালি লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়। কিন্তু একালেও আমরা যখন ও-সব কথায় ভুলি নে, তখন সেকালেও সম্ভবতকেউ ভুলতেন না; কেননা সেকালে সমজদারের সংখ্যা একালের চাইতে ঢের বেশি ছিল। কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, হিন্দুযুগে বই পড়াটা নাগরিকদের মধ্যে একটা মস্ত বড়ো ফ্যাশান ছিল। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, 'নাগরিক' বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাত একালে ইংরেজিতে যাকে man about town বলে। বাংলা ভাষার ওর কোনো নাম নেই, কেননা বাংলাদেশে ও-জাত নেই। ও বালাই যে নেই, সেটা অবশ্য সুখের বিষয়।

যদি অনুমতি করেন তো এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। সেকালে এ দেশে যেমন এক দল ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, তেমনি আর-এক দল ভোগী পুরুষও ছিলেন। ভারতবর্ষের আরণ্যক ধর্মের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার নাগরিক ধর্মের ক্রিয়াকলাপ আমাদের অনেকের কাছেই অবিদিত। এর ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ধারণাটা আমাদের মনে নিতান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতার, শুধু আত্মার নয়, দেহের সন্ধানটাও আমাদের নেওয়া কর্তব্য, নচেৎ তার স্বরূপের সাক্ষাৎ আমরা পাব না। সেকালের নাগরিকদের মতিগতি রীতিনীতির আদ্যোপন্ত বিবরণ পাওয়া যায় কামসূত্রে। এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অন্তত দেড় হাজার বৎসর পূর্বে, এবং এ গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন ন্যায়দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাকার স্বয়ং বাৎস্যায়ন; অতএব কামসূত্রের বর্ণনা আমরা সত্যবলেই গ্রাহ্য করতে বাধ্য বিশেষত ও-সূত্র যখন সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্রহিসেবেই চিরকাল গণ্য ও মান্য হয়ে এসেছে। আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

বাহিরের বাসগৃহেও অতিশুভ্রচাদর পাতা শয্যা একটি থাকবে, এবং তাহার উপর দুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে হইবে। তার পার্শ্বে থাকিবে প্রতিশয্যিকা। এবং তাহার শিরোভাগে কূর্চস্থান ও বেদিশা, স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর রাত্রিশেষে অনুলেপন, মাল্য শিক্থকরঙ্ক, সৌগন্ধিকপূটিকা, মাতুলুঙ্গাত্বক্, তাম্বুল প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতৎগ্রহ। ভিত্তিচগাত্রে নাগদন্তাবসক্তা বীণা। চিত্রফলক। বর্তিকা-সমুদ্গবঃ। এবং যে কোনো পুস্তক।

উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। কেননা এর অনেক শব্দই বাংলাভাষায় প্রচলিত নেই। আমি কতকটা টীকা ও কতকটা অভিধানের সাহায্যে ঐ-সকল অপরিচিত শব্দের বাচ্যপদার্থের যে পরিচয় লাভ করেছি, তা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রতিশয্যিকার অর্থ ক্ষুদ্র পর্যঙ্ক ভাষায় যাকে বলে খাটিয়া; এ খাটিয়া অবশ্য নাগরিকরা নিজেদের গঙ্গাযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখতেন না। তার মাথার গোড়ায় থাকত কূর্চস্থান; কূর্চ শব্দের সাক্ষাৎ আমি কোনো অভিধানে পাই নি। তবে টীকাকার বলেন, শয্যার শিরোভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম কূর্চ; আত্মবান নাগরিকেরা ইষ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণাম না করে শয়নগ্রহণ করতেন না; সুতরাং কূর্চ হচ্ছে একপ্রকার ব্র্যাকেট। সেকালের এই বিলাসীসম্প্রদায়, আমরা যাকে বলি নীতি, তার ধার এক-কড়াও ধারতেন না; কিন্তু দেবতার ধার ষোলো-আনা ধারতেন। এ ব্যাপার অবশ্য অপূর্ব নয়। একালেও দেখা যায় মানুষের প্রতি অত্যহিক অত্যাচার করবার সময় মানুষে ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন স্মরণ ও প্রণাম করে। যাক ও-সব কথা। এখন দেখা যাক, বেদিকা বস্তুটি কি। বেদিকাতে যতপ্রকার দ্রব্য রাখবার ব্যবস্থা আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল; এবং টীকাকারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এ অনুমান ভুল নয়; তিনি বলেন, বেদিকা ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তপরিমিত চতুষ্কোণ এবং কৃতকুট্টিম অর্থাৎ inlaid। অনুলেপন দ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেয়েরা যাকে বলে রূপটান, তাই। মাল্য অবশ্য ফুলের মালা; কি ফুল তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আর যাই হোক গাঁদা নয়; কেননা তাঁর বর্ণগন্ধের সৌকুমার্য বুঝতেন। শিক্থরকরঙ্ক হচ্ছে মোমের কৌটা; সেকালে নাগরিকেরা ঠোঁট আগে মোম দিয়ে পালিশ করে নিয়ে তার পর তাতে আলতা মাখতেন। সৌগন্ধিকপূটিকা হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে পাউডার-বক্স; বোতল না হয়ে বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য চূর্ণ আকারেই ব্যবহৃত হত। দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ পিকদানি। তার পর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তিসংলগ্ন হস্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা; টীকাকার বলেন, সে বীণা আবার 'নিচোল-অবগুণ্ঠিতা'; বাংলার অনেক পদ্যলেখকদের

ধারণা নিচোল অর্থে শাড়ি, শাড়ি পরা বীণার অবশ্য কোনো মানে নেই; নিচোল অর্থে গেলাপ; জয়দেব যে শ্রীরাধিকাকে বলেছিলেন 'শীলয় নীল নিচোলং' তার অর্থ নীল রঙের একটি ঘেরাটোপ পরো; ইংরেজি ভাষায় ওর তর্জমা হচ্ছে, put on a dark-blue cloak। এখন আবার প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। তার পর পাই চিত্রফলক; সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আঁকা হত, কাপড়ের উপরে নয়। বর্তিকা-সমুদ্‌গকের অর্থ তুলি ও রঙ রাখবার বাক্স। তারপর বই।

নাগরিকদের গৃহের এবং দেহের এই সাজসজ্জার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারবেন তাঁরা কি চরিত্রের লোক ছিলেন। তারপর প্রশ্ন ওঠে, বই নিয়ে এ প্রকৃতির লোকেরা কি করতেন? কেননা নাগরিকেরা আর যাই হোন, তাঁরা যে সব উদাসীন গ্রন্থকীট ছিলেন না, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। পুস্তক কি তবে এঁদের গৃহসজ্জার জন্য রক্ষিত হত, যেমন আজকাল কোনো কোনো ধনীলোকের গৃহে হয়? এ সন্দেহ দৃঢ় হয়ে আসে, যখন টীকাকারের মুখে শুনতে পাই যে,

এই-সকল বীণাদিদ্রব্য সর্বদা উপঘাতের, অর্থাৎ ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার জন্য, নহে। কেবল বাসগৃহের শোভা সম্পাদনার্থ ভিত্তিনিহিত হস্তিদন্তে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কালে ভদ্রে কখনো প্রয়োজন হইলে তারা সেখানে হইতে নামাইতে হইবে।

পূর্বোক্ত সন্দেহের আরো কারণ আছে। সূত্রকার যখন বলেছেন—'যঃ কশ্চিৎ পুস্তকং', অর্থাৎ যা হোক একটা বই, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সে-বই, আর যে কারণেই হোক, পড়বার জন্য রাখা হত না। কিন্তু টীকাকার আমাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কথা এই—

'যঃ কশ্চিৎ' এটি সামান্য নির্দেশ হইলেও তখনকার যে-কোনো কাব্য তাহাই পড়িবার জন্য রাখিবে, ইহাই যে সূত্রকারের উপদেশ, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

টীকাকারের এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রাহ্য করি। বীণা ও পুস্তক দুই সরস্বতীর দান হলেও ও-দুই গ্রহণ করবার সমান শক্তি এক দেহে প্রায় থাকে না। বীণাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য, পুস্তকপঠন অপেক্ষাকৃত ঢের সহজ। সুতরাং বই পড়ার অধিকার যত লোকের আছে, বীণা বাজাবার অধিকার তার সিকির সিকি লোকেরও নেই। এই কারণে সকলকে জোর করে বিদ্যাশক্তি দেবার ব্যবস্থা এ যুগের সকল সভ্য দেশেই আছে, কিন্তু কাউকে জোর করে সংগীতশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কোনো অসভ্য দেশেও নেই। অতএব নাগরিকেরা বীণা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন বলে যে পুঁথির ডুরি খুলতেন না, এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে। সে যাই হোক, টীকাকার বলেছেন, 'যে-সে বই নয়, তখনকার বই'; এই উক্তিটি প্রমাণ যে, সেই বই পড়া হত। যে বই এখনকার নয় কিন্তু সেকালের, যাকে ইংরেজিতে বলে ক্ল্যাসিক, তা ভদ্রসমাজে অনেক লোক ঘরে রাখে পড়বার জন্য নয়, দেখবার জন্য। কিন্তু হালের বই লোকে পড়বার জন্যই সংগ্রহ করে, কেননা অপর কোনো উদ্দেশ্যে তা গৃহজাত করবার কোনোরূপ সামাজিক দায় নেই। আর-এক কথা। আমরা বর্তমান ইউরোপের সভ্যসমাজেও দেখতে পাই যে, 'এখনকার' বই পড়া সে সমাজের সভ্যদের ফ্যাশনের একটি প্রধান অঙ্গ। আনাতোল ফ্রাঁসের টাটকা বই পড়ি নি, এ কথা বলতে পারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হবেন, সম্ভবত কিপ্‌লিঙের কোনো সদ্যপ্রসূত বই পড়িনি বলতে লন্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা যেমন সুপাঠ্য, কিপ্‌লিঙের লেখা তেমনি অপাঠ্য। এ কথা আমি আন্দাজে বলছি না। বিলেতে একটি ব্যারিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। জনরব, তিনি মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। অত না হোক, যা রটে তা কিছু বটেই তো। এই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারেন, তিনি ছিলেন কত বড়ো লোক। এত বড়ো লোক হয়েও তিনি একদিন আমার কাছে, অস্কার ওয়াইল্ডের

বই পড়েননি, এই কথাটা স্বীকার করতে এতটা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলেন, যতটা চোর-ডাকাতরাও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে guilty plead করতে সচরাচর করে না। অথচ তাঁর অপরাধটা কি? অস্কুর ওয়াইল্ডের বই পড়েন নি, এই তো? ও-সব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই। শেষটা তিনি এর জন্য আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন যে, আইনের অশেষ নজির উদরস্থ করতেই তাঁর দিন কেটে গিয়েছে, সাহিত্য পড়বার তিনি অবসর পান নি। বলা বাহুল্য, এরকম ব্যক্তিকে এ দেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, এ কথা কবুল করতে তিনি যে এতটা লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন তার কারণ, তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে, তিনি যত আইনজ্ঞই হোন, আর যত টাকাই করুন, তাঁর দেশে ভদ্রসমাজে কেউ তাঁকে বিদগ্ধজন বলে মান্য করবে না।

সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ (Cultured) বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এ দেশে পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আপরা যাকে সভ্য বলি সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপরপক্ষে সংস্কৃত ভাষায়র গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে (Synonyms)।

৫

এর উত্তরে হয়তো অনেকে এই কথা বলবেন যে, সেকালে বই পড়াটা ছিল বিলাসের একটা অঙ্গ। বাৎস্যায়নই যখন আমার প্রধান সাক্ষী, তখন এ অভিযোগের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে কঠিন। এ যুগ অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করি নে, ও চর্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি। আপনারা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে 'মাল্য-চন্দন-বনিতা' এ-তিন একসঙ্গেই যায়, এবং ও-তিনই ছিল এক পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের কাছে মাল্যচন্দনের শামিল বনিতাও নয়, কবিতাও নয়। কাজেই আমাদের চোখ সেকালের নাগরিকসমাজের রীতিনীতি অবশ্য দৃষ্টিকটু ঠেকে। কেননা আমাদের চোখের পিছনে আছে আমাদের মন এবং আমাদের মনের পিছনে আছে আমাদের বর্তমান সামাজিক বুদ্ধি। এই কারণেই প্রাচীন সমাজের প্রতি সুবিচার করতে হলে সে সমাজকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে দেখা কর্তব্য। তাই আমি উদাসীন গ্রন্থকীট হিসেবে নাগরিকদের উক্তরূপ সাহিত্যচর্চার ফলাফল একটুখানি আলোচনা করে দেখতে চাই। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক হতে হলে প্রথমত বর্তমানের প্রতি উদাসীন হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত প্রাচীন গ্রন্থের কীট হওয়া চাই; আরো অনেক হওয়া চাই, কিন্তু ও-দুটি না হলে নয়।

যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে এবং তা ছাড়া আর-কিছু করে না। অপরপক্ষে যে সমাজের আয়েসির দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু'কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং কোনো সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে দেখতে পাওয়া যা যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কাব্য-কলায় শিল্পে-বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর ব্যবধান। জনৈক ফরাসি

লেখক বলেছেন যে, যিনিই মানবের ইতিহাস চর্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে, মানুষকে ভালো করবার চেষ্টা বৃথা। এ হচ্ছে অবশ্য ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা, অতএব বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সে যাই হোক, এ কথার উত্তরে আমি বলি যে, মানুষকে ভালো না করা যাক, ভদ্র করা যায়। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান্ না করলেও রুচিমান্ করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।

ধরে নেওয়া যাক, সেকালের নাগরিকসমাজ কাব্যকে মনের বেশভূষার উপকরণ হিসেবে দেখত। তাঁরা যে হিসাবে ওষ্ঠে যাবক ধারণ করতেন, সেই হিসাবেই কণ্ঠে শ্লোক ধারণ করতেন। এ অনুমান নিতান্ত অমূলক নয়। সংস্কৃত ভাষায় একটি নাতিহ্রস্ব শ্লোকসংগ্রহ আছে, যার নাম বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্। ওরকম নামকরণের ফলে কাব্য অবশ্য রঙের কোঠায় পড়ে যায়। সে যাই হোক, নাগরিকদের বই পড়া যে একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার শামিল ছিল না, এবং তাঁদের বৈদগ্ধ্য যে তাঁদের মনুষ্যত্ব অনেকটা রক্ষা করেছিল, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার প্রমাণ দিচ্ছি। চরিত্রহীন অথচ কলাকুশল নাগরিকদের সেকালে সাধারণ সংজ্ঞা ছিল 'বিট'। এই বিটের একটি ছবি আমরা মৃচ্ছকটিকে দেখতে পাই। ঐ নাটকের রাজশ্যালক শকারের সঙ্গে বিটের তুলনা করলেই নিরক্ষর ও বিদগ্ধ জনের প্রকৃতির তারতম্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই সমান বিলাসভক্ত, কিন্তু শকার পশু আর বিট সুজন। শকারের ব্যবহার দেখলে ও কথা শুনলে তাকে অর্ধচন্দ্র দিতে হাত নিশপিশ করে; অপরপক্ষে বিটের ব্যবহারের সৌজন্য, ভাষার আভিজাত্য, মনের সরসতা এত বেশি যে, তাঁকে সাদরসম্ভাষণ করে ঘরে এনে বসাতে ইচ্ছে যায় দু'দণ্ড আলাপ করবার জন্য। বৈদগ্ধ যে একটি সামাজিক গুণ, এ কথা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হবে। মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষবেচিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবত চিরকাল করবে। এ-সকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক, অলংকৃত করে। এবং এ-সকল গুণ কাব্য ও কালর চর্চা ব্যতীত রক্তমাংসের শরীরে আপনা হতে ফুটে ওঠে না। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীনসভ্যতা এ সকল গুণের যতটা মূল্য দিত, আমরা ততটা দিই নে। তার কারণ, সেকালের সভ্যতা ছিল অ্যারিস্টোক্রাটিক, আর একালের সভ্যতা হতে যাচ্ছে ডেমোক্রেটিক; সেকালে তাঁরা চাইতেন আকার, আমরা চাই বস্তু। তাঁরা দেখতেন মানুষ্যে ব্যবহার, আমরা দেখতে চাই তার ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা লুব্ধ। ক্ল্যাসিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা করলে এ প্রভেদ সকলেরই চোখে ধরা পড়বে। এ যুগের সাহিত্যমাত্রেই রোমান্টিক, অর্থাৎ তাতে স্মার্টের ভাগ কম এবং আত্মার ভাগ বেশি। এর কারণ, এ যুগের কবিরা কাব্যেত্মপ্রকাশ করেন; এ যুগের কবি জনগণের প্রতিনিধিও নন, মুখপাত্রও নন; সুতরাং সে কবির মন নিজের মন, লৌকিক মনও নয় সামাজিক মনও নয়। আর সেকালের কবিরা সামাজিকদের মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করতেন। সেকালের সামাজিকরা কলাবিৎ ছিলেন বলে সেকালের কবিরা রচনায় বস্তুর অপেক্ষা তার আকার দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে বাধ্য হতেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দেখতে পাই, কবি কি বললেন, তার চাইতে কি ভাবে বললেন তার মর্যাদা ঢের বেশি সুতরাং নাগরিকদের বাক্যচর্চার ফলে প্রাচীন সাহিত্য যে আর্টিস্টিক হয়েছেন এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। এই-সব কারণে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য নাগরিকদের কাব্যচর্চা একেবারে নিষ্ফল হয়নি, কেননা তার গুণে ক্ল্যাসিক সাহিত্ব অসামান্য সুষমা ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

কাব্য আর্টের মূল্য যে কত বড়ো, সে আলোচনায় আজ প্রবৃত্ত হব না, কেননা সে আলোচনা দু'কথায় শেষ করবার জো নেই। বহু যুক্তি বহু তর্কের সাহায্যে ও সত্যপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি, এ যুগের ডেমোক্রেটিক আত্মস্মার্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবত মনে মনে হিংসাও করে; বোধ হয় এ কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ী রূপে বিরাজ করে। অথচ ডেমোক্রাসির এ সত্য সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলে তা মিটিরিয়ালিজ্‌মের দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চা আবশ্যক।

৭৫.৬ সারাংশ

বই পড়া বলতে লেখক পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য পড়াকে বোঝান নি; কিংবা, যে বই পড়ে টাকা অর্জন করা যায়, সে বইকেও বোঝান নি। বই পড়া বলতে তিনি ক্লাসিক কাব্য-কবিতা পড়বার কথাকে বুঝিয়েছেন। এইসব কাব্য-কবিতা পাঠের সঙ্গে 'কালচার', 'বৈদগ্ধ্য' নাগরিকতা' প্রভৃতিরর ধারণার একটি যোগ আছে। এই ধরনের বই পড়াকে কারো কারো কাছে 'বিলাসিতা' বলে মনে হতে পারে। এ প্রশ্নের উত্র দিতে গিয়ে লেকক সাহিত্যকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ 'অ্যারিষ্টোক্রাটিক' সাহিত্য এবং 'ডিমোক্রাটিক' সাহিত্য।

'অ্যারিষ্টোক্রাটিক' সাহিত্য সুনীতির চেয়ে সুরুচিকে প্রাধান্য দেয়। সমাজকে উন্নত না করুক, অলংকৃত করে। প্রাচীন যুগের সভ্যতারই ছিল 'অ্যারিষ্টোক্রাটিক' সভ্যতা। আর সেই সভ্যতার অনুগামী ছিল, তখনকার কাব্য-কবিতা। এই 'অ্যারিষ্ট্যেক্রটিক' সাহিত্যের সঙ্গে ক্লাসিক সাহিত্যের একটি নিবিড় যোগ আছে। ক্লাসিক কাব্যের একটি মূল দিক হলো এর Form বা আকার বা রূপ। এখানে কবির নিজের ব্যক্তিমনকে প্রকাশ করা বড়ো কথা নয়। এখানকার লক্ষ্য ছিল, পাঠকের মনোরঞ্জন করা। এই মনোরঞ্জনের জন্য চাই কাব্যের আর্ট বা শিল্প; Form বা রূপ তাই অঙ্গীভূত। কবি কি বললেন, সেটা বড়ো কথা নয়; কিভাবে বললেন, সেটাই বড়ো কথা। অর্থাৎ শিল্প বা আর্টটাই কাব্য-কবিতাকে করে তোলে অ্যারিষ্টোক্রাটিক। কবির দিক থেকে সেই শিল্প বা আর্ট সৃষ্টি যেমন গুণের কর্ম, পাঠকের দিক থেকেও তার অনুশীলন ও চর্চা করাটাও গুণের কর্ম। কবি ও পাঠক— উভয়ের দিক থেকেই প্রাচীন সভ্যতা ও সাহিত্য তাই ছিল এক অভিজাত বা অ্যারিষ্টোক্রাটিক ব্যাপার। এই আভিজাত্যের দিকটিই একটি জাতরি শিক্ষা, সংস্কৃতি (Culture), বৈদগ্ধ ও নাগরিকতার দিক।

এই ধরনের সভ্যতা ও সাহিত্যই প্রচলিত ছিল প্রাচীন ভারতে। প্রাচীন ভারতের নাগরিক ও বিদগ্ধ মানুষের গৃহসজ্জার একটি প্রধান দিক ছিল—শয়নকক্ষে বই-পুস্তক রাখবার স্থায়ী আয়োজন। এই বই বলতে তখনকার এবং সমকালের কবিতার বই। এইসব বিদগ্ধ মানুষের ত্যাগী নন, ছিলেন ভোগী। ভোগী বলতে দৈহিক দিকের ভোগী নয়, এ ভোগ মানসিক দিকের। তাদের সাহিত্যচর্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও রুচিমান করে তুলত। এর বৈদগ্ধ্য একটি সামাজিক গুণ,—যা সমাজকে অলংকৃত করত। সামাজিক গুণ বলতে লেখক মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহারকে বুঝিয়েছেন। এই বৈদগ্ধ্য ও তাদের মনুষত্বকে তখন রক্ষা করত।

কিন্তু, আধুনিক যুগের সাহিত্য হলো ডিমোক্রাটিক। তাতে আর্ট বা শিল্পে বড়োই অভাব দেখা যায়। তার ফল হিসাবে দেখা যায়, সাহিত্য পাঠ করেক মানুষ আজ আর সেই পরিমাণে মার্জিত-সংস্কৃত-বিদগ্ধ-রুচিমান-পরিশীলিত হয়ে উঠছে না। এই দিকটিকেই লেখক শিক্ষার বিকল্প রূপে একটি দিক ধরে নিয়ে দরকারী ও কেজো দিকের শিক্ষকে মূল্য দেন নি। ডিমোক্রাটিক সাহিত্য 'লৌকিক' মনের জন্য; লৌকিক মন বস্তুগত দিককেই প্রাধান্য দেয়। ফলে সে মন মেটেরিয়ালিজম্-এর দিকে সহজেই ঝুঁকি পড়ে। আর সাহিত্য যেখানে ডেমোক্রাটিক নয়, সেখানে তা রোমান্টিক। রোমান্টিক সাহিত্য ডেমোক্রাটিক সাহিত্যের মতো সামাজিক মনোরঞ্জনও করে না। রোমান্টিক সাহিত্য কেবল কবির নিজ মনকেই প্রাধান্য দেয়। কাজেই বই পড়তে হলে অ্যারিষ্টোক্রাটিক সাহিত্যের (অর্থাৎ ক্লাসিক সাহিত্যের) অনুগত কাব্য-কবিতাই পড়া উচিত।

৭৫.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'বই পড়া'কে উপলক্ষ করে লেখক একদিকে সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গিয়েছেন, অন্যদিকে সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাজনের প্রসঙ্গটিকে আকর্ষণ করেছেন। ফলে প্রবন্ধটি একটি ব্যাপকতাকে অর্জন করেছে। আবার, ওই দুটি প্রসঙ্গ

নিতোন্তই আগন্তুক কোনো প্রসঙ্গ হয়ে থাকেনি, প্রবন্ধের মূল বিষয়ের ওতপ্রোত হয়ে উঠেছে। এতে প্রবন্ধের কায়াটি একটি যুক্তর বন্ধনে সংহত হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধটি পড়লেই মনে হয় লেখক এ নিয়ে যেমন গভীর চিন্তা করেছেন তেমনি প্রস্তুত হিসেবে প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসকেও আয়ত্ব করে নিয়েছেন। প্রবন্ধটির অপর মাত্রা— শিক্ষার দিক। এইসব দিকগুলিকে তিনি যেখানে সংহত করতে পেরেছেন প্রবন্ধের নির্মিতির দিক থেকে সেখানেই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রবন্ধটির বিষয় প্রসঙ্গের বিন্যাসের দিক থেকে বিশেষত্ব হলো তিনি ছোটো ছোটো পরিচ্ছেদ যেন তাঁর বক্তব্যের এক-একটি ধাপ। ফলে একটি যুক্তির ক্রমানুসরণ স্বতই প্রবন্ধটির মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে ছোটো-ছোটো বিষয়কে বিন্যস্ত করা প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের উপস্থাপনার একটি বিশেষত্ব ছিল; একাধিক প্রবন্ধে তিনি এই উপস্থাপন-রীতির অনুসরণ করেছেন।

প্রসঙ্গের দিক থেকে প্রবন্ধটির মধ্যে তিনটি প্রসঙ্গ আছেঃ সভ্যতা-সংস্কৃতি; সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণী; এবং শিক্ষা প্রসঙ্গ। একে একে তিনটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে সভ্যতা-সংস্কৃতি বলতে শিক্ষিত-অশিক্ষিতর সব ধরনের মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির কথা বলা হয়নি। যাঁরা শিক্ষিত, পড়া-শোনাকে যাঁরা স্বার্থ ও অর্থের দিক থেকে দেখেন না, কেবল মানসিক উৎকর্ষ সাধনের দিক থেকেই দেখেন, কেবল তাঁদের সভ্যতা-সংস্কৃতিই এখানে লেখকের আলোচ্য। যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখক Art for Art's sake মতবাদে বিশ্বাসী, পড়া-শোনার ক্ষেত্রেও তাই পড়া কেবল পড়ারই জন্য, তার সঙ্গে পার্থিব লাভালাভের কোন যোগ সম্পর্ককে তিনি স্বীকার করেন না। হয়তো এই প্রকার চিন্তার মধ্যে একটি অ-সাম্যবাদ কাজ করে, লেখককে তা নিয়ে কেউ দোষরোপও করতে পারেন, কিন্তু লেখক প্রাচীন ভারত ও গ্রীস দেশের ইতিহাসকে ভিত্তি করে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইতিহাসের তথ্যকেই যেখানে তিনি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন, সেখানে এ বিষয়ে তাঁকে দোষ দিতে পারা যায় না।

যে সাহিত্য পাঠ এই সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল বনিয়াদ, সেই সাহিত্যের মধ্যেও তিনি আবার নানা প্রকার শ্রেণী বিভাজন করেছেন। তিনি তিন প্রকার সাহিত্যের কথা বলেছেন ঃ অ্যারিস্টোক্রাটিক, ডিমোক্রাটিক এবং রোমান্টিক। বলাই বাহুল্য, এই তিন ধরনের সাহিত্যের মধ্যে তিনি অ্যারিস্টোক্রাটিক সাহিত্যকেই তাঁর মূল উদ্দেশ্যের পরিপোষক সাহিত্য বলে মনে করেন। অ্যারিস্টোক্রাটিক সাহিত্যের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবন্ধের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টোক্রাটিক সাহিত্য বলতে তিনি মূলত ক্লাসিক কাব্যসাহিত্যকেই কেবল বুঝিয়েছেন, অন্য কোন সাহিত্য বড়ো বেশী পার্থিব জগৎকে প্রাধান্য দেয় এবং সে কারণেই তা 'মৌলিক'। আর রোমান্টিক সাহিত্যে কবি কেবল নিজের ব্যক্তিমানস নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন। অতএব অ্যারিস্টোক্রাটিক ক্লাসিক সাহিত্যেই সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক হতে পারে। ক্লাসিক সাহিত্য, তাঁর নিজেরই মতানুসারে Form প্রধান। তবে কি প্রমথ চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে Form-কেই পছন্দ করতেন? 'সনেট' একটি Form। সনেট সম্পর্কে তিনি একদা বলেছিলেন ঃ 'ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন'। সে কি এই জন্যই?

শিক্ষা সম্পর্কে তিনি একাধিক পুস্তক-প্রবন্ধ লিখেছেন। শিক্ষার প্রসঙ্গটি তখনকার সচেতন মানুষের কাছে একটি প্রধান আলোচ্য বিবেচ্য বিষয় ছিল। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা অর্থকরী হবে কিনা, টেকনিক্যাল শিক্ষা ও জেনারেল শিক্ষা— কোন শিক্ষা তখন ভারতীয়গণের উপযোগী হবে, বিজ্ঞান শিক্ষার কোনদিকটি গ্রহণীয় এবং তা কতটুকু পরিমাণে, শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় স্বার্থটি কোনদিক থেকে যুক্ত ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ তখনকার জাতীয় নেতাদের ভাবিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ-পটভূমিকায় প্রমথ চৌধুরী নিজের শিক্ষা চিন্তাটাকে এখানে তুলে ধরেছেন। শিক্ষাকে এখানে তিনি সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি অঙ্গ বলে বিবেচনা করেন এবং তা দেশবাসীর সেই সব মানুষের মনের বৈদগ্ধ্য-পরিশীলন, মার্জিত দিকের প্রতীক হবে-যা দেশের কবিবোধকে উন্নীত করবে। লাইব্রেরিকেই তিনি মানস গঠনের ক্ষেত্র বলেন।

তবে, সামগ্রিক বিচারে প্রবন্ধটির একটিঅংশ বেশী বিস্তৃত হয়ে গেছে। সেটি হলো, বাৎস্যায়নের কামসূত্র অবলম্বনে প্রাচীন ভারতের নাগরিক জীবনের পরিচায়নের অংশটি। এটি সংক্ষিপ্ততর হলে প্রবন্ধের পক্ষে কোন ক্ষতি হত না। যে নিশ্চিদ্র ভঙ্গিতে প্রবন্ধটির কায়া গঠিত, সেখানে এই প্রসঙ্গটির অতি বিস্তার একটি দোষের ব্যাপার হয়ে গেছে।

৭৫.৮ অনুশীলনী-১

ক. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ**

১। একটি দেশ বা জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির মাত্রা-পরিমাণ নিরূপতি হবে কিভাবে?

২। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী?

৩। 'সবুজপত্রে'র বিশেষত্ব বলতে কী বোঝেন?

৪। প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ও গল্পগ্রন্থগুলির নাম করুন।

৫। তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির নাম করুন।

৬। সাধু বাংলা ভাষায় লেখা প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলি কী কী?

৭। তাঁর অনুসরণে ক্লাসিক সাহিত্যের লক্ষণগুলি নির্দেশ করুন।

৮। ক্লাসিক সাহিত্যের লক্ষ্য কী?

৯। ডিমোক্রাটিক সাহিত্য কোন্ যুগের সাহিত্য?

১০। রোমান্টিক সাহিত্যের লক্ষণ কী?

খ. **নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ**

১। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। 'অ্যারিস্টোক্রাটিক' সাহিত্যের সঙ্গে ক্লাসিক সাহত্যি, কাব্য-কবিতা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির যোগ-সম্পর্কটি তুলে ধরুন।

৩। 'অ্যারিস্টোক্রাটিক', 'ডিমোক্রাটিক' এবং 'রোমান্টিক' সাহিত্যের পার্থক্য, লেখকের অনুসরণে, প্রদর্শন করুন।

৪। প্রবন্ধের এই অংশের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন কৌশল সম্বন্ধে মন্তব্য করুন।

৫। এই অংশে প্রকাশিত লেখরে মতামতের সঙ্গে আপনি কী একমত?

৭৫.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়ার পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আজ জাত হিসেবে শৌখিন নই; দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেন আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগশোক-দুঃখ দরিদ্র্যের দেশ জীবনধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্‌বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাইনে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন,

সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার-দর নেই। এই কারণেই ডেমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উলটো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়ো মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রাসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করেছি। এর কারণ স্পষ্ট। ব্যধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে, সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন; কেননা তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে, সে তো জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনো না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ, কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও এও সমান সত্য যে এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তার পর যে জাতি মনে বড়ো নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড়ো নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ। এবং মানুষের মনকে সবল সচল সরাজ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম-নীতি অনুরাগ-বিরাগ আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, এ-সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তেই হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাইকি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে, এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। ও চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।

এ সব কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের মানতেই হবে যে, লাইব্রেরির মধ্যেই বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়ার পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আজ জাত হিসেবে শৌখিন নই; দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেন আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগশোক দুষ্ট দরিদ্র্যের দেশে জীবনধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্মমও আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমার মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুল-কলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বলছি নে; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্য-মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে, তা হলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার

দাতার অভাব নেই, এমন-কি, এ ক্ষেত্রে দাতা কর্মেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেকান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণ সাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞানপিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর-কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত্ব বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর পলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গোরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যের রক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রথম উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও-শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস, ও বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তা হলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে-বেঁধে জোরজবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধপানক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন 'আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখো, এই ঢোক, আর-এক ঢোক, আর-এক ঢোক ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্যে যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা-কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান, এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরা মুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে, তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

৭

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক্, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি, দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষাশাস্ত্রের একজন জগদ্‌বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময় ফরাসিদেশে শিক্ষাপদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers : অর্থাৎ যারা পাস করতে পারে নি কিংবা চায় নি, তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষা তারা প্রত্যাখ্যান করে ছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনে বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কিরকম শিক্ষা দেওয়া হত তা আমার জানা নেই, তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনোই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টারমহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাস। এর জুড়ি আর-একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এ দেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তার পর একে একে সবগুলি উগলে দেয়। এর ভিতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শনের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারা ঐ লোহার গোলাগুলির এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলি বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্‌গিরণ করে দেয়। এর জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি, শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা আমাদের স্কুল-কলেজ ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার যে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তার আপনার বলতে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও যাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বন্ধ করতে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি-অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল-কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।

৮

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার, কি প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর, সকলে মুখে মানলেও, কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত; এক যারা কেতাবি, আর-এক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয় এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুইই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়, কেননা সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই, অথচ এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের

সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে,উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু এ কথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানুষের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে, মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায়, ততই তা দুর্বলর হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না। তার পর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনো নীচির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না, অর্থনীতিরও নয় ধর্মনীতিরও নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব, এ কথ্য যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও যে আনন্দ নেই, সে কথাই তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চ্চার সপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম। যে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কি না জানি নে; সম্ভবত হই নি। কেননা আমাদের দূরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

আপনাদের কাছে আমার আর-একটি নিবেদন আছে। এ প্রবন্ধে প্রাচীন যুগেদর নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। এ কাজ আমি বিদ্যে দেখাবার জন্য করি নি, পুঁথি বাড়াবার জন্যও করি নি। এই ডেমোক্রাটিক যুগে অ্যারিস্টোক্রাটিক সভ্যতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। আমার মতে এ যুগের বাঙালির আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একাধারে ডেমোক্রাটিক এবং অ্যারিস্টোক্রাটিকা। সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব, এত অমূল্য। সে সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনো বিচ্ছেদ নেই; বরং দুইয়ের মিলন এত ঘনিষ্ঠ যে, বুদ্ধিবলে তা বিশ্লিষ্ট করা কঠিন। আমাদের কর্মীর দল যেমন এক দিকে বাংলায় ডেমোক্রাসি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি আর-এক দিকে আমাদেরও পক্ষে মনের অ্যারিস্টোক্রাসি গড়ে তোলবার চেষ্টা করা কর্তব্য। এর জন্য চাই সকলের পক্ষে কাব্যকলার চর্চা। গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলন না হলে কাব্যকলার আভিজাত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সাহিত্যচর্চা করে দেশসুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক, এই হচ্ছে দেশের লোকের কাছে আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা।

শ্রাবণ, ১৩২৫

৭৫.১০ সারাংশ

প্রবন্ধের প্রথম অংশটিতে আছে, কালচার ও সভ্যতা সংস্কৃতির কথা; আর দ্বিতীয় অংশটিতে আছে-শিক্ষার কথা। শিক্ষার সূত্র ধরেই এসেছে লাইব্রেরির কথা।

প্রবন্ধের রচনাকালীন সময়টি নিছক সাহিত্যরস উপভোগের সময় নয় বলে লেখক মনে করেন। তখন ভারতীয়দের জাতীয় জীবনে শিক্ষার ফললাভটাই অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল। কাজেই, এই পরিস্থিতিতে বই পড়াকে শিক্ষা লাভেরই একটা দিক বলে মনে করতে হবে। অবশ্য আগে শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্যটাকে বুঝে নিতে হবে। সাধারণ ও পরিচিত

শিক্ষাধারা থেকে এটি একটু ভিন্ন। শিক্ষার সর্বপ্রথম অঙ্গ হলো—সাহিত্যচর্চা। এই শিক্ষার কিন্তু কোন নগদ বাজারদর নেই। স্মর্তব্য, মানুষের মনের পূর্ণ ও সমগ্র পরিচয় ধরা পড়ে সাহিত্যের মধ্যেই। আর, সাহিত্যচর্চ করতে গেলে বই পড়া অপরিহার্য। সেই বই পড়ার স্থান হলো লাইব্রেরি। লাইব্রেরির মাধ্যমেই একটি জাতি উন্নত ও সংস্কৃত হয়ে উতে পারে। দেশে যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা ঘটবে, ততই তা দেশের পক্ষে মঙ্গালদায়ক হবে। লাইব্রেরির সার্থকতা তাই স্কুল-কলেজের চেয়ে ঢের বেশি। স্কুল-কলেজের শিক্ষা না পেয়েও লাইব্রেরিতে নিজে নিজে পড়েও শিক্ষিত-সংস্কৃত হওয়া যায়। সুশিক্ষিত লোকমাত্রই আসলে স্ব-শিক্ষিত। মূল বা আসল শিক্ষা কোন শিক্ষকই ছাত্রকে দিতে পারেন না। তা ছাত্রের নিজেকেই গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষকের সার্থকতা তাই শিক্ষা দান করায় নয়, ছাত্রকে তা গ্রহণ বা অর্জন করতে সক্ষম করে তোলায়। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত ও ব্যক্ত করে তোলেন। নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সেই শক্তির ফলেই শিক্ষআর্থী নিজের মন দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলে। কিন্তু ভারতের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি লেখকের বর্তমান চিন্তার ঠিক বিপরীত। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর আত্মার মানসিক মরণ ঘটে। এতে ছাত্ররা পাশ করে, কিন্তু শিক্ষিত হয়ে ওঠে না। ভারতে প্রচলিত শিক্ষআব্যবস্থা তাই ব্যর্থ হয়েছে। এ শিক্ষা ছাত্রদের স্ব-শিক্ষিত হবার সুযোগ তো দেয়ই না বরং তার প্রাণশক্তিকে নিংড়ে নেয়। লাইব্রেরিতে বসে একজন ছাত্র স্বেচ্ছায়, স্বচ্ছন্দ চিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়। প্রত্যেকেই তার নিজের শক্তি, প্রতিভা ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিতে যেতে পারে। এই জন্যই নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে লাইব্রেরি স্থাপন করা প্রয়োজন।

বই পড়াকে আমরা কেবল অর্থোপার্জনের দিক থেকে দেখতে অভ্যস্ত। অর্থোপার্জনের সঙ্গে উদরপূর্তির একটি প্রত্যক্ষ যোগ আছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে— শুধু উদরপূর্তিতে মানুষের পূর্ণ তৃপ্তি ও তুষ্টি ঘটে না। মানুষের মনেরও একটি বিশিষ্ট দাবি আছে, সেই দাবির জন্যই মানুষ বই পড়তে চায়। উদরপূর্তি দ্বারা দেহরক্ষা হয়। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য চাই বইপড়া। আত্মা বা প্রাণকে সজাগ ও সবল না রাখতে পারলে সে জাতির মনও স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না। সাহিত্য চর্চার মধ্যে অপার আনন্দ আছে— সেই আনন্দই মানুষকে সতেজ ও সজীব করে রাখে। তাই সাহিত্যের আনন্দ থেকে মানুষ নিজেকে বঞ্চিত করলে জাতির জীবনীশক্তিই হ্রাস পায়।

আধুনিক বাঙালী জাতির উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অনুসরণ করা। প্রাচীন-গ্রীক-সভ্যতা ছিল, একই সঙ্গে ডিমোক্রাটিক এবং অ্যারিষ্টোক্রাটিক। সামাজিক জীবনে সে সভ্যতা ছিল ডিমোক্রাটিক, কিন্তু মানসিক জীবনে সে সভ্যতা ছিল অ্যারিষ্টোক্রাটিক। অ্যারিষ্টোক্রাসির সঙ্গে আর্ট ও শিল্পকলার একটি গভীর যোগ আছে। সাহিত্যে সেই আর্ট ও শিল্পকলার দিকটিকে তুলে ধরে। গুণী শিল্পী শিল্পকলা সম্মত অ্যারিষ্টোক্রাটিক সাহিত্য সৃষ্টি করে চলবেন। আর, গুণজ্ঞ পাঠক ডিমোক্রাসির সাধারণ নিয়মানুসরণ করে, একটি জাতির তাবৎ পাঠক রূপে সেই সাহিত্য পাঠ করবে। কেবল অর্থের দিকেই যেন দৃষ্টিপাত না করা হয়। এইভাবে গুণী ও গুণজ্ঞের মিলিত প্রয়াসে একটি জাতির উন্নয়ন ঘটবে।

৭৫.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের প্রথম অংশে মূল প্রসঙঅগটির ভূমিকা করে দ্বিতীয় অংশে লেখক একটি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন। প্রথম অংশে অ্যারিষ্টোক্রাটিক সাহিত্যের প্রধান্য সূচিত হয়েছে, দ্বিতীয় অংশে অ্যারিষ্টোক্রাটিক সাহিত্যের সঙ্গে ডিমোক্রাটিক সাহিত্যের সমন্বয়সাধন করেছেন। প্রথম অংশে প্রাচীন ভারত প্রাধান্য পেয়েছে, দ্বিতীয় অংশে তেমনি প্রাচীন গ্রীস। এইভাবে প্রবন্ধের দুটি অংশের মধ্যে একটি যোগরেখা স্থাপিত হয়েছে।

এই অংশে প্রাধান্য পেয়েছে এই তিনটি প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা, লাইব্রেরি ও প্রাচীন গ্রিস সভ্যতা। শিক্ষা বলতে স্বশিক্ষিত শিক্ষা, এবং তা সম্ভব লাইব্রেরিতে পড়ে। শিক্ষার সঙ্গে লাইব্রেরিকে এইভাবে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের

'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইতে 'লাইব্রেরি' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। লাইব্রেরিকে রবীন্দ্রনাথ এক দার্শনিক অর্থে সেখানে গ্রহণ করেছেন। লাইব্রেরির অসংখ্য বইয়ের মধ্যে তিনি সমুদ্রের বিশালতা লক্ষ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য "..... বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই।" শরীরের স্বাস্থ্যের কারণে লোকে যেমন হাসপাতালে যায় মনের স্বাস্থের কারণে তেননি লাইব্রেরিতে যায়।লেখক বলেন : "এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে কিছু বেশি।" লাইব্রেরিতে গিয়েই পাঠক নিজে নিজে পাঠ করে নিজের মতো করে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেন না, শিক্ষার্থীর অন্তরের সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে দেন। অতঃপর শিক্ষার্থী সেই জাগ্রত ক্ষমতা অনুসারে লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে নিজের মতো করে নিজেকে গড়ে তোলে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার দ্বারা সেটি সম্ভব হয় না। স্কুল-কলেজের শিক্ষায় শিক্ষার্থী প্রচুর পরিমাণে পাশ করে ঠিকই, কিন্তু আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। ফ্রান্সে যখন সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতির চরম অবনতি ঘটেছিল, তখন France was saved by her idlers. দেশের দুর্দিনে বুদ্ধিজীবী 'অলস' পাঠকরাই দেশকে উদ্ধার করতেও পারে। বিনা কারণে কেউ বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলে ফেলে দিই। কেননা এ ধরনের পড়ার কোনো পার্থিব মূল্য নেই। স্বেচ্ছায় এবং আনন্দময় পাঠের মাধ্যমেই মন ও আত্মা সজীব-সপ্রাণ থাকে, তাইই দেশের সম্পদ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে লেখক প্রাচীন গ্রীস দেশকে এজন্য আদর্শ দেশ বলেন। ওই দেশ সামাজিক দিক থেকে ডিমোক্রাটিক কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে অ্যারিষ্টোক্রাটিক। সেখানে সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক দিকের সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তাদের সাহিত্যও এত উচ্চস্তরের হয়ে উঠতে পেরেছিল।

রচনারীতির দিক থেকে বিচার করলে প্রবন্ধটির মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক বিশেষত্ব— দুয়েরই প্রকাশ লক্ষ্য করি। ব্যক্তিগত জীবনে ব্যারিষ্টার ছিলেন বলে প্রবন্ধের মধ্যে উকিল-ওকালতি এবং জনৈক ব্যারিষ্টারের কথা বলা হয়েছে। সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ধরা পড়েছে এই মন্তব্যে ঃ ".....আমাদের দুরাবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।"

প্রমথ চৌধুরী ভাষার কারিগর। ভাষার মধ্যে Pradox (বিরুদ্ধ সত্য), Maxim (সরলসত্য প্রকাশক বাক্য), অনুপ্রাস, সমান ভাব-প্রকাশক দুটি অর্ধেক বাক্য, প্রভৃতি তাঁর গদ্যের বিশেষত্ব। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে তার দৃষ্টান্ত এই ঃ

১। আমি একজন 'উদাসীন গ্রন্থকীট' (যদিও কথাটি তাঁর নিজের নয়)।
২। তাতে কাজের কথার চাইতে বাজেকথা ঢের বেশি থাকবে।
৩। মানুষে একালে বই পড়ে না, পড়ে সংবাদপত্র।
৪। সেকালে এদেশে যেমন একদল ত্যাগীপুরুষ ছিলেন, তেমনি আর একদল ভোগী পুরুষও ছিলেন।
৫। আমাদের কাছে মাল্যচন্দনের শামিল বনিতাও নয়, কবিতাও নয়।
৬। সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট ফাঁক আছে।
৭। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়।
৮। মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে.....।
৯। তাঁর ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলুব্ধ।
১০। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে।
১১। ডেমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা।
১২। আমরা ডেমোক্রাসির গুণগুলি আয়ত্ব করতে না পরি তার দোষগুলি আত্মসাৎ করেছি।
১৩। ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
১৪। যে জাতি মনে বড়ো নয়, সেজাতি জ্ঞানেও বড়ো নয়।

১৫। মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

১৬। সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি; ও চর্চা মানুষের কারখানাতে করতে পার না চিড়িয়াখানাতেও নয়।

১৭। সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।

১৮। শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়।

১৯। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়।

২০। আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল।

এই উদাহরণগুলি থেকে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির বিশেষত্ব কিছু কিছু বোঝা যাবে।

৭৫.১২ অনুশীলনী-২

ক. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ

১। শিক্ষার সর্বপ্রথম অঙ্গ কী?

২। একটি দেশ বা জাতির উন্নত সংস্কৃত হয়ে ওঠার ভিত্তি কী?

৩। একজন শিক্ষকের সার্থকতা কোথায়?

৪। ভারতের প্রচলিত শিক্ষাবিধির ফলাফল, লেখকের মতে কী?

৫। একজন ছাত্রের 'পাশ' করা ও 'শিক্ষিত' হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৬। গ্রামে ও নগরে অধিক পরিমাণে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কেন?

৭। সাহিত্য-চর্চার আনন্দ দেশ ও জাতিকে কি ভাবে উপকৃত করে?

৮। কেন আধুনিক বাঙালীকে লেখক প্রাচীন গ্রীসের অনুসরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন?

৯। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে গুণী শিল্পী এবং গুণজ্ঞ পাঠকের দায়িত্ব কর্তব্য কী?

১০। প্রবন্ধের প্রথম অংশটির সঙ্গে দ্বিতীয় অংশটির যোগ সম্পর্ক কোথায়?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

১। প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে লেখকের ধারণাটি ব্যক্ত করুন।

২। লেখকের মতে প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে লাইব্রেরির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং সে বিষয়ে নিজের মতামত দিন।

৩। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেন লেখক প্রাচীন গ্রীসের অনুসরণ করতে বলেছেন?

৪। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ এ প্রবন্ধে কিভাবে পড়েছে?

৫। দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৭৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। প্রমথ চৌধূরী—*আত্মকথা।*

২। জীবন্দ্রে সিংহরায়—*প্রমথ চৌধুরী।*

৩। অধীর দে—*আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা।*

একক ৭৬ ❑ আমাদের সংস্কৃতির বিবর্তন—অন্নদাশঙ্কর রায়

গঠন

৭৬.১ উদ্দেশ্য
৭৬.২ প্রস্তাবনা
৭৬.৩ শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ জীবনকথা
৭৬.৪ শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ প্রবন্ধ সাহিত্য
৭৬.৫ মূল পাঠ (প্রথম অংশ)
৭৬.৬ সারাংশ
৭৬.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭৬.৮ অনুশীলনী-১
৭৬.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)
৭৬.১০ সারাংশ
৭৬.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ
৭৬.১২ অনুশীলনা-২
৭৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৭৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়ের—

- সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- প্রবন্ধ রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন;
- গদ্য রচনার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারবেন।

৭৬.২ প্রস্তাবনা

সভ্যতা-সংস্কৃতি কোন স্থির-স্থাণু বিষয় নয়। একটি জাতির বিবর্তনের সঙ্গে তারও বিবর্তন-রূপান্তর ঘটে। একটি দেশ বা জাতি যদি এক স্থানে স্থির ও অনড় হয়ে পড়ে থাকে তবেতার প্রাণশক্তিরও কোনো প্রমাণ পরিচয় মিলবে না। যে সব দেশের সঙ্গে একটি দেশের সংযোগ ঘটে, সেই সব দেশের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। অবশ্য প্রত্যেক দেশেরই নিজের নিজের এক একটি সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারা আছে; সে ধারার উদ্ভব-ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের একটি ইতিহাস থাকে। প্রাগৈতিহাসিক কালে, সব দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি মোটামুটি এক ও অভিন্ন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'কালচার', ভারতীয় ভাষায় তাকেই বলা চলে সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি' বলতে জীবনের এবং জাতীয় সব দিককেই মিলিতভাবে বুঝতে হবে। তাতে থাকবে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত-চিত্রকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য সবই। আমাদের ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশেষত্ব হল, যুগে-যুগে নানা দেশের, নানা ধরনের মানুষের আনাগোনা

ঘটেছে এবং তাদের সঙ্গে ভারতবাসীর নানা প্রকারের সংযোগ সাধিত হয়েছে। এই প্রকার আদান-প্রদানের মাধ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে বেড়ে উঠেছে। তবে, সংস্কৃতির এই ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কেবল আদান নয়, প্রদানও চাই। প্রদানটাই বেশি করে চাই। এই প্রদানের মধ্যেই কোন জাতির প্রাণ ও প্রতিভার দিকটি ধরা পড়ে। সংস্কৃতির একটি চলমান ধারা আছে, বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সেটিকে জিইয়ে রাখতে হয়। নইলে চলমান জীবনের ধারার সঙ্গে অতীতের মধ্যে স্থির হয়ে থাকা সংস্কৃতির ধারাটি মিলবে না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সগে জীবনেরও অগ্রগতি ও বিবর্তন ঘটে। কাজেই, জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতি ও বিবর্তন ও রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন। নইলে সংস্কৃতির ধারাটিই বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন চলমান জীবনের সঙ্গে অতীতের মধ্যে মরে থাকা সংস্কৃতির তাল মেলে না। সংস্কৃতির ধারার এই বিবর্তন বা রূপান্তর ঘটাতে হবে— সে দেশেরই নিজের সাহিত্য, লোকসাহিত্য এবং অন্যান্য জাতীয় সম্পদকে অবলম্বন করে, তার মধ্যে নতুন প্রাণকে আবিষ্কার করে।

৭৬.৩ শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ জীবনকথা

বাংলা সাহিত্যের বুদ্ধিজীবী লেখকগণের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর প্রথম সারির একজন। নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছন। নিজের জীবন এবং আত্মকথাধর্মী রচনাও তিনি লিখেছেন। সেইসব রচনাদি অবলম্বন করে তাঁর জীবনের একটি রূপরেখা রচনা করা যায়। তাঁর জন্ম ১৫ই মার্চ, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ। পিতা নিমাইচরণ উড়িষ্যাবাসী প্রবাসী বাঙালী, উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলে তাঁর জন্ম। পারিবারিক দিক থেকে শাক্ত হলেও পিতা নিমাইচরণ বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নেন এবং পুত্র এক উদার ধর্মের অনুসারী। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান—বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে তাঁর মানসিক সংযোগ তাঁকে এই বিশেষ উদার ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল। ভাষার দিক থেকে তিনি ওড়িয়া ভাষায় অভিজ্ঞ, জীবনের প্রথম দিকে এ ভাষায় কিছু রচনাদিও লিখেছিলেন 'বঙ্গোৎকল' ছদ্মনামে। আকালেই মা হেমনলিনীর মৃত্যু হয়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন; ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা বিশ্বদ্যিালয় থেকে আই.এ পরীক্ষায় প্রথম হন; ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইংরেজি অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৭-এ আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হন এবং ভারতীয় প্রশাসনে যোগ দেন (১৯২৯)। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলাতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ প্রভৃতি নানা ধরনের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে, চাকুরিকাল শেষ হবার আগেই অবসর নেন। আই. সি. এস' (১৯৭৮) নামে একটি বইও লেখেন। 'দিশা' (১৯৭১), 'চক্রবাল' (১৯৭৮), 'বিনুর বই' (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব একসঙ্গে, ১৯৯৩) (প্রথম পর্ব ঃ ১৯৪৪। যদিও তিনি বলেছেন, বিনু সর্বদাই তিনি নন।)— প্রভৃতি রচনা তাঁর জীবন ও স্মৃতিমূলক রচনা। প্রথম বিদেশ প্রবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা গ্রন্থ 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১)। 'কবিতীর্থ', পত্রিকার (সঙ্কলন সংখ্যা—৬২) গণনা অনুসারে তাঁর ভ্রমণ ও প্রবন্ধ পুস্তক সংখ্যা ৫২। তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, ছড়া কবিতার প্রসঙ্গে পরে বলছি।

অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যিক ছদ্মনাম—লীলাময় রায়, তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী-র নামও লিলা রায়। ১৯৯২-তে তাঁরা প্রয়াণ ঘটে।

২৮ অক্টোবর, ২০০২, শ্রী রায় কোলকাতার এস. এস. কে. এম হাসপাতালে প্রয়াত হন। বেশ কিছু দিন ধরেই তিনি শ্বাসজনিত সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর।

বর্তমান বাঙালা সাহিত্যের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি। সবচেয়ে বড়ো বুদ্ধিজীবী। কিন্তু তিনি যতো বড়ো লেখক ততো বড়ো বাগ্মী নন। এখনও তাঁর প্রতিভা অক্ষয় এবং জীবন্ত।

৭৬.৪ শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ প্রবন্ধ সাহিত্য

সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষই অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। 'বিনুর বই'তে বিনু সেজে দেশ-কালের অতীত, নর-নারী নির্বিশেষে মানুষকে খোঁজেন। ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সত্যাসত্য' উপন্যাসেও— যার যেথা দেশ, সত্যাসত্য, প্রথম খণ্ড, ১৩৩৯। অপসরণ, সত্যাসত্য, ষষ্ঠখণ্ড, ১৩৪৯। মাঝখানের খণ্ডগুলির মধ্যে আছে ঃ 'কলঙ্কবতী' (১৯৪১), 'দুঃখমোচন' (১৯৪৩), মর্ত্যের স্বর্গ (১৩৪৬), প্রভৃতি তিনি মানুষের খোঁজেই বেরিয়েছেন। নানা ভাবে, নানা রূপের মানুষ, কিন্তু সত্য, জীবনসত্য একই। তাঁর ভ্রমণকাহিনীর মধ্যেও (ইউরোপের চিঠি, ১৯৫৫; জাপানে, ১৩৬৫; 'পথে প্রবাসে', ১৯৪১; ফেলা, ১৩৭২), সেই বিশেষ অন্বেষণ ঃ একটি উদার, আধুনিক ও সমন্বয় মূলক দৃষ্টিকোণের পরিচয়। কখনো টলষ্টয় বা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিজেকেই আবিষ্কার-অন্বেষণ করেন (টলষ্টয়, ১৩৮৭)। তেমনি, শিক্ষা— বিষয়ে নানা চিন্তা করেন (শিক্ষার ভবিষ্যৎ, ১৩৮৮)। কিংবা, ভাহতীয় রাজনীতি বিষয়ে চিন্তা করেন (স্বাধীনতার পূর্বাভাষ, ১৩৮৬)। তবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো আলোচ্য দিক, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে (লালন ফকির ও তাঁর গান, ১৩৮৫)। সংস্কৃতির বির্তন, ১৩৮৪। সাহিত্য সংকট, ১৩৬২)।

তাঁর প্রথম দশটি প্রবন্ধ পুস্তক থেকে নির্বাচিত রচনাবলী নিয়ে বের হয় 'প্রবন্ধ' (১৯৬৪)। এতে 'তারুণ্য' (১৯২৮), 'আমরা' (১৯৩৭), 'জীবনশিল্পী' (১৯৪১), 'ইশারা' (১৯৪২), 'বিনুর বই' (১৯৪৪), 'জীয়নকাটি' (১৯৪৯), 'দেশ-কাল-পাত্র' (১৯৪৯), 'প্রত্যয়' (১৯৫১), 'আধুনিকতা' (১৯৫৩), 'কণ্ঠস্বর' (১৯৫৭) প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১৯২৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত, প্রায় তিনদশকের চিন্তা ধরা পড়েছে। 'জীবনশিল্পী' রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা, এতে রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটের ওপর প্রবন্ধ আছে। 'বিনুর বই'য়ের ছোটো ছোটো রচনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। 'জীয়নকাঠী' সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, যুদ্ধকালে লেখক শিল্পীদের কর্তব্য কী, তিনি তারই উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন এখানে। 'দেশ-কাল-পাত্র' হল গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, বার্ণার্ডশ' এবং ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা। 'প্রত্যয়' বইটি একটি বিশেষ আঙ্গিকে লেখা। মূলত গান্ধীজী এবং ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন মতবাদকে সংলাপের আকার দিয়ে লেখা। 'আধুনিকতা' বইয়ে আধুনিকতা বলতে ইউরোপীয় রেনেসাঁস এবং ফরাসী বিপ্লবের উত্তরকালকে বোঝানো হয়েছে। এতে রুশো, ভলতেয়ার ও গ্যেটে সম্পর্কে আলোচনা আছে। 'কণ্ঠস্বরে 'র ভূমিকায় লেখক নিজেই লিখেছেন—"..... যাঁরা শিল্প সৃষ্টির জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের দেশ কালের আর দশ জনের মতো আর দশটা সমস্যা নিয়ে ভাববেন কিনা। লিখবেন কিনা।....কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলবেন কিনা। এ প্রশ্ন আমাকে সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিন থেকেই অনুসরণ করে এসেছে।....."এদিক থেকে বিচার করলে 'জীয়ন কাটি' এবং 'কণ্ঠস্বর' এরগ মধ্যে লেখকের নিজ জিজ্ঞাসার একটি মিল দেখা যায়।

অন্নদাশঙ্কর নব-নব ফর্মের আবিষ্কার করেছেন, কি তাঁর সৃষ্টিমূলক লেখায়, কি তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে। যেমন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিতিন পত্র-প্রবন্ধের সূচনা করেন, যা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকগণও করেছিলেন (দ্র. 'কালান্তর' গ্রন্থের 'বাতায়নিকের পত্র। পত্রমূলক, ডায়ারিমূলক ভ্রমণকাহিনী তো রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম দিকেই লিখেছেন)। পত্রমূলক প্রবন্ধকে অন্নদাশঙ্কর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

অন্নদাশঙ্করের প্রথম রচনা 'পারিবারিক নারী সমস্যা' 'ভারতী' পত্রিকায় পত্রস্থ হয়। 'ভারতী'তেই তাঁর প্রথম সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্র' পত্রিকায় তাঁর 'পথে প্রবাসে' বইটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং তা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বিচিত্রা'তেই তাঁর রবীন্দ্রনাসাহিত্য বিষয়ক বিখ্যাতপ্রবন্ধ 'রক্তকরবীর তিনজন' বের হয়। তবে অন্নদাশঙ্করের নিজের দেওয়া নাম ছিল—তিনটি টাইপ'।

তাঁর লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে আছে 'তিনটি পল্লীগাথা', 'হারামণি' (মনসূর উদ্দীন আহ্‌মদের গ্রন্থ প্রসঙ্গে) লোকসকাহিত্য-সংস্কৃতিকে তিনি উচ্চতর সাহিত্যের সহযোগী সাহিত্য বলে মনে করেন।

৭৬.৫ মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

ভারতের সংস্কৃতি ভারতে বাইরেও বহুদূর পরিব্যপ্ত ছিল। কোথায় ইন্দোনেশিয়া, কোথায় ইন্দো-চীন, কোথায় তিব্বত, কোথায় সিনক্রিয়াং, কোথায় আফগানিস্তান, যেদিকেই চোখ ফেরাই সেদিকেই দেখি ভারতীয় সংস্কৃতির বটবৃক্ষের ঝুরি। ভারতের লোক ভুলে গেছে কবে কারা সেসব দেশে গিয়ে সংস্কৃতি বিস্তার করেছিল, কিন্তু সেসব দেশের লোক এখনো ভোলেনি কিংবা ভুলে গেলেও সজ্ঞানে কীর্তিলোপ করেনি। ইসলাম তো মন্দির ও মূর্তিভঙ্গের জন্যে প্রসিদ্ধ, অথচ আফগানিস্থানের বামিয়ানের বুদ্ধমূর্ত্তি এখনো সযত্নে রক্ষিত। আর জাভাদ্বীপের বোরোবুদর। এখানে বলে রাখি কালপাহাড়ীতে খ্রীস্টানরাও কম যায় না। প্রাচীন গ্রীক রোমক কীর্ত্তি তারাও একদা ধ্বংস করেছে বা অন্য কাজে লাগিয়েছে। তা সত্ত্বেও যা টিকে গেছে তা এখন তাদেরই বংশধরদের দ্বারা উত্তরাধিকার রূপে সাদরে সংরক্ষিত।

ভারতের বাইরে পরিব্যাপ্ত ভারতীয় সংস্কৃতি অবিমিশ্র আর্য বা অবিমিশ্র বৈদিক বা অবিমিশ্র বৌদ্ধ বলতে পারা যায় না। জাতি ও ধর্ম এক্ষেত্রে গৌণ। পরিব্যাপ্তির পূর্বেই নানা জাতির ও নানা ধর্মের মিশ্রণ বা সমন্বয় ঘটেছিল সংস্কৃতির মূল ভূখণ্ডেই। ভারতের সংস্কৃতি যতই প্রাচীন হোক না কেন তার পূর্বেও প্রাচীনতর ছিল। সেই যে প্রাচীনতর সেটা আর্যপূর্ব, বেদপূর্ব ও বুদ্ধপূর্ব। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ভারতে ও ভারতের বাইরে যে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ধার করেছে তা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিলুপ্ত সংস্কৃতির অস্পষ্ট ও আংশিক একটি আলেখ্য রচনা করতে সাহায্য করছে। মোটামুটি বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মোহেনজো-দরো আর হরপ্পার মতো নগরে ও বন্দর সিন্ধু উপত্যকাতেই নিবদ্ধ ছিল না। আরও পূর্ব দিকে ও আরও দক্ষিণ দিকেও একই প্রকার প্রত্নবস্তু মিলেছে। আবার আরও পশ্চিমে অর্থাৎ ভারতের বাইরেও যে অনুরূপ প্রত্নবস্তু পাওয়া যাচ্ছে না তা নয়। ভারত তো একটা দ্বীপ নয়। একটা মহাদেশের অঙ্গ। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতা বিশুদ্ধ ভারতীয় না হয়ে কন্টিনেন্টালও হতে পারে। অর্থাৎ কেবল ভারতের একার না হয়ে আরও অনেকেরও হতে পারে। নিকেটই তো সুমেরীয় সভ্যতা ছিল। আর একটু দূরে চৈনিক। আরও দূরে ছিল মিশরীয়। এই চারটি সবচেয়ে প্রাচীন। সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটি চৈনিক। আরও দূরে ছিল মিশরীয়। এই চারটি সবচেয়ে প্রাচীন। সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটি আলাদা শব্দ হলেও প্রাগৈতিহাসিক প্রসঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব নয়। পরে তাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বাড়ে। এখন আমরা সভ্যতা শব্দটি কম জায়গায় ব্যবহার করি, সংস্কৃতি শব্দটি সব জায়গায়। এ দুটি শব্দ সিভিলাইজেশন ও কালচারের পারিভাষিক শব্দ। মূল শব্দ দুটির উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে। পারিভাষিক শব্দ দুটির জন্ম ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে। বাংলায় লিখলেও আমরা ইংরাজির সঙ্গে মিলিয়ে নিই।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলগুলি বরাবরই বাইরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক কালেও ছিল একটা না একটা বহিভারতীয় সাম্রাজ্যের সামিল। যেমন পারস্য সাম্রাজ্যের, গ্রীকবংশী সাম্রাজ্যের, শক সাম্রাজ্যের, কুশান সাম্রাজ্যের, হূন সাম্রাজ্যের। আর্যভাষী ট্রাইবগুলি বাইরে থেকে এসেছিল কি না তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু এটা তো তর্কাতীত যে পারসিক, গ্রীক, শক, কুশান, হূনরা বাইরে থেকে এসে এক দেহে লীন হয়েছিল। অনুমান করতে আপত্তি কী, আর্যভাষীরাও একই দেহে লীন হয়েছিল আরও আগে থেকেই? একদা পন্ডিতদের ধারণা ছিল যে আর্যভাষী মাত্রেই এক জাতি বা রেস। এখন সে থিয়োরি পরিত্যক্ত হয়েছে। আর্য ভাষার কথা বললেই আর্যবংশীয় হয় না। বাংলা ভাষা আর্যভাষা, কিন্তু বাঙালি জাতি কি আর্য? আর্য বলে কোনো জাতি যদি কখনো বিশুদ্ধ আকারে থেকে থাকে তবে তা দাস বা দস্যু

জাতির সঙ্গে বা অন্যান্য অনার্য জাতির সঙ্গে এক দেহে লীন হয়েছে। যা রেখে গেছে তা কয়েকটি আর্য ভাষা। সে রকম ভাষা ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিস্তৃত। অথচ ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রচলিত নয়। তামিল বা তেলেগুর সঙ্গে সংস্কৃতের মিশাল ঘটলেই তা আর্যভাষায় পরিণত হয় না। সে রকম মিশাল সিংহলী, বর্মী, মালাই ভাষার সঙ্গেও ঘটেছে। সংস্কৃত ছিল সেকালের শিক্ষিত শ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষার ভাষা। কিন্তু কারও মাতৃভাষা নয়। অন্তত দক্ষিণে তো নয়ই। একালে যেমন ইংরেজি হয়েছে শিক্ষাদীক্ষার ভাষা। কেই তার ফলে ইংরেজে পরিণত হয়নি। আর্য শব্দটি সেকালে ব্যবহার করা হত সম্ভ্রান্ত অর্থে। স্ত্রী-স্বামীকে বলত 'আর্যপুত্র'। মহিলাদের সম্বোধন করা হত 'আর্যে' বলে। এর থেকে জাতি বা ভাষার নামকরণ সঙ্গত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এরূপ নামকরণের নজির নেই। আর্য তো আমাদের প্রতিবেশী ইরান দেশবাসীরাও। 'ইরান' শব্দটি আর্য বা আরিয় শব্দেরই অন্যরূপ। তেমনি আয়ারল্যান্ডের প্রকৃত নাম 'এইরা'। যার থেকে হয়েছে 'আইরিশ'।

ভারতের মানুষ কোনোকালেই অবিমিশ্র আর্য জাতীয় বা আর্যভাষী ছিল না। কোনো কালেই অবিমিশ্র সংস্কৃতভাষী ছিল না। কোনো কালেই অবিমিশ্র বৈদিক ধর্মবিশ্বাসী ছিল না। কোনোকালেই অবিমিশ্র বর্ণাশ্রম নামক সমাজব্যবস্থার শাসনাধীন ছিল না। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র চারবার এ দেশের কোনো এক নগরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার কাছে অধিকাংশ আঞ্চলিক সরকার নতিস্বীকার করেছে। একবার মৌর্যযুগে, একবার গুপ্তযুগে, একবার মুঘল যুগে, একবার বিট্রিশ যুগে। চারটি যুগই দুই-তিন শতাব্দীতেই শেষ। এদিক থেকে সমগ্র ভারত সমগ্র ইউরোপের সঙ্গেই তুলনীয়। বিবিধের মধ্যে ঐক্যের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্রোত চির প্রবহমান, যেমন ইউরোপে তেমনি ভারতে। ভারত প্রকৃতপক্ষে একটি মহাদেশ। ইউরোপেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কয়েকবার দেখা গেছে। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর রোমান ক্যাথলিক চার্চের আদর্শে হোলি রোমান এম্পায়ার স্থাপন করা হয়, কিন্তু চার্চ নিজেই বিভক্ত হয়ে যায়। সাম্রাজ্যও সেই পথ ধরে। নেপোলিয়নের অভিপ্রায় ছিল রোমকে বা ভিয়েনাকে কেন্দ্র না করে প্যারিসকে কেন্দ্র করে নতুন এক সাম্রাজ্যের পত্তন। তিনিও ব্যর্থ হন। হিটলারের স্বপ্ন ছিল বার্লিনকে কেন্দ্র করে পুনর্বার সাম্রাজ্য সংস্থাপন। তিনিও বিফল হন। অনেকের আশঙ্কা এবার মস্কোর পালা। সেখান থেকেই দিগ্বিজয় আরম্ভ হয়ে সারা ইউরোপকে লালে লাল করবে। তার জন্যে সামরিক প্রস্তুতি চলেছে প্রত্যেকটি দেশেই। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে।

বিবিধের মধ্যে ঐক্যের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্রোত ইউরোপেও ভারতের মতোই চির প্রবহমান। এটা রাজনীতির জগতে তেমন অর্থবহ নয় যেমন সংস্কৃতির জগতে। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবাই বেঠোভেনের সঙ্গীত আর শেক্সপীয়ারের নাটক ভালোবাসে। সকলেরই প্রিয় ইটালীর আর ফ্রান্সের চিত্র ভাস্কর্য। লাটিন যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা ছিল তখন এক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সব দেশের বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়োগ ছিল। ক্লাসের পড়াশুনা সব দেশের ছাত্র মিলে একসঙ্গে করত। কিন্তু থাকা খাওয়ার বেলা পৃথক ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থাকেই বলা হত কলেজ। কলেজ কথাটির অর্থই ছিল ছাত্রাবাস। ইউরোপের লাটিন-মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইউরোপকে যে সাংস্কৃতিক ঐক্য দেয় যে তা পরবর্তীকালে ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি মাধ্যম প্রবর্তনের ফলে ছিন্নভিন্ন হয়। এখন এক দেশের ছাত্র অপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সচরাচর পড়তে যায় না। এক দেশের অধ্যাপক অপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত স্থায়ী পদ পান না। প্রত্যেকটি ভাষাই চেষ্টা করছে লাটিনের শূন্যতা পূরণ করতে। দর্শনে বিজ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে। কিন্তু পাঠকসংখ্যার উপরই নির্ভর করে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনের লাভক্ষতি। সেদিন থেকে ইংরেজিই সব চেয়ে ভাগ্যবান, তার পরে রাশিয়ান। ফরাসী জার্মানও হটে যাচ্ছে। ইটালিয়ানও পেছিয়ে পড়ছে। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক-এক দেশ বা এক-এক বিশ্ববিদ্যালয় এক-এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করছে। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানে বা পুরাতত্ত্বে। সব দেশ বা সব বিশ্ববিদ্যালয় সব বিষয়ে

বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে পারে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্রও নানা দেশের নানা স্থানে স্থাপিত হয়েছে। ভাষা সাধারণত ইংরেজি বা ফরাসী বা দুইই বা স্থানীয় ভাষা মিলে তিন। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে রাশিয়ানদের আকর্ষণ করতে পারা যাচ্ছে না। তাদের আকর্ষণ করতে হলে তাদের ভাষাকেও যথাস্থানে দিতে হবে।

এবার ভারতের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীনকাল থেকেই বারাণসী, তক্ষশীলার মতো উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় তা ছিল বলে মনে হয় না। উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বিদ্বান ও বিদ্যার্থীর সমাগম হত ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ভারতের বাইরে থেকেও। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ পণ্ডিতদেরও অসংখ্য গ্রন্থ ছিল ও চীন-জাপানে গেলে এখনো দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চতুষ্পাঠীতে বা ক্ষত্রিয় রাজার রাজসভায় নিবদ্ধ ছিল না। বৌদ্ধ বিহারগুলিতেও সংস্কৃতচর্চ্চা হত। একজন সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু আমাকে বলেন সিংহলী ভাষার শতকরা আশিটি শব্দই সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ। জৈনদের মধ্যেও সংস্কৃতের চর্চা ছিল উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে। তবে জনসাধারণের জন্যে বৌদ্ধরা ব্যবহার করতেন পালী ও জৈনরা প্রাকৃত। প্রাকৃত থেকেই কালক্রমে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা বিবর্তিত হয়। সংস্কৃত থেকেই তারা নানা ভাবে প্রেরণা ও সাহায্য পায়। ইউরোপে যেমন ইটালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা বিবর্তিত হয় স্থানীয় লোকভাষা থেকে। যেমন লাটিন থেকে প্রেরণা ও সাহায্য পায়। এই সমান্তরাল বিবর্তনটা মোটের উপর একই ঐতিহাসিক যুগে সাধিত হয়। এখানে বলে রাখি যে তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগুলি আর্যভাষা নয়। তাদের বিবর্তনের ধারা অন্যরূপ। তামিল তো সংস্কৃতের মতোই প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে যেন লাটিনের সঙ্গে গ্রীকের তফাৎ শুধু এই যে গ্রীক ও আর্যভাষা। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা উত্তর ভারত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেনি, যদিও তা এখানে ওখানে অনুপ্রবেশ করেছে।

যতদূর জানা আর্যদের পূর্বেও দ্রাবিড়রা ছিল। ছিল উত্তরভারতেও। কিন্তু কোণঠাসা হতে হতে দক্ষিণে ঘাঁড়ি গাড়ে। এখানে আর্য আর দ্রাবিড় শব্দ দুটো আমি জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করছি। আর্যরা দ্রাবিড়দের সর্বত্র জয় করতে পারেনি। তার আগেই একপ্রকার সন্ধি হয়ে যায় এই মর্মে যে, তুমি তোমার এলাকায় থাকবে, আমি আমার এলাকায় থাকব। এই প্রকার সন্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ণাশ্রমী সমাজ ব্যবস্থা। গোড়ায় সেটা বোধহয় ক্ষত্রিয়প্রধান ছিল, ব্রাহ্মণপ্রধান নয়। যেমন ইউরোপ। পরবর্তীকালে যেমন সেখানে খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসীদের প্রাধান্য ঘটে তেমনি এখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের। মৌর্যদের আমলেও এটা ছিল না। এটা খ্রীস্টোত্তর কালের বলেই আমার অনুমান।

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের আরও এক অদৃশ্য মিল, খ্রীস্টীয় যাজকদের প্রাধান্য উত্তরাংশের রাজারা খর্ব করেন। রাজশক্তি যাজকশক্তিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেয় না। চার্চ দু'ভাগ হয়ে যায়। এদেশে আরব, তুর্ক আর মুঘলরা এসে উত্তরভারতের রাজশক্তি করায়ত্ত করে। রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য লোপ পায়। রাজভাষা সংস্কৃতের জায়গায় ফারসী হয়। সংস্কৃত শিক্ষায় যাদের অধিকার ছিল না তারাও অবাধে ফারসী শিখতে পায়। ফারসী শিখে রাজকর্মে নিযুক্ত হয়। জায়গির ইনাম পায়। রাজা খেতাব পায়। বর্ণের দিক থেকে শূদ্র, শ্রেণীর দিক থেকে জমিদার, রাজকর্মের দিক থেকে দেওয়ান বা ফৌজদার এঁরা রাষ্ট্রের মই বেয়ে উপরে ওঠেন। তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও এঁদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের মতো ব্যবহার করেন। উত্তরাখণ্ডের কায়স্থরা তো ক্ষত্রিয় বলেই স্বীকৃত হন। অসিজীবী নয়, সমীজীবী ক্ষত্রিয়।

ফারসীর সঙ্গেও বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার প্রতিবেশী সম্পর্ক পাতানো হয়। এসব ভাষা ফারসী থেকেও প্রেরণা ও সাহায্য পায়। দিল্লীর আশেপাশে একটি মিশ্র ভাষারও প্রচলন হয়। ফারসী-মিশ্রিত স্থানীয় ভাষার নাম রাখা হয় উর্দু।

এ ভাষা বিদেশী ভাষা নয়। এর ব্যাকরণ আর হিন্দীর ব্যাকরণ মোটের উপর অভিন্ন। হিন্দুরাও পুরুষানুক্রমে উর্দুভাষী হয়। শিখরাও । সুতরাং এটা মুসলমানদের একচেটে নয়। উদুভাষী হলেই মুসলমান হয় না। তেমনি মুসলমান হলেই উর্দুভাষী হয় না। অনেকেই গুজরাটীভাষী, সিন্ধীভাষী, বাংলাভাষী, তামিলভাষী। হিন্দীভাষী মুসলমানও যে নেই তা নয়। ঝগড়াটা প্রধানত লিপি নিয়ে। লিপি আলাদা না হলে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভাষা উর্দু, উভয়েরই ভাষা হিন্দী। লিপি নিয়ে ঝগড়া পাঞ্জাবীদের মধ্যেও দেখা যায়। গুরুমুখী একটা লিপির নাম। এ লিপিতে যারা লেখে তারা ধর্মে শিখ। কিন্তু তাদের ভাষা পাঞ্জাবী। যারা ধর্মে হিন্দু তারা লেখে নাগরীতে। কিন্তু তাদের ভাষাও পাঞ্জাবী। তার পাঞ্জাবী সাহিত্যের তিন লিপি। সেইসূত্রে তিন প্রস্থ পাঠক। অতএব তিন প্রস্থ লেখক। তারা আবার দেশভাগ ও প্রদেশভাগের পরে দুই ন্যাশনালিটিতে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এখনো তাদের পুরাতন লোকগাথা তাদের সকলের প্রিয়। লোকসাহিত্যে ধর্মভেদ, নেশনভেদ নেই। প্রচ্ছন্ন ঐক্য ফল্গুধারার মতো নিত্য প্রবলমান।

ফারসীকেও একদিন ইংরেজির জন্যে আসন ছেড়ে দিতে হল। ব্রিটিশ রাজ ইংরেজি শিক্ষিতদের রাজকর্মে নিযুক্ত করলেন। শূদ্ররাও বড়ো বড়ো পদ পেয়ে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ হল। বড়লাটের শাসনপরিষদের প্রথম ও তৎকালে একমাত্র ভারতীয় সদস্য ও পরবর্তীকালে প্রথম তথা একমাত্র ভারতীয় লর্ড একজন কায়স্থ বংশের সন্তান। এই যে পরিবর্তন এটা কেবল রাষ্ট্রেই নিবদ্ধ রইল না, সমাজেও পরিবর্তন দেখা দিল। বর্ণাশ্রম ভেঙে পড়ল। ফারসী শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা পরোক্ষভাবে অভূতপূর্ব সামাজিক পরিবর্তন সাধন করেছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তাকে রেনেসাঁস বলা ভুল নয়। তবে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের সঙ্গে তা সর্বাঙ্গে মেলে না। সর্বাঙ্গে মেলবেও না। তা দেখে কেউ যদি বলেন যে রেনেসাঁস কোনো কালেই এদেশে হবার নয়, তার প্রয়োজনই নেই তা হলে সেটা হবে মস্ত বড়ো ভুল। রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে এদেশের সাহিত্যিকে, দর্শনকে, বিজ্ঞানকে, চিত্রকলাকে, ভাস্কর্যকে, নৃত্যকে, নাট্যকে। কবে শ্রমিক কৃষক সর্বহারা এতে যোগ দেবে বা এর নায়ক হবে তার জন্যে দেশের সারস্বতরা অপেক্ষা করবেন না। শ্রীক্ষেত্রে সকলের প্রবেশাধিকার আছে। সংস্কৃতের শ্রীক্ষেত্রে মধ্যবিত্তদেরও।

৭৬.৬ সারাংশ

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে লেখক তিনটি প্রসঙ্গের ওপর জোর দিয়েছেন ঃ ক) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের ভূমিকা; খ. সেই 'ঐক্য' ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেমনভাবে ধরা পড়েছে, সে বিষয়ে তুলনা; গ. প্রথমে ফারসি এবং পরে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা ভারতীয় জন-মানসে যে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, তার পরিণামে ভারতীয় জীবনে যে এক নব-জন্মের প্রবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করা। এই বক্তব্যগুলিকে তুলে ধরবার জন্য লেখক ভারতবর্ষ ও ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের পটভূমিকাটিকে ভিত্তি করেছেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ভারতের বাইরেও নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নানা দেশ ও জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি যুগে-যুগে ভারতে এসে মিলিত-মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে ভারতের সংস্কৃতিকে কোন মতেই একটি 'অবিমিশ্র' সংস্কৃতি বলা যায় না। তেমনি আবার গোটা ভারতবর্ষের সর্বত্রই একই সংস্কৃত ভাষা বা একই বৈদিক ধর্ম বিশ্বাস কিংবা একই বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত ছিল না। উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণভারতের সাংস্কৃতিক পার্থক্য বরাবরই ছিল। ফলে, সমগ্র ভারতের একটি সাংস্কৃতিক 'ঐক্য' পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি, যদিও বিভেদের মধ্যে ঐক্যের একটি প্রচ্ছন্ন ধারা বর্তমান ছিল। ভারতের ইতিহাসে মাত্র চারবার কোন একটি নগরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, তবে কোনটিই দু-তিন শতাব্দীর

বেশি স্থায়ী হয়নি। এই চারবার হল— মৌর্যযুগ, গুপ্তযুগ, মুঘল যুগ এবং ব্রিটিশ যুগ। ইউরোপেও একাধিক বার একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল—একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

ইউরোপে যখন শিক্ষা-দীক্ষা ছিল ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে, তখন সমগ্র ইউরোপে ওই ভাষাই এনে দিয়েছিল একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য। পরবর্তীকালে ইংরেজি, ফরাসি বা জার্মান ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাধারার প্রবর্তন ঘটলেও, সেই সাংস্কৃতিক ঐক্যটি বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক ভাষাই চেষ্টা করেছিল,—লাটিন ভাষার শূন্য স্থান পূরণ করতে, কিন্তু সফল হয়নি। একই ব্যাপার ঘটেছে, ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও। ভারতেও বারাণসী, তক্ষশীলা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং ভারতের বাইরের থেকেও সেখানে ছাত্র সমাগম হত। কিন্তু তথাপি উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক পার্থক্য ঘোচে নি। ইউরোপে যেমন সমাজে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক সময়ে খ্রীষ্টীয় যাজক-সন্ন্যাসীদের প্রাধান্য দেখা গেছে, ভারতেও তেমনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের। ইউরোপের উত্তরাংশের রাজারা যেমন খ্রীষ্টীয় যাজক-সন্ন্যাসীদের মাহাত্ম খর্ব করেছেন, ভারতেও তেমনি আরব-তর্ক মুগলরা ভারতের রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পরাভূত করে সংস্কৃত ভাষার স্থানে ফারসি ভাষার প্রবর্তন করেছেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা এসে সেই ফারসি ভাষাকে হঠিয়ে ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য ভারতীয়গণই এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ নেন। এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ভারতের সামাজিক জীবনে এল এক বড় পরিবর্তন। যেমন, বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা অনেকটা শিথিল হল। সেই পরিবর্তনেরই নাম— ভারতের নবজন্ম, রেনেসাঁস। এর পরবর্তী বিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হয়েছে— শিক্ষিত ও সচেতন মদ্যবিত্ত শ্রেমীর সক্রিয় উদ্যোগের।

৭৬.৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

'আমাদের সংস্কৃতির বিবর্তন' নামে প্রবন্ধটি অন্নদাশঙ্করের 'সংস্কৃতির বিবর্তন' (১৯৮৪) নামে প্রবন্ধ পুস্তকের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ। গ্রন্থটির নামের মধ্যেই সংস্কৃতির বিবর্তনের কথাটি আছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি সেই সামগ্রিক বক্তব্যের একটি অংশ।

এই প্রবন্ধে লেখক ভাষাকেই সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপকরণ বলে মনে করেছেন এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরগ বক্তব্যটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন। রাষ্ট্রনৈতিক দিকটিকে তিনি তাই তেমন প্রাধান্য দেননি। রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে দুটি দেশ ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অভিন্ন হতে পারে। আধুনিক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকেরা সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাষাকে খুব উচ্চে স্থান দেন, অন্নদাশঙ্কর ও তাই করেছেন। আলোচনার সূত্রপাত করেছেন—আর্যভাষা দিয়ে। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আর্য ভাষার প্রচলন থাকলেও ভারতের সর্বত্র, আর্যভাষার প্রচলন নেই। 'আর্য' শব্দটি সেকালে ব্যবহৃত হত 'সম্ভ্রান্ত' অর্থে; আর্য ভাষা ছিল শিক্ষাদীক্ষার ভাষা, কারো মাতৃভাষা নয়। ভারতের কেনো কালেই আর্য ভাষা অখণ্ড প্রচার ছিল না। তবে ভারতে একটি প্রচ্ছন্ন ঐক্যের ধারা বর্তমান ছিল। ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার ভাষা ছিল ল্যাটিন, সে ভাষাই সাংস্কৃতিক ঐক্যের সৃষ্টি করেছিল। সংস্কৃত ভাষা তেমন ভারতের ক্ষেত্রে। বৌদ্ধ এবং জৈনরাও সংস্কৃতিক ঐক্যের সৃষ্টি করেছিল। সংস্কৃত ভাষা যেমন ভারতের ক্ষেত্রে। বৌদ্ধ এবং জৈনরাও সংস্কৃতচর্চা করতেন। সাংস্কৃতিক ঐক্য রচনায় ইউরোপে যেমন ল্যাটিন ভাষার ভূমিকা স্বীকার্য, ভারতে তেমনি সংস্কৃত ভাষার। সংস্কৃতের সঙ্গে তামিল, তেলেগু ভাষার সম্পর্ক যেন ইউরোপের ল্যাটিনের সঙ্গে গ্রীকের।

প্রাচীন যুগ পেরিয়ে মধ্য ও আধুনিক যুগে দেখা যায় ভারতে এসেছে ফারসি ও ইংরেজি ভাষা। অর্থাৎ ভাষা সংস্কৃতির এ এক বিবর্তন। সংস্কৃত থেকে ফারসি, ফারসি থেকে ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির বিবর্তন ভারতীয় মানুষেরও বিবর্তন সাধন

করল। এখানেই লেখকের চিন্তার বিশেষত্ব। তার মতে রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনের ফলে যে ভাষাগত পরিবর্তন ভারতীয় সমাজে দেখা দিল— সে পরিবর্তনটিই ভারতীয় জীবনকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিবর্তিত করেছে; কোনো রাষ্ট্রশক্তির প্রতিক্রিয়ায় বা প্রতিফলের জন্য নয়। অর্থাৎ লেখক ভাষাকেই সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বা বিবর্তনের মূল কারণ বলতে চান। নিজের এই তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন, মুঘল আমলে ভারতীয়গণ ফারসি ভাষা শিখে রাজকার্যে নিযুক্ত হয়, শূদ্ররাও উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম শিথিল হতে থাকে। এ ব্যাপারে ইংরেজের আমলেও ঘটেছে। যে কোনো বর্ণের মানুষই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এইভাবে ভাষা সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে দিতে পেরেছে। ফারসি ভাষার প্রসঙ্গে লেখক উর্দু ভাষার কথাও তুলেছেন। ফারসির সঙ্গে ভারতের আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণের ফলেস উদ্ভুত হয়েছে উর্দু ভাষার। এ ভাষা মূলত ভারতীয় ভাষাই। হিন্দী ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে এ ভাষার বিশেষ অমিল নেই। ফলে উর্দু ভাষাও একটি সাংস্কৃতিকঐক্য রচনা করেছে ভারতীয় মানসে। ফারসি, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষার প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় জীবনে, ইতিহাসের পথ ধরে, এই যে পর-পর পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটে যেতে লাগল তাকেই লেখক এক শিথিল পথে ভারতীয় রেনেসাঁস বলেছেন। তবে এই রেনেসাঁস ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে সক্রিয়তর ও বেগবান করে তোলবার জন্য, শ্রমিক কৃষক-সর্বহারা কবে যোগদান করবে সে জন্য মধ্যবিত্তদের অপেক্ষা করবার দরকার নেই। এইখানে লেখকের এ বিষয়ের চিন্তাটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। একটি দেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পেছনে সেই দেশের লোকজীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, হয়তো এরাই বা এদের একটা অংশ 'শ্রমিক কৃষক সর্বহারা', কিন্তু 'শ্রমিক কৃষক-সর্বহারা' এবং লোকগোষ্ঠীর লোকজীবন, সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে একটি মাত্রা ও প্রকারগত ভেদকে যদি স্বীকার করা যায়, তবে কিন্তু এ দুটি ধারার অভিজ্ঞতাও সংশয়জনক। সে সংশয়াপন্ন প্রশ্নকে আপাতত দূরে ঠেলে দিয়ে লেখকের মতানুযায়ী, শ্রমিক কৃষক সর্বহারার দল সংস্কৃতির শ্রীক্ষেত্রের রথের রাশি টানতে আপাতত অসমর্থ হয় (তাদের গুরুত্ব লেখক স্বীকার করেছেন) তবে যেন এই সংস্কৃতির বিবর্তনের চাকা ঘোরাতে শুরু করে দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই দেখা গেছে, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষই বিপ্লব বিবর্তনের মূলে বর্তমান। লেখক ইতিহাসের সে সত্য জানেন বলেই, শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারার দল এখনো প্রস্তুত না হয়ে উঠতে পারলেও মধ্যবিত্তদেরই এ বিষয়ে সক্রিয় হতে পরামর্শ দিয়েছেন।

এই প্রবন্ধের সমগ্র বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয়েছে প্রথমত ইতিহাসের পটভূমিকায় এবং দ্বিতীয়ত, তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে। ইতিহাস এবং তুলনামূলকতা— দুইই ভারতবর্ষ এবং ইউরোপকে ভিত্তি করে। লেখ যে ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তা তাঁর আলোচনার মধ্যেই প্রকাশিত। তাঁর বিজ্ঞানী এবং রসিক মন— দুই দেশের সংস্কৃতির ধারার মধ্যে আবিষ্কার করেছে সাদৃশ্যমূলকতা। এই গুলির আবিষ্কার এবং প্রয়োগের মধ্যেই ধরা পড়েছে তাঁর রসবোধ, প্রজ্ঞা ও মনীষা। সংস্কৃতির রূপান্তর সাধনের ক্ষেত্রেও তিনি দুটি বিপরীত ধারার সন্ধান পেয়েছেন। একটি অততীধারা, অপরটি ভবিষ্যৎ ধারা। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক— ভারতবাসীর জীবনের এই তিন পর্বের ধারা যেন অতীত ধারা, ইতিহাসের আলোকে সে ধারার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতের আগামী ধারাটি ঘটবে— মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রয়াসে ; শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারার দল যদি এ বিষয়ে এগিয়ে আসে, তথাপি ভবিষ্যতের রূপান্তর সাধনের জন্য তাদেরই সক্রিয় হতে হবে।

৭৬.৮ অনুশীলনী-১

ক. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

(১) সংস্কৃতির রূপান্তর কিভাবে ঘটে?

(২) 'সংস্কৃতি'র ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

(৩) ভারতীয় 'সংস্কৃতি'র বিশেষত্ব কী?

(৪) ভারতীয় 'সংস্কৃতি'র রূপান্তর ঘটাতে হবে কীভাবে?

(৫) উৎকল ভাষায় এবং বঙ্গভাষায় অন্নদাশঙ্করের ছদ্মনাম কী?

(৬) অন্নদাশঙ্করের আত্মজীবনী ও স্মৃতিমূলক রচনাগুলির উল্লেখ করুন।

(৭) তাঁর ভ্রমণ ও প্রবন্ধ পুস্তকের সংখ্যা কত?

(৮) 'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি কয় খণ্ডে সম্পূর্ণ?

(৯) সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর গ্রন্থগুলির নাম বলুন।

(১০) তাঁর প্রথম ভ্রমণ বিষয়ক রচনাটির নাম উল্লেখ করুন।

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ আলোচনা করুন।

(১) প্রবন্ধকার হিসাবে অন্নদাশঙ্করের পরিচয় দিন।

(২) তাঁর পত্র-প্রবন্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র-প্রবন্ধের তুলনা করুন।

(৩) ভারতবাসীর জীবনে রেনেসাঁস কোন্ পথে এসেছে বলে লেখক মনে করেন? ভারতবাসীর জীবনে এর ফলাফল কী?

(৪) সংস্কৃতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভাষার (আলোচ্য ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষার) ভূমিকা কতোখানি?

(৫) ইউরোপ ও ভারতবর্ষের সাংকৃতিক জীবনের সাদৃশ্যমূলক দিক, লেখকের মতে, কী কী?

(৬) পত্র-প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে অন্নদাশঙ্করের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৭৬.৯ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

ভারতের সংস্কৃতি যেমন ভারতের বাইরে গেছে তেমনি বিদেশের সংস্কৃতিও ভারতের বাইরে এসেছে। এমনি একটা আদানপ্রদান চলে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। মাটির তলায় পাওয়া যাচ্ছে কোথাও মিশরের কোথাও রোমের মুদ্রা বা কারুকার্য। সমুদ্রপথে বাণিজ্য তো ছিলই, ছিল স্থলপথে বাণিজ্য। ধর্মপ্রচারের জন্যে বৌদ্ধ শ্রমণরা দেশদেশান্তরে যেতেন, এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে সীরিয়া থেকে খ্রীষ্টিয় সাধুরা আসতেন। খ্রীষ্টান এদেশে আছেন প্রথম শতাব্দী থেকেই। তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না। সীরিয়া বলতে প্যালেস্টাইনকেও বোঝাত। খ্রীষ্টধর্ম যেমন পশ্চিমমুখে যেতে যেতে রোমে পৌঁছয় তেমনি পুব মুখে আসতে আসতে দক্ষিণ ভারতে পৌঁছয়। ইসলাম প্রবর্তনের পূর্বেই আরবদের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। আরবদেশীয় বণিকরাই প্রথমে ইসলাম বহন করে আনেন। ভারতীয় মুসলমানদের পূর্বতন পুরুষরা বিজেতা ছিলেন না। বিজয়ের সঙ্গে একপক্ষে গৌরববোধ ও অপরপক্ষে গ্লানিবোধ থাকে। তার থেকে মুক্ত কেরলের মুসলমি জনমানস। তবে মোপলাদের পিতৃকুল আরব বলে তাদের মধ্যে একটা বিদেশি মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। ইসলাম পরবর্তীকালে বিজয়ী আরব, তুর্ক ও মুঘলদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করে। কিন্তু বিজেতারা তাঁদের পিতৃভূমির থেকে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হন। কেউ আর প্রাক্তন মাতৃভাষার

কথা বলেন না। এই দেশের নারীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক পাতিয়ে এদেশের বিভিন্ন ভাষাকেই সন্তানকুলের মাতৃভাষা হতে দেন। পরবর্তীকালে যেসব ইউরোপীয় বণিক ও বিজেতা এদেশে আসেন তাঁদেরও একই পরিণতি হত। যদি না তাঁরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতেন। ভারতের ইতিহাসে এই একটিবারই দেখা গেল যে বিদেশী বণিক ও বিজেতারা স্বদেশে ফিরে গেলেন। আর সবাই এদেশেই বসবাস করে এদেশের মাটিকেই তাঁদের বংশধরদের মাতৃভূমি করেছেন। তা বলে তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় বা সামাজিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেন তা নয়। গ্রীক, শক, কুশান, হুণরা হিন্দু বা বৌদ্ধ ধারায় লীন হয়ে গেছেন, কিন্তু আরব, পারসিক, তুর্ক, মুঘলরা তা হননি। কেউ তাঁদের বাধ্যও করেনি। পরিবর্তনটা হয়েছে ভাষার বেলা, সাহিত্যের বেলা, সঙ্গীতের বেলা, শিল্পীর বেলা। এককথায় সংস্কৃতির বেলা, এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েছে মুসলমানও হিন্দুর কাছ থেকে নিয়েছে। এটা বিশেষ করে লক্ষণীয় হিন্দুস্থানী সংগীতের বেলা। এ রকম তো সব দেশেই ঘটেছে। আমদানি-রপ্তানি যেমন বাণিজ্যের নিয়ম আদান-প্রদানও তেমনি সংস্কৃতিরও নিয়ম। শুচিবাতিকগ্রস্ত যাঁরা তাঁদের অস্তিত্ব জরাগ্রস্ত হয়। বিলোপও ঘটে। যেমন প্রাচীন মিশরের বা প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে চির প্রবহমান তার মূল কারণ ভারতের রীতি বাইরে থেকে অবাধে গ্রহণ ও পরে স্বাঙ্গীকরণ।

সংস্কৃতির স্রোত প্রবাহিত হয় অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে। ধারাভঙ্গ ঘটেছে ইউরোপের ইতিহাসে বার বার। ভারতের ইতিহাসে একবার কি দু'বার। মোহেনজো-দরো আর হরপ্পার সঙ্গে যোগসূত্র যে ছিন্ন হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়, কারণ সংস্কৃত সাহিত্যের উপর তার কোথাও কোনো ছাপ পড়েনি। বেদে নাকি একটা শব্দের মিল পাওয়া গেছে। কিন্তু এই শতাব্দীতেই আমরা প্রথম জানতে পেলুম যে সিন্ধু উপত্যকায় এক বিলুপ্ত সভ্যতা ছিল, যার সম্বন্ধে তিন হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অজ্ঞ। এ যেন আটলান্টা মহাদেশের পুনরুদ্ধার। সেটা এখনো ঘটেনি। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিল এটা স্বতঃপ্রণোদিত।

দ্বিতীয়বার ধারাভঙ্গ ঘটে যখন হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হয়ে যায়, আরবী নাম ধারণ করে, ইসলামের ইতিহাসকেই করে আপনাদের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাসকে কেবলমাত্র হিন্দুর ইতিহাস মনে করে। ভারতের মোট লোকসংখ্যার চারভাগের একভাগ এইভাবে ভারতের অতীতের সগে যোগসূত্র ছিন্ন করে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ইসলামী জাহানের অন্তর্গত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হলেও ইসলামী জাহানেই রয়ে গেছে বাংলাদেশের মুসলিম মানস। প্রাচীন বঙ্গের সঙ্গেও সে আর জোড় মেলাতে পারছে না। পাল যুগের ঐতিহ্যও তার কাছে কেবলমাত্র হিন্দুর। এতে বাংলাদেশের রেনেসাঁস খন্ডিত হবেই। কারণ রেনেসাঁস অতীতকে বাদ দিয়ে নয়। অতীতের সঙ্গে জোড় মিলিয়ে নিয়ে। যেমন ঘটেছে ইউরোপের ইতিহাসে গ্রীক ও রোমান চেতনাকে পুনরুদ্ধার করে তাদের সঙ্গে খ্রীস্টীয় চেতনার মিলন ঘটিয়ে। সে মিলন এখনো অসম্পূর্ণ। ইতিমধ্যে ইউরোপের কমিউনিস্ট লোকমানসে আরও একবার ধারাভঙ্গ ঘটে গেছে। এই নিয়ে চারবার। মার্কসীয় মানস মার্সকপূর্ব অতীতকে সামাজিক অন্যায়ে জর্জরিত অতীতে বলে বর্জন করে। তার মধ্যে যেখানে যেটুকু শ্রেণীযুদ্ধের সহায়ক সেখানে সেইটুকুই তার ঐতিহ্যভুক্ত, আর সব শোষক শ্রেণীর ঐতিহ্য বলে পরিত্যক্ত। ইদানীং কিঞ্চিৎ মতি পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। কারণ কমিউনিস্ট দেশগুলিতে ন্যাশনালিজমও সক্রিয়। রুশ, পোল, পূর্বজার্মান, হাঙ্গেরিয়ান, চীনা, ভিয়েৎনামী, কিউবান, ইথিয়োপীয়ান সবাই কমিউনিস্ট হলেও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র নেশন। তাই স্বকীয় অতীতকে পুরোপুরি বর্জন করতে নারাজ। করলে যে ডালে বসেছে সেই ডাল কাটা হয়। জাতীয় উত্তরাধিকার শ্রমিক কৃষকদেরও অমূল্য ঐশ্বর্য।

ইউরোপীয় শাসকরা এদেশে এসে সাংস্কৃতিক ধারাভঙ্গ ঘটাতে চাননি। ব্রিটিশ শাসনের আশি বছর পর্যন্ত ফারসীই আদালতের ভাষা ছিল। ওঁরা তো সংস্কৃত তথা আবরী ফারসী শিক্ষারই পক্ষপাতী ছিলেন, ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন ওঁদের উদ্যোগে নয়। কলকাতার হিন্দু ও বোম্বাইয়ের পার্শীদের উদ্যোগেই হয়। এঁদের লক্ষ্য অতীতের রোমন্থন নয়, আধুনিকতার

উদ্বোধন। ইংরাজি শিক্ষাই ভারতীয়দের আধুনিক যুগের মানুষ করতে পারত, সংস্কৃত বা আবরী ফারসী নয়। এদেশের মানুষ ব্যাকুল হয়েছিল আধুনিক যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে। কেবলমাত্র জাতীয় অতীতের সঙ্গে নয়। তবে তার মূল্য সম্বন্ধে বোধও ছিল। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যকে, প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিককে মিলিয়ে নিতে হবে এটাই ভারতীয় মনীষীদের সুচিন্তিত আদর্শ হয়। এটাও ইউরোপীয়দের প্রবর্তনায় নয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এঁরা স্বাধীনচেতা পুরুষ। ভারতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্যেই ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন বাঞ্ছনীয় বোধ হয়েছিল। এর নাম দাস মানসিকতা নয়। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে আদান প্রদানের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দাসসৃষ্টির উদ্যোগ ছিল না। সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়েই জাতীয়তাবাদ অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হয়। পরস্পরকে জানবার ও বোঝবার জন্যে এ ছাড়া আর কোনো মিলনপ্রাঙ্গণ ছিল না। স্বাধীন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীরও একই উদ্দেশ্য। সেটিও একটি মিলনসূত্র।

বাইরের সঙ্গে আদান প্রদান চলে। কিন্তু অতীতের সঙ্গে কেবলমাত্র আদান। পশ্চিমের সঙ্গে লোকসানের কারবার হলেও সেটা একটা কারবার। তাতে বিনিময়ের সুযোগ আছে। কিন্তু অতীতের কাছ থেকে আমরা কেবল নিতেই পারি, তাতে কিছু দিতে পারিনে। তার ভান্ডারও একদিন নিঃশেষিত হতে পারে, যেমন কয়লার বা পেট্রোলিয়মের খনি। অতীত থেকে আমদানি করতে করতে সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমে অতীতেরই প্রতিধ্বনিত পর্যবসিত হয়। তার নতুন কিছু নেবারও থাকে না, দেবারও থাকে না। একই অবস্থা হয়েছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেরও। একই বিষয় নিয়ে শত শত রচনা। পুনরাবৃত্তি। রোমন্থন। তোমার অতীত যতই মহিমাময় হোক না কেন তুমি তো সে মহিমার সঙ্গে মহিমা যোগ করতে পারছ না। কেবল সঞ্চয় ভাঙিয়ে খাচ্ছ। এমনি এক সন্ধিক্ষণে বাইরে থেকে আবরী ফারসী সাহিত্য ও তার মারফৎ প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা। হিন্দুরাও এসব চর্চা করে, ফারসী লেখকদের মধ্যে বাঙালি হিন্দুও ছিলেন, উর্দু লেখকদের মধ্যে বিস্তর হিন্দু ও শিখ। রামমোহনের প্রথম বইখানা আরবীতে বা ফারসীতে লেখা। তিনি তো একটা ফারসী পত্রিকাও চালাতেন। সংস্কৃতের বেলায় যেমন পুনরাবৃত্তি ও রোমন্থন আবরী ফারসীর বেলায়ও তাই ঘটে। একই বিষয়ে শত শত গ্রন্থ। যে দুই দেশ থেকে আদান সেই দুই দেশেও চর্বিত চর্বণ চলছিল। তারাও অতীতসর্বস্ব। অনুরূপ এক সন্ধিক্ষণে ইংরেজি সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আবির্ভাব। গোড়ার দিকে শুধুমাত্র আদান, শেষের দিকে আদানের বিনিময়ে প্রদান। ইংরেজি সাহিত্যে বাঙালি প্রভৃতিরও কিঞ্চিৎ দান আছে। ইংরেজি কাব্যের সংকলনে তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও দেখা যায়। সেই সূত্রে এঁরাও সম্মানের আসন লাভ করেছেন। অরবিন্দের 'সাবিত্রী'ও একটি মহৎ দান।

বাইরের সঙ্গে আদান প্রদান অফুরন্ত, কিন্তু অতীতের থেকে আদান ফুরন্ত। তাই রামায়ণ মহাভারত বা বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বন করে আর কোনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। মেঘদূতের অনুবাদ কে না করছেন, কিন্তু আর একখানা মেঘদূত কোথায়? অতীতের থেকে নতুন কোনো প্রেরণা মিলবে না, মিলতে পারে জনজীবনের থেকে। লোকসংস্কৃতি এমন এক ভান্ডার যা এখনো নিঃশেষিত হয়নি, কখনো নিঃশেষিত হবে না। গানে গাথায় কাহিনীতে কিংবদন্তীতে ছড়ায় ধাঁধায় প্রবাদে বচনে যাত্রায় সং তামাশায় লোকসংস্কৃতির নিত্য প্রবহমান ধারা ভারতের তথা বাংলাদেশের তথা পাকিস্তানের একটি মহামূল্য ঐশ্বর্য। এই খনি থেকে মণি তুলে আনলে বিদগ্ধ মহলের উচ্চস্তরের সংস্কৃতিও নতুন প্রাণ পেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের লোকসংস্কৃতির দিকে সারস্বত মণ্ডলীর দৃষ্টি যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের দিকে নজর দেন। বাউলগীতিকে যদি লোকসংস্কৃতির পর্যায়ে ফেলি তবে বাউলগীতির প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অভূতপূর্ব গভীরতা ও সিদ্ধি দিয়েছে। কিন্তু লোকগীতির নামে যা চলছে তার বেশির ভাগই তো জাল বা ভেজাল। এর জন্যে যে সাধনার প্রয়োজন তা শহরে বসে শহুরে লোকের মনোরঞ্জনের তাগিদে হয় না। পল্লীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হলে লোকসংস্কৃতির সঙ্গেও জোড় মেলানো যাবে না।

সংস্কৃতির ইতিহাসে এটিও একটি সন্ধিক্ষণ। সাধারণের মনোরঞ্জন আর সাহিত্যের মাধ্যমে বিপ্লব প্রচার এই দুটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম নিয়ে যদি আমরা ব্যাপৃত থাকি তবে আমরা সংস্কৃতির রূপান্তর বা বিকাশ সাধন করতে পারব না। বহুপ্রসবিনী হয়েও আমাদের লেখনী বন্ধ্যা হবে। অন্যান্য দেশেও লক্ষ্য করছি যে শিল্পায়িত নাগরিক সভ্যতা সংস্কৃতির বিস্তারে সফল হলেও তার সৃষ্টির বেলা বহুপ্রসবিনী হয়েও বন্ধ্যা। যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। সোনার জন্যে চাই অন্তহীন অন্বেষণ, অন্তরতম অনুভূতি, প্রকৃতির সঙ্গে সযুজ্য। ফর্ম, টেকনিক ইত্যাদি তার পরের কথা। তারও মূল্য আছে যদিও।

৭৬.১০ সারাংশ

ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করবার পর লেখক তারই পটভূমিকায় ভারতের রেনেসাঁস, তার প্রয়োজনীয়তা এবং পরিমাণ ও রূপান্তর বিবর্তন নিয়ে প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করেছেন। কে বা কারা এই সাংস্কৃতিক রূপান্তর সাধান করবে এবং কোন্ উপায়ে তাও এখানে লেখক আলোচনা করেছেন। এইঅংশে তিনি মোট চারটি প্রসঙ্গের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ঃ ক) অপর দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, সেটিকে আত্মস্থ করে নেওয়া; খ) দেশের ঐতিহ্যের এবং ঐক্যের ধারাভঙ্গ ঘটেছে কিনা, সে ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া; গ) একদিকে অতীতের জাতীয় সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা এবং মূল্যবোধ এবং অপরদিকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ পোষণ ও উদ্যোগ গ্রহণ; ঘ) সংস্কৃত-আরবি-ফারসির ভাণ্ডার আজ নিঃশেষিত, কাজেই এগুলির সঙ্গে কেবল আজ 'আদান' চলতে পারে, 'প্রদান' নয়। নবজাগ্রত ভারতবাসীকে তা প্রাণ ও প্রেরণা দিতে পারবে না। স্বদেশের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার এখনও অফুরন্ত, তার মধ্যেই আছে প্রবহমানতার প্রাণ-ধারা, তাকেই এক্ষেত্রে গ্রহণ করে সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটাতে হবে।

সংস্কৃতির একটি প্রদান দিক হল,—অপর এবং বাইরের নানা দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়, দেওয়া-নেওয়া,তাকেই বলে, সংস্কৃতির 'আদন-প্রদান' কেবলই নিছক দেওয়া-নেওয়া নয়। অপর এবং বাইরের সংস্কৃতির 'সঙ্গীকরণ'ও চাই। 'স্বাঙ্গীকরণ' মানে নিজের আত্মার অঙ্গীভূত করে নেওয়া। স্বাঙ্গীকরণের মধ্যেই জাতির প্রয়াস, প্রতিভা, সতেচতনতা-সক্রিয়াতা, সৃষ্টি ক্ষমতার দিকটি আছে। স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়ে বাইরের সংস্কৃতির ভাবনাগুলিকে আত্মস্থ করে নিজের মধ্যে তা ধারণ করা। তার ফলাফলকে নতুন দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করা।

একটি জাতির মধ্যে থাকে তার নিজস্ব ঐতিহ্যের একটি অখণ্ড ধারা। সেই অখণ্ড ধারাটিই তাকে যুগ যুগ ধরে একটি ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে রাখে। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের ধারাভঙ্গ ঘটলে জাতীয় সংহতি যেমন বিঘ্নিত হয়, জাতির অগ্রগতিও তেমনি ব্যহত হয়। লেখক ইউরোপ ও ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের ধারাভঙ্গের ইতিহাসটির উল্লেখ এবং তাঁর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সংস্কৃতি-স্রোতের এই ধারাভঙ্গ-ইউরোপে ঘটেছে চারবার, কিন্তু ভারতে দুবার। প্রথমত, সিন্ধু-সভ্যতা, মোহেনজো-দারো, হরপ্পার সংস্কৃতি-স্রোতের ধারা; এই ধারটি ভারতীয় জীবনে বা সংস্কৃত সাহিত্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। দ্বিতীয়ত, ভারতে আগত মুসলমানগণের মানসিকতা। তাঁরা ইসলাম ও ঔসলামিক সংস্কৃতিকে ভুলে খাঁটি ভারতীয় হয়ে উঠতে পারেন নি। পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণও প্রাচীন বঙ্গের সঙ্গে তাঁদের মানসিক জোড় মেলাতে পারেননি। এর ফলে সংস্কৃতিজাত রেনেসাঁসের ফলাফল খণ্ডিত হতে বাধ্য। আবার যাঁরা মার্ক্সবাদী, তাঁরা মার্ক্স পূর্ব ইতিহাসকে বর্জন করেছেন, যেহেতু ইতিহাসের ওই অংশ শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত নয়। তবে জাতীয়তাবাদের খাতিরে অনেক কমিউনিষ্ট দেশও এখন অতীতকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে। অতীতকে স্বীকার

করা শ্রমিক-কৃষকদের পক্ষেও মঙ্গলজনক। এইভাবে দেশের ঐতিহ্যের অখণ্ড ধারাজাত ঐক্যকে লেখক ইতিহাসের মধ্যে অন্বেষণ করেছেন।

ইংরেজি এবং আধুনিক শিক্ষার ভারতীয়গণ নিজেরাই সচেতন ও উৎসাহী হয়েছেন। ইংরেজ কিন্তু তাদের শাসনের প্রথম আশি বছর ফারসিই বহাল রেখেছিল। ভারতীয় মণীষীবৃন্দই একদিকে প্রাচীন ভারতের জাতীয় সম্পদের প্রতি মূল্যবোধ পোষণ করেছেন, অন্যদিকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছিত বলে মনে করেছেন। সংস্কৃত-আরবি-ফারসি প্রভৃতি ভাষা-সংস্কৃতি কেবলই অতীত-সর্বস্ব। সেগুলির ভাণ্ডারও আজ নিঃশেষিত। কাজেই তাদের সঙ্গে কেবলই আদানকর্ম চলতে পারে, প্রধানকর্ম নয়। কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে আছে আদানের সঙ্গে প্রদানের দিক। এই আাদন-প্রদানের একদিকে আছে ইংরেজি সাহিত্য-সাংস্কৃতিজাত ভারতীয় উচ্চতর সাহিত্য, আর অন্যদিকে আছে স্বদেশের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা। লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত, তা চিরপ্রবহমান ও প্রাণময়, তা সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। মানবতাবাদের দ্বারা চির সঞ্জীবিত। এই দুই দিক এক সঙ্গে যুক্ত হলেই আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসবে বির্তনের নবধারা।

৭৬.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় অংশে লেখকের মূল আলোচ্য ভারতীয় এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতির যে সন্ধিলগ্নটি বর্তমানে উপস্থিত, সেই সন্ধিলগ্নে ভারতীয়-বঙ্গীয় শিল্পী সাহিত্যিকের কর্তব্য কী, তা নির্ণয় করা; এবং সেই কর্তব্য পালনের মধ্যেই ধরা পড়বে, পূর্বাগত সংস্কৃতির ধারাটিকে নবতর খাতে প্রবাহিত করিয়ে রূপান্তরসাধন এবং নবজন্ম প্রদানের দিকটি। শিল্পী লেখকদের সম্মুখে এই যে কর্মের কথা তিনি তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে একটি বড়ো কথা হল, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অখণ্ড ধারা বা 'continuity' কে রক্ষা করা। 'ধারাভঙ্গ' ঘটলেই সংস্কৃতির প্রবহমানতা রুদ্ধ হয়ে পড়বে এবং সেই রুদ্ধস্রোত সংস্কৃতির নতুনতর রূপ আর দেখা দেবে না। ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে লেখক দেখিয়েছেন, ইউরোপের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে চারবার এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অন্তত দুবার এই সাংস্কৃতিক 'ধারাভঙ্গ' ঘটেছে। ফলে ইতিহাসের সেই-সেই ধারাভঙ্গের লগ্নে সংস্কৃতিও স্তিমিত হয়ে এসেছিল। এ বিষয়ে তিনি ভারতীয় মুসলমানগণকে কিছু দোষারোপ করেছেন। তারা যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে বাস করেও ভারতীয় হয়ে উঠতে পারেননি, মানসিক দিক থেকে তাঁরা ইসলামিকই রয়ে গেলেন। ফলে এখানে ঘটল একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাভঙ্গ। সংস্কৃতির প্রাণবন্ততার সবচেয়ে বড়ো দিক 'ঐক্য'। সেই ঐক্যের বোধটি বিনষ্ট হলেই এসে পড়ে সাংস্কৃতিক ধারাভঙ্গের বিপদ।

এ বিষয়ে লেখক একদিকে ইংরেজের প্রশংসা করেছেন, অপরদিকে অগ্রগামী ভারতীয় মনীষীদের চিন্তাশক্তিকে সার্থক বলে চিহ্নিত করেছেন। ইংরেজ এদেশে শাসনব্যবস্থা দৃঢ় করেও ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনে কোন ধারাভঙ্গ ঘটাতে চায়নি; যে উর্দু-ফারসি ভাষা সংস্কৃতি পূর্ব থেকেই ভারতীয় মানসে প্রচলিত ছিল, ইংরেজ তার শাসনকালের প্রথম আশি বছরে সেই ভাষারই ধারা রক্ষা করে এসেছে। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের ঐক্য ও অখণ্ডধারা রক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজের এই ভূমিকা লেখকের কাছে বিশেষ প্রশংসার কারণ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতে যে ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রবর্তনের জন্য যে আগ্রহ দেখা দেয়, তাতে অগ্রণী ভূমিকা নেন বাঙলা এবং মহারাষ্ট্রের দেশ নায়কগণই। তাঁরাই নিজেদের চিন্তাশক্তি ও দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন ও উজ্জীবনের জন্য ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষারই প্রয়োজনীয়তা আছে, মৃত কোনো প্রচলিত ভাষা সংস্কৃতির দ্বারা নয়। এই জন্যই তাঁরা চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সে প্রতিষ্ঠা দাস মনোভাবসূচক নয়—তা সাংস্কৃতিক জগতের দিগন্তকে প্রসারিত করবার একটি উপায়।

লেখক মনে করেন, ভারতীয় সংস্কৃতিকে নতুন গতিদানের জন্য উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যেরর মেলবন্ধন চাই। অন্যান্য প্রাচীন ভাষা-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে কেবল আহরণ করা চলে, কিন্তু সেই ভাণ্ডারকে নতুনতর সম্পদে বিভূষিত করা যায় না। কিন্তু লোকসাহিত্যের প্রাণময় ভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করা যাবে যেমন, তেমনি একদিকে উচ্চতর সাহিত্য সংস্কৃতি যেমন লাভবান হবে, তেমনি লোক সাহিত্য ও নব নব অর্থমাত্রা লাভ করবে। লেখক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন অষ্টাদশ শতকের ইউরোপ থেকে, ঊনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রপ্রয়াসের কথা বলে। বাউল গান থেকে রবীন্দ্রনাথ এক নব শক্তিকে গ্রহণ করে নিজেরই সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে বাড়িয়েছেন।

তবে লোকসাহিত্য থেকে এই 'আদনে'র দিকটিকে তিনি যতখানি প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁর নিজেরই প্রদত্ত তত্ত্বানুসারে 'প্রদানে'র দিকটির উল্লেখও এখানে প্রত্যাশিত ছিল। 'প্রদান' বলতে লোকসাহিত্যেরই অন্তর্নিহিত অফুরন্ত প্রাণবত্তার নব-নব মাত্রা আবিষ্কার, যার ফলে লোকসাহিত্য, তাঁরই ভাষায় 'মহনীয়' হয়ে উঠবে। এই বিশদ উল্লেখপর্ব এখানে বাঞ্ছনীয় ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধের প্রথম অংশ তিনি সংস্কৃতির রূপান্তর সাধনের কর্মী হিসেবে শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারার কথা উল্লেখ করেছিলেন, দ্বিতীয়ার্ধে তাদের কথা উল্লিখিত হয় নি; বদলে তিনি লোকজীবন ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কথা বলেছেন। এ দুয়ের মধ্যে যোগ আছে আবার এরা অভিন্নও নয়। অনেকেই এ দুয়ের মধ্যে মাত্রা ও প্রকারগত ভেদ স্বীকার করেন। তিনি এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানান নি। অনেকেই মনে করেন, শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারাদের সাহিত্য (Prolctarian literature) এবং লোকসাহিত্য (Folk literature) নামে পরিচিত।

এই প্রবন্ধের অপর উল্লেখযোগ্য দিক— লেখকের ভাষাশৈলী। অন্নদাশঙ্করের ভাষা স্পষ্ট ঋজু,—বাক্য ছোটো ছোটো খুব বেশিঅলঙ্কার ব্যবহারের পক্ষপাতী নন তিনি। তার ভাষার কয়েকটি নিদর্শন এই ঃ

১। নানা ধরনের পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি তাঁর এক বিশেষত্ব। যেমন, ভারতের সংস্কৃতি যতই প্রাচীন হোক না কেন, তার পূর্বেও প্রাচীনতর ছিল। সেই যে প্রাচীনতর সেটা আর্যপূর্ব, বেদপূর্ব, ও বুদ্ধপূর্ব।

২। নিকটেই তো সুমেরীয় সভ্যতা ছিল। আর একটু দূরে চৈনিক। আরো দূরে ছিল মিশরীয়।

৩। যেমন পারস্য সাম্রাজ্যের, গ্রীকবংশী সাম্রাজ্যের, শক সাম্রাজ্যের, কুশান সাম্রাজ্যের, হুন সাম্রাজ্যের (Enumeration) বা গণনার ক্ষেত্রে এই রকম পুরাবৃত্তির প্রয়োগ দেখি।

৪। কখনও এক-একটি পর-পর বাক্য একই ভঙ্গিতে আরম্ভ হয়েছে ঃ ভারতের মানুষ কোনো কালেই অবিমিশ্র আর্য জাতীয় বা আর্যভাষী ছিল না। কোনো কালেই অবিমিশ্র সংস্কৃতভাষী ছিল না। কোনো কালেই অবিমিশ্র বর্ণাশ্রম নামক সমাজব্যবস্থার শাসনাধীন ছিল না। সমদৈর্ঘ্যের পরপর এইরূপ বাক্য স্থাপনকে শৈলীবিজ্ঞানের ভাষায় Isocolon বলা যায়।

৫। একবার মৌর্যযুগে, একবার গুপ্তযুগে, একবার মুঘলযুগে, একবার ব্রিটিশ যুগে।

৬। যতদূর জানা যায় আর্যদের পূর্বেও দ্রাবিড়রা ছিল। ছিল উত্তর ভারতেও। এখানে দুটি বাক্যে 'ছিল' দিয়ে শেষ এবং 'ছিল' দিয়ে শুরু করা হয়েছে। ফলে এক ধরনের ছন্দ তৈরি হয়েছে।

৭। নীচের উদ্ধৃত বাক্যগুলি প্রায় একইভাবে শেষ হয়েছে ঃ রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য লোপ পায়। রাজভাষা সংস্কৃতের জায়গায় ফারসী হয়। সংস্কৃত শিক্ষায় যাদের অধিকার ছিল না তারাও অবাধে ফারসী শিখতে পায়। ফারসী শিখে রাজকর্মে নিযুক্ত হয়। জায়গির ইনাম পায়। রাজা খেতাব পায়।

৮। উত্তরাখণ্ডের কায়স্থরা তো ক্ষত্রিয় বলেই স্বীকৃত হন। অসিজীবী নয়, মসীজীবী ক্ষত্রিয়। এখানে 'অসি'- 'মসী'র মিল লক্ষণীয়।

৯। শ্রীক্ষেত্রে সকলের প্রবেশাধিকার আছে। সংস্কৃতির শ্রীক্ষেত্রে মধ্যবিত্তদেরও।

১০। পরিবর্তনটা হয়েছে ভাষার বেলা, সাহিত্যের বেলা, সঙ্গীতের বেলা, শিল্পের বেলা। এক কথায় সংস্কৃতির বেলা। 'বেলা' (সময় অর্থে) শব্দটির প্রতি লেখকেরঝোঁক লক্ষণীয়। প্রখ্যাত ছড়াতেও 'বেলা' শব্দের প্রয়োগ দেখি।

১১। অপ্রচলিত আরবি শব্দের প্রয়োগ করেন, বক্তব্য বিষয়ের অনুষঙ্গ রক্ষার জন্য ঃ পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হলেও ইসলামী জাহাজেই (= বিশ্বে, পৃথিবীতে) রয়ে গেছে বাংলাদেশের মুসলিম মানস।

১২। এঁদের লক্ষ্য অতীতের রোমন্থন নয়, আধুনিকতার উদ্বোধন। এখানে বাক্যটি Antithesis-এর উদাহরণ।

১৩। Maxim জাতীয় উক্তি ঃ অতীতের কাছ থেকে আমরা কেবল নিতেই পারি, তাকে কিছু দিতে পারি নে।

১৪। বাইরের সঙ্গে আদান প্রদান অফুরন্ত, কিন্তু অতীতের থেকে আদান ফুরন্ত। এখানে 'অফুরন্ত' অতি পরিচিত পদ, কথ্যভাষায় খুবই ব্যবহৃত হয়। তাকেই বিপরীতভাবে প্রয়োগে (ফুরন্ত) একটি নতুনত্ব আছে।

১৫। ঠিক এরই কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ লোকগীতির নামে যা চলছে তার বেশীর ভাগই তো জাল বা ভেজাল।

১৬। বিশেষণের সুপ্রয়োগ ঃ সোনার জন্যে চাই অন্তহীন অন্বেষণ, অন্তরতম অনুভূতি, প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য।

১৭। গদ্যের মধ্যে চলিত বাঙালার ফ্রেজ-ইডিয়মের ব্যবহার যেমন করেছেন, যেমনি শব্দ চয়নেও তিনি উদারপন্থী। কিছু দৃষ্টান্ত ঃ 'ভারতীয় সংস্কৃতির বটবৃক্ষের ঝুরি'। কালা পাহাড়ীতে খ্রীষ্টানরাও কম যায় না। 'সারা ইউরোপকে লালে লাল করবে'। 'ফরাসী জার্মানও হটে যাচ্চে।' 'কোণঠাসা হতে হতে দক্ষিণে ঘাঁটি গাড়ে।' 'এঁরা রাষ্ট্রের মই বেয়ে উপরে ওঠেন।' 'সম্পর্ক পাতানো'। 'ঝগড়াটা প্রধানত লিপি নিয়ে।' 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতেন।' 'জোড় মেলাতে পারছে না'। 'যে ডালে বসেছে সেই ডাল কাটা হয়।' 'যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে।' 'মেলবন্ধন'। 'সঞ্চয় ভাঙিয়ে খাচ্ছ।' 'খনি থেকে মণি তুলে' আনা। 'যা কিছু চক্ চক্ করে করে তাই সোনা নয়।'

৭৬.১২ অনুশীলনী-২

ক. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। আলোচ্য প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশের মূল আলোচ্য কী?

২। সংস্কৃত-আরবি-ফারসি প্রভৃতি ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে কেবলই 'আদান' চলতে পারে, 'প্রদান' চলবে না কেন?

৩। 'স্বাঙ্গীকরণ' কথাটির ব্যাখ্যা করুন।

৪। ইউরোপ এবং ভারতের ইতিহাসে ক'বার সাংস্কৃতিক 'ধারাভঙ্গ' ঘটেছে?

৫। এদেশে ইংরেজি শিক্ষা-সংকঋতির প্রবর্তনে কারা প্রথমে উৎসাহী হন?

৬। ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা প্রবর্তনের পেছনে কোন্ মনোবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল? 'দাস' সুলভ মনোবৃত্তি কী?

৭। ইংরেজি শাসনের প্রথম আশি বছর কোন্ ভাষা চলিত ছিল?

৮। শ্রমিক-সর্বহারাদের সাহিত্যের পারিভাষিক নাম কী?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন।

১। সংস্কৃতির রূপান্তর সাধনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তদের ভূমিকা, এবং লোকসাহিত্যের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

২। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

৩। উদাহরণ দিয়ে অন্নদাশঙ্করের ভাষা-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭৬.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। অন্নদাশঙ্কর রায়—*সংস্কৃতির বিবর্তন।*

২। গোপাল হালদার—*সংস্কৃতির রূপান্তর।*

একক ৭৭ ❑ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ঃ চড়ক—কালীপ্রসন্ন সিংহ

গঠন

৭৭.১ উদ্দেশ্য

৭৭.২ প্রস্তাবনা

৭৭.৩ লেখক পরিচিতি ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ

৭৭.৪ মূলপাঠ—হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা ঃ চড়ক— বিশ্লেষণী পাঠ

৭৭.৫ সারাংশ

৭৭.৬ অনুশীলনী

৭৭.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৭৭.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করে পাঠক ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজজীবন সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল ধারণা করতে পারবেন।
- কালীপ্রসন্ন সিংহের বিশিষ্ট গদ্যশৈলী সম্বন্ধেও পাঠক অবহিত হবেন।
- তৎকালীন জীবনের প্রেক্ষিতে আজকের সমাজজীবন সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক ধারণায় উপনীত হবেন।

৭৭.২ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব হ'ল। প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয়গত অর্থ হ'ল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। সাধারণত প্রবন্ধ সাহিত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তামূলক ও তত্ত্বমূলক গদ্য রচিত হয়।

প্রবন্ধ সাহিত্যের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

১) প্রবন্ধ সাহিত্য গদ্যে লেখা হলেও তা রস সাহিত্য নয়। মানুষের চিন্তা, মনন ও তত্ত্বই এখানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

২) আবেগ ও কল্পনার কোন স্থান প্রবন্ধে নেই।

৩) কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ এখানে লেখকের নিজের ভাবনা চিন্তার কোনো গুরুত্ব নেই।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সাথে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম জড়িয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেরী সাহেবের "দিগদর্শন" পত্রিকাটি প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত সাহিত্যের যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দদান, তাই প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্দেশ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রবন্ধকে দুভাগে বাগ করা হয়— ১) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা গুরু প্রবন্ধ ও ২) মন্ময় বা ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধ।

বস্তুনিষ্ঠ তথা বিষয় গৌরবী প্রবন্ধ যুক্তি তর্ক, তত্ত্ব তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠককে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে প্রয়াসী। ব্যক্তিগত তথা আত্মগৌরবী প্রবন্ধে পাঠকের সঙ্গে প্রাবন্ধিকের গড়ে ওঠে এক নিকট বন্ধুত্বের সম্পর্ক তত্ত্ব, তথ্য জ্ঞান ইত্যাদি এ জাতীয় রচনায় লেখকের হৃদয়ানুভূতির রসে জারিত হয়ে পাঠকের আবেগ ও কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে। ফরাসী প্রাবন্ধিক মঁতায়েন প্রথম এ জাতীয় রচনার সূত্রপাত করেন. রোমান্টিক যুগের ইংরেজ প্রবান্ধিক চার্লস ল্যাম্ব তাঁর 'Essays of Elia'-র প্রবন্ধগুলিতে আত্মপ্রক্ষেপময়, সরসতা ও বিষন্নতার আশ্চর্য মিশ্রণে উজ্জ্বল এক জগৎ নির্মাণ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' বা রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' আত্মগৌরবী প্রবন্ধের স্মরণীয় উদাহরণ।

রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত নিবন্ধ একই গোত্রভুক্ত সাহিত্য, তবে এদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রভেদ টানা যায়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মতো রম্যরচনায় থাকে রমণীয়তা, খেয়ালি কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং তথ্যভাবের পরিবর্তে রচনারস সম্ভোগের আস্বাদ্যমানতা। তবে রম্যরচনাকে ব্যক্তিগ হতেই হবে, এমন নয়, তা বস্তুগত কোনো অবলম্বনকে উপলক্ষ্য করেও রচিত হতে পারে। যে গদ্য রচনায় জীবনের লঘু চপল দিকগুলি নিয়ে উচ্চতর সারস্বত কর্ম সম্পাদিত হয় তাকে রম্য রচনা বলা হয়। চিত্তের ক্ষণ প্রকাশ রুচির উন্নত প্রকাশ, সংযত ভাবাবেগ প্রভৃতি তাই রম্যরচনার অচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। রম্যরচনা প্রসঙ্গে ড. জনসনের বহুল প্রচারিত উক্তি—

".....loose sally of mind which is an irregular undigested picece and not regular or orderly composition."

প্রবন্ধে রচয়িতার মেধা ও বুদ্ধির ছাপ পড়ে, কিন্তু রম্যরচনায় রচয়িতার হৃদয়ের পরিচয় ছড়িয়ে থাকে। গল্প, নাটক বা উপন্যাসের সঙ্গেও রম্যরচনার পার্থক্য আছে; কারণ ঐ সাহিত্য বিভাগুলিতে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী বৃত্ত থাকে, যার থাকে একটি নির্দিষ্ট সূচনা, শীর্ষবিন্দু ও সমাপ্তি; যা রম্যরচনায় থাকেনা। কবিতাও রমণীয়, কিন্তু কবি ও পাঠকের মধ্যে একটি দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক থাকে; যা রম্যরচনায় থাকে না। রম্যরচনায় বক্তা ও শ্রোতা অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু, সেখানে তাই থাকে এক বৈঠকী মেজাজের আড্ডা প্রবণতা। রচয়িতা এখানে পাঠককে তত্ত্ব আর তথ্যের ভণ্ডারে অভিজ্ঞ করতে আসেন না বরং জীবন ও জগতের বৈষম্য বিষয়ে কিছু কটাক্ষপাত করে থাকেন বা কিছু 'বাজে কথা' বলে থাকেন। বন্ধুর সেই উচ্চারণে ধার থাকলেও ভার থাকে না। বাজে খরচের মতো বাজে কথাতেই তিনি সম্পূর্ই ধরা দেন; এখানেই রম্যরচনার আসল ব্যক্তিগত রসের প্রকাশ।

রম্যরচনার কেনো বাঁধাধরা রচনারীতি নেই। জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে তা লেখা হতে পারে। তবে রম্যরচনায় রসিকতার স্থলে স্থূলতা বা ব্যক্তিগত সুরের স্থলে অহমিকা প্রকাশ কাঙ্ক্ষিত নয়। বর্তমান কালের জটিল জীবনে অপসৃয়মান যে অবসরটুকু আমরা পাই তাতে রম্যরচনা পাঠ জনিপ্রিয় হয়ে উঠছে। আর তাই রচয়িতাদের খেয়াল রাখতে হবে কোনো আতিশয্য, পুনরুক্তি, আমিত্ব, স্থূলতা-র প্রকাশএর রসাবেদন সৃষ্টিতে যেন বাধা না আনে। ভঙ্গিসর্বস্ব রম্যরচা লেখকদের সম্পর্কেই বুদ্ধদেব বসু এহন সরস মনত্ব্যটি করেছিলেন— "যাঁদের না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্তি বা কলানৈপুণ্য.... তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্‌ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ভূত হয়ে উঠতে পারতো না, যদি না রম্যরনচা শব্দটির সৃষ্টি হত।"

বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনা ইউরোপীয় প্রভাবজ। ডি কুইসির Confessions of an English Opium Eater-এর অণুপ্রেরণায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা-ই নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও স্থান পাবার যোগ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'তে এর প্রাথমিক উপাদান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের

পর প্রমথ চৌধুরী, সৈয়দ মুজতবা আইল, বুদ্ধদেব বসু, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখেরা বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনার ধারাটিকে পুষ্ট করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু সাবধান বাণীটি মনে রেখেও বলা চলে সাম্প্রতিক বাংলা রম্যরচনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তর অতটা আতঙ্কিত বা নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কারণ বোধহয় এখনো আসেনি।

প্রথম এককটিতে প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এককের মূলপাঠে কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নকশা" গ্রন্থের "চড়ক" প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে ঊনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবন সম্পর্কে একটি বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি এই এককটি পড়লে তৎকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে যেমন ধারণা পাবেন, তেমনি হুতোমের ভাষা সম্পর্কেও ধারণা করতে পারবেন। এর পাশাপাশি এককটিতে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা"-র সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি বিখ্যাত রম্যরচনার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এককটি ভালো করে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে; তাই বুঝতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

৭৭.৩ লেখক পরিচিত ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহ জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মাত্র দু বছর বয়সে তাঁরপিতৃবিয়োগ হলে (নন্দলাল সিংহ) তাঁর প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর অভিভাবক ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হরচন্দ্রের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে বালক কালীপ্রসন্নের শিক্ষালাভ ও প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল। মাত্র তোরো বছর বয়সেই তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র কালীপ্রসন্ন বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্ব না দেখালেও তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে ও পারে স্বাধীনতভাবে তিনি বিশেষ বিদ্যার্জন করেছিলেন। তাঁর সত্যবাদিতা ও আড়ম্বরহীনতা বাল্যজীবনেরই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, রঙ্গামঞ্চ স্থাপন, সংবাদপত্র পরিচালন, সমাজসংস্কার, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি নানা দিক থেকে তাঁর জীবন ছিল কর্মমূখর। বিরপতি হিসেবেও তিনি ছিলেন দক্ষ। সাধ্যের অতিরিক্ত দান ও সদনুষ্ঠানের ব্যয়ে তিনি শেষ জীবনে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মহাভারত অনুবাদ সম্পূর্ণ হওয়ার চার বছর পরে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

৭৭.৪ মূলপাঠ "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা" ঃ চড়ক

কলিকাতায় চড়ক পার্ব্বন

"কহই টুনোয়া————

সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি————————টুনোয়ার টম্বা।

————————

হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে,
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
এ কুৎসিত! কোন লাজে সপত্নী-সমাজে পাঠাইব,

হেরিলে মা এ কুরূপে-দুষিবে জগৎ-হাঁসিবে
সতিনীপোড়া; পমানে উভরায়ে কাঁদিবে
কুমার সে সময় মনে য্যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে।

১২০২ সাল। কলকাতা শহরের চারদিকেই ঢাকের বাদ্দি শুনা যাচ্চে, ও চড়কির পিঠ সড়্ সড়্ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বাঁট প্রস্তুত কচ্চে,—সর্বাঙ্গে গয়না,পায়ের নূপুর, মাথায় জরীর টুপী, কোমোরে চন্দ্রহার আর সেপাইপেড়ে ঢাকই শাড়ী মালকোচা করে পরা, ছোপানে তারকেশ্বরে গামছা হাতে, বিল্বপত্র-বাঁধা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই— "আমাদ্যের বাবুদের বাড়ী গাজন!"

কোম্পানীর বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দুকুমারের ফাঁসী হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিকের দাওয়ান ছিলেন। সেকালে নিম্‌কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকাল প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান— সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড়মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড়মানুষ বলতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে, বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়ীতে ক্রিয়ে-কর্ম্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে। আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আক্ষরী মেহারপোরা লক্ষীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।

এদিকে দুলে, বোয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নুপুর পায়ে, উত্তরী সুতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীর-ব্রতের মহত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের ও ঢোলের সঙ্গাতে নেতে বেড়াচ্ছে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখীর পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙ্গুর বেঁধে পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ী করে তুলেছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে রোদে রোদে বপ্টে রপ্টে বেড়াচ্ছে, কখন বলে 'ভদ্দেশ্বরে শিব মহাদেব" চীৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে। কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে; কখন ঢাকের পেছনটা দুম দুম করে বাজাচ্চে-বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যয়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা-ঝাঁপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কানে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে এক মুঠো বিল্বপত্র নিয়ে খুঁকতে ধুঁকতে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবুকে তারে নমস্কার কল্লেন, মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাসের উপর দিয়ে গিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন, বাবা তটস্থ!

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং করে পাঁচটা বাজলো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আসতে লাগলো। সহরের বাবুরা ফেটিং, লেস্‌ফ ড্রাইভিং বগি ও ব্রাং হ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগান চল্লেন—দুই চারজন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পেছনে মালভার মোদাগাড়ি চল্লো; পাছে লোকে জান্‌তে পারে, এই ভয়ে কেউ সে গাড়ীর সইস-কৌচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন। কেউ কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন, বিবিজনের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ! —কুঠিওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এইদকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তিযোগ হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েছে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটচ্চে, প্রায় আধ ঘন্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে। বাড়ীর ভিতরে খবর গেলো; গিন্নিরা পরস্পর বিষন্ন বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে" বলে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয় মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে, সন্ন্যাসীর দোষেই এইসব হয়" এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে; অবশেষে গুরু পুরুত ও গিন্নীর ঐক্য মতে বাড়ির কর্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচজন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে— "মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে, ফুল ত পড়ে না" সন্ধ্যা হয় বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোষাক পরা, রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান। কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়েকাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌কান পরে, সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেঁতে চল্লো; মোসহেবারা বাবুর সমূহ বিপদ মনে করে বিষণ্ণ বদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগলো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে 'ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" বলে চীৎকার কত্তে লাগলো; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাতপাখা দুপাশে চলতে লাগলো। বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে, আজ বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দু-হাত একত্র ক'রে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো বাবু কাঁদকাঁদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন; পুরোহিত শিবের কাছে 'বাবা ফুল দাও, ফুল দাও', বারংবার বলতে লাগলো, বাবুর কল্যাণে একঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাথায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাথা ঘুরুতে লাগ্‌লো, আধঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাথা থেকে একবোঝা বিল্বপত্র স'রে পড়লো। সকলের আনন্দের সীমা নাই, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠলো "না হবে কেন—কেমন বংশ!"

ঢাকের তাল ফিরে গেল। সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আনলে। গাজোনতলায় বিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হলো; কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে ব'সে গেলে পর পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে—সন্ন্যসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো। উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য"! কাঁটা ফুটলে বলবার যো নাই। এদিকে বাজে দর্শকেগর মধ্যে দু'একজন কুটেল চোরা-গোপ্তা মাচ্চেন। অনেক দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েছেন, মনে কচ্চেন, বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কে জানতে পাল্লে না। ক্রমে সকলে ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো; দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে লাগলেন— "গিন্নীরা বলে দিয়েচেন— "ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুন যে, ধরে রাখলে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁস-ঘন্টার শব্দ থামেলো। সকল পথের সমুদয় আলো জ্বালা হয়েচে। 'বেলফুল', 'বরফ', 'মালাই!' চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েচে, অথচ খদ্দের ফিচ্চে না—ক্রমে অন্ধকার গা-ঢাকা হয়ে এলো; সে সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোটলোক ভদ্দরলোক চেনবার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসর গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় টুঁ মেরে বেড়াচ্চেন। এঁর সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেষা দেখে বাড়ী ফির্‌বেন। মেছোবাজারেরর হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান,

নতুনবাজার, বটতলা, সোনাগাজির গলি ও আহিরীটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখেমাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন, কেউ তারে চিনতে পারবে না। আবা অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে কেশে হেঁচে লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।"

সৌখীন কুঠীওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাশের ঘরের ছোট চীৎকার করে—বিদ্দেসাগরের বর্ণ পরিচয় পড়চে। পীল-ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখ্‌চে, স্যাকরারা দুর্গা প্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ-কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েচে, রোকোড়ের দোকানদার ও পোদ্দার ও সোনার বেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে. শোভাবাজরের রাজাদের ভাঙগা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোণা হিলিশ নিয়ে ক্রেতাদের— "ও গাম্‌চাকাঁধে, ভাল মাছ নিবে"? "ও খেঁরা গুপো মিন্সি, চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেছুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা লাঠি হাতে ক'রে কানা সেজে 'অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ' বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে। এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, "বলে ভদ্দেশ্বর শিবো।" চীৎকার হতে লাগলো, গোল উঠ্‌লো, এবারে ঝুল-সন্ন্যাস। বাড়ীর সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে; বাড়ীর ক্ষুদে ক্ষুদে হুবু হুজুরেরা দারোয়ান চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গানজতলায় ঘুর-ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বেলে ভারার নীচে ধল্লে—একজনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় ধুনো ফেলতে লাগ্‌লো। ক্রমে একে একে অনেকে ঐ রকম ক'রে দুল্লে, ঝুলসন্ন্যাসী সমাপন হলো; আধ ঘন্টার মধ্যে আবার শহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের মত সেতার বাজতে লাগালো, বেলফুল, বরফ ও মালাই যথামত বিক্রী করবার অবসর পেলে; শুক্রবারের রাত্রি এই রকমে কেটে গ্যালো।

আজ নীলের রাত্তির, তাতে আবার শনিবার। শনিবারের রাত্তিরে শহর বড় গুলজার থাকে। পানের খিলির দোকানে বেললণ্ঠন আর দেয়ালগিরি জ্বলচে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলচে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়ীতে খেম্‌টা নাচের তালিম হচ্চে অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন; কেথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা একজন চোর ধরে বেঁদে নে যাচ্চে—তার চারিদিকে চার পাঁচজন হাস্‌চে আর মজা দেখচে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে; তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়বে, তায় ভ্রুক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজনতলায় চিৎপুরের হর; ওদের মাছে সিঙ্গির বাগানের প্যালা; ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালী। আজ সহরের গাজনতালায় ভারী ধূম—চৌমাথার চৌকিদারদের পোহাবারো। মদের দোকান খোল না থাক্‌লেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুন্‌বেন যে— "ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটীটি পাচ্চে না, "পালেদের একধাম পেতলের বাসন গেছে' ও গন্ধবেনেদের সর্বনাশ হয়েছে।" আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়— থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি সন্ন্যাসীরা হর্‌রা ও "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো— বারফটকা বাবুরা ঘরমুখো হচ্চে। উড়ে বামুনেরা ময়দানে ময়দা পিষতে আরম্ভ করেছে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নেই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারান্ডার কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেচে; দু একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ কেউ রব শোনা যাচ্চে; এখনও মহানগর যেন নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য। ক্রমে

দেখুন,—"রামের মা চল্‌তে পারে না," "ওদের ন-বউটা কি বজ্জাত মা" "মাগী যে জক্কী" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে রত দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েচেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের তার নিয়ে চলেছে। পুলিশের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরীবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্ মসই করে থানায় ফিরে যাচ্চেন। সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়া ও টাকায় ট্যাক ও পকেট পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গম্ গম্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দবনি ও ক্যারামত জাহির করবেন-সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব সাদালোক, কোর, কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেন্ড নিয়তই কাচে থাকে, হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান-সুতরাং ইনস্পেকটর মহলে একাদশ বৃহস্পতি।

গুপুস ক'রে তোপ প'ড়ে গ্যালো। কাকগুলো কা কা ক'রে বাসা ছেড়ে ওড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রমাণ ক'রে, দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে, হুঁকার জল ফিরিয়ে তামাক কাবর উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্‌সা হয়ে এলো—মাছের ভারীরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে—মেছুনীরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেছু পেছু দৌড়েচে। বদ্দিবাটির আলু, হাসমানের বেগুন বাজরা আস্‌চে, দিশী বিলিতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ী পাল্কী চ'ড়ে ভিজিটে বেরিয়েছেন। জ্বরবিকার, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি ক'রে নেছেন; কলিকাতা সহরেও দু-চার গো-দাগাকে প্রাকটিস্ কত্তে দেখা যায়, এদের ওষুধ চমৎকার; কেউ-মতন গোরীর নাক ফুড়ে আরাম করেন; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে—সহুরে কবিরাজেরা আবার এঁদের হতে এককাটি সরেশ; সকল রোগেই সদ্য মৃত্যুশর ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য-শ্লোক ও কর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন।

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরা কাপড় বগলে ক'রে স্নান কত্তে চলেচে, আজ বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ী সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্নিংওয়ার্কে বেরিয়েছেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিকস, একসচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায়—হয়েছে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ দেখা না হলে গ্রাহকেরা পান না-ইংরাজী কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাস্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেক্‌সন লেখা কেরাণীর মত কলুর ঘানির বলদ বদলী হলো, পাগড়ী বাঁধা প্রথম ইনষ্টলমেন্টে-শিপ সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্ণমেন্টের অফস বন্ধ, সুতরাং আমরা ক্লার্ক কেরাণী, বুক্‌কিপার ও হেড রাইটারদিগকে দেখতে পেতাম না। আজকাল ইংরাজী লেখাপড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে অফিসে যান—পাগ্‌ড়ী প্রায় উঠে গ্যাল-দুই একজন সেকেলে কেরাণীই চিরপরিচিত পাগড়ীর মান রেকেচেন; তাঁরা পেন্সন নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগ্‌ড়ী দেখতে পাব না; পাগ্‌ড়ী মাথায় দিলে আলবার্ট ফেশনের বাঁকা সিঁথেটি ঢাকা পড়ে, এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ী প্রায় থাকে না থকে হয়েচে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েছে? হাতে কাজ কিছু নাই, অথচ যে রকম হক না চোটাখোর বেণের ঘরে ও টাকাওয়ালা, বাবুদের বাড়ীতে একবার যেতেই হবে। "কার বাড়ী বিক্রী হবে," কার বাগানের দরকার, "কে টাকা ধার করবে," তারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহুরে বাবু দালাল চাকর থাকেন; দালালেরা শিকার ধ'রে আনে—বাবুরা আড়ে গেলেন।

দালালী কাজটা ভাল "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়ী-ঘোড়ায় চ'ড়ে দালালী কত্তে দেখা যায়। অনেকে "রেস্তহন মুচ্ছুদী" চারবার "ইন্সালভেন্ট" নিয়ে এখন দালালী অনেক

পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন এঁরা বর্ণচোরা আঁক এঁদের চেনা ভার, না পারেন, হেন কর্ম্মই পসাদার চেটাখোর বেণে ও ব্যাভার-বেণে বড়মানুষের ছলনারূপ-জাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বসের কলসী ধরে গা ভাসান সাড়া দেন, সুতরাং মনের মত কোটাল হলেঁ চুনোপুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেল। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি;সুতা, শোনা, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফউঁড়ে একেবারে মোরিয়া হয়ে নাচতে নাচতে কালীঘাট থেকে আসচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ, সুখের দলের পাঁচালী ও হাপ আখড়াইয়ের দোহার, গুলগার্জেনের মেম্বরই অধিক—এঁরা গাজন দেখবার জন্যে ভোরের বেলা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড়মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্ছে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেটে করেন; কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও— "সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা। কি করেন, বড়দাদা সেজোপিসে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনও কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেক চড়ক, বাণ ফোঁড়া তলোয়ার ফোঁড়া, দেখতে ভালোবাসেন। প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পোঁত্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্সে হয়েও হীরেবসান টুপী, বুকে জরীর কারচোপের কর্ম্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তরা মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটী পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর—ভাগ্নের চুল পেকে গেচে।

অনেক পাড়াগাঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ ক'রে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মেৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হ'লে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়া-গাঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোনা গালত, এখন লোনা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিস লেগে থাকে— অনেকে তার দরুণ একেবারে আঁতকে পড়েন; ঘাগিগোচের পাল্লায় পড়ে শেষে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ী যেতে হয়। পাড়াগাঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এইখানেই কাটান; দুপুরবেলা ফেটিং গাড়ী চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ-বারো মোসাহেব সঙ্গে বাঈজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা; দেখলেই চেনা যায় ইনি একজন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্ত্তিমান্ মা! বিসর্জ্জন, বারেইয়ারি, খ্যাম্‌টা-নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত। মধ্যে মধ্যে খুনী মামলায় গ্রেপ্তারী ও মহজনের ডিক্রীর দরুণ গা-ঢাকা দেন। রবিবার, পাল-পার্ব্বণ, বিস্‌র্জ্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ী চলে বেড়ান।

পাড়াগাঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ দুই-একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছিতে বাসা ক'রেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না। তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বেড়স্যা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে চব্বিশ ঘণ্টা সোনাগাছিতেই কাটান। লোকের বাড়ী চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধ'রে যুগলবেশে জ্যাটা, খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয়— পেড়াপীড়ি হলে দেশে স'রে পড়েন—সেথায় রামরাজ্য!

জাহাজ থেকে নুতন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে, সেই রকম পাড়াগাঁয়ে বড়মানুষ সহরে এলেই দালাল পেস হন। দালাল বাবুর সদর মোক্তারে অনুগ্রহে বাড়ী ভাড়া করা, খ্যামটা-নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটীকেল এজেন্টের কাজ করেন। বাবুকে সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম-বালির ব্রিজ, বাগবাজারের খালের কলের দরজা— রকমওয়ারি বাবুর সাজানো বৈঠকখানা ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ী দেখিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদ যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টি কর্ম্মে মক্‌রর হয়.

আজকাল সহরে ইংরেজী কেতার বাবুরা দু'টি দল হয়েছেন; প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্টদ্বিতীয় "ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ"; প্রথম দলের সকলি ইংরাজী কেতা, টেবিল-চেয়ারের মজলিস, পোয়ালা করা চা, চুরোট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রান্ডি ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া, হরকরা ইংলিশম্যান ও ফিনিক্‌স সামনে থাকে, পলিটিক্‌স ও 'বেষ্ট নিউস অবদি ডে' নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁছেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, কেবল সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবার হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওল্ডা ক্লাস।

দ্বিতীয়ের মধ্যে-বাগম্বর মিত্র প্রভৃতি সাপ হতেও ভয়ানক বাঘের চেয়ে হিংস্র বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ স্বার্থ-সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "কেমন ক'রে আপনি বড়লোক হব," "কেমন ক'রে সকলে পায়ের নীচে থাকবে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁফে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূর পরিহার—চার আনারক বেশী দান নাই।

সকালবেলা সহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ীর হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন-চারিটি "ইকুটি", দুটি "কমন লা" আদালতে ঝুল্‌চে। কোথাও পাওনাদার বিল-সরকার উটনোওয়ালা মহাজন খাতা বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন-চার মাস হাঁট্‌চে, দেওানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। "শমন', 'ওয়ারিন', 'উকিলের চিঠি' ও সফিনে' বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছল না মনে করে অন্তর্দ্দাহ হচ্চে। "য়্যায়সা দিন নেহি রহেগা" অঙ্কিত আংটী আঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি-লাভ করতে পাচ্চেন না।

কোথাও একজন বড়মানুষের ছেলে অল্পবয়সে বিষয় পেয়ে, কান্নেখেকো ঘুড়ীর মত ঘুরচেন। পরশুদিন "বউ বউ", "লুকোচুরি", "ঘোড়াঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দেওয়ানজীর কুটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকীলের বাড়ীর বাবুর পাকা চালে নজর রেখে স'রে বসতে হবে, নইলে ওঠসার কিস্তিতেই মাত। ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার; — কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু", কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজোপিসের মামার খুড়োর পিসতুতো ভেয়ের মামাতো ভাই" পরিচয় দিয়ে পেশ হচ্চেন, 'উমেদার", কন্যাদয় (হয়ত কন্যাদায়ের বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুটেছেন, আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবা রয়েছে, সময়ে আমলে আস্‌বে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েছে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে ভরে গেছে। নানা রকম বেশ— কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগ্‌লেস আঁটা শাইনিং লেদর; কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ডচেন গলায়; আলবার্ট ফেশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই ঃ রাস্তার দু-পাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয় দাঁড়িয়েছেন, ছোট আদালতের উকীল সেক্‌সন রাইটার, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে তেলী, ঢাকাই কামার আর ফরারে যজমেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিনটে ছেলে।

কোথাও পাদ্‌রী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—সূর্ব্বন চৌকীদারের মত পোষাক— পেনটুলেন, ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী সুরে হাত-মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয়ে যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুঠে পাঠশানের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা এক মনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বল্‌চেন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না। পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে ঝগড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হতো; কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যঘাত হয়েছে আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়।

চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে সাদা হয়— ধুলোয় ধুলো; তার মধ্যে চাকের—গাজন বেরিয়েছে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁধে কাঁধে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ী বাজাতে-বাজাতে চলেছে— তার পেচোনে এলোমেলো নিশানের শ্রেণি। মধ্যে হাড়ীরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গতে "ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা", ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তক্‌মাওয়ালা দরোয়ান, হুর্‌করা সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপী মাথায়, শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচতে নাচতে চলছে। পাশে বেণোরা জিভে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেছে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়িমাছ বাঁধা। সেট্‌কে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক করে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগ্নে ছোট ভাই—পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ী চ'ড়ে চলেছেন—তাঁরা রাত্রি তিনটার সময় উঠেছেন, টাক লাল টকটক্ কচ্চে মাথা ভবানীপুরে, কালীঘেটে ধুলোয় ভ'রে রয়েছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখচেন, মধ্যে মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেঁপচ্ছে হুড়মুড় করে কেউ দোকালে কেউ খানার উপর পোড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুমত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে, অমনি মার্শাল ল জারি হলো, "ঢাক বাজালে থানায় ধ'রে নিয়ে যাবে।" ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রেই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেক ঢাক ঘাড়ে ক'রে চুপে চুপে বাড়ী এলেন— দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্বকালের এক বৎসর গেল দেখে যুবকযুবতীরা বিষন্ন হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দিষ্টকালের এক বৎসর কেটে গেল। দেখে আহ্লাদের চারিসীমা রহিল না। আজ বুড়োটি বিদয় নিলে—যুবটি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা— কষ্ট ভোগ করেছি, যেসব ক্ষতি স্বীকার করেচি— আগামীর মুখ চেয়ে,—আশার মন্ত্রণায়, আমরা সেসব মন থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূতকাল—আমাদের ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল-মাস্টারেরর মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মত!—পুরাণ হাকিম বদলী হ'লে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুকপুক্ করে স্কুলে নতুন ক্লাসে উঠলে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে—মুড়শ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে ছেলে, হ'লে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাঁড়াইয়া পান দিয়ে বরণ ক'রে ন্যান—নেশার খেঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙালীরা বছরটি ভাল করমেই যাক্ আর খারাপেই শেষ, হোক্, সজনেখাঁড়া চিবিয়ে, ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে, পুরাণকে বিদায় দেন। কেবল কল্‌সী উচ্চুগন্ডকর্ত্তারা আর নতুন খাতাওলারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন— আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্চুগন্ড করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালীপুজো করেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ী শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়ীতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত ক'রে মড়াকান্না কাঁদ্‌তে হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ যে, বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না— আড্ডা থেকে না ডাকলে শুন্‌তে পাবেন না? ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে, মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ প'ড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানারকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েছেন; কেউ কাঁসারীদের সংয়ের মত পাল্কীগাড়ীর ছাদের উপর ব'সে চলেচেন। ছোটলোক, বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই— বামুন-কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরে নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়েরাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন; ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দু-খানি চাপাটি ও একটু ন্যাব্‌ড়ানের বদলে ফাউলকারী ও রোল রুটি ইন্ট্রডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা, মেয়েদের বা নাক বেঁধান চলিত হলো দে'খে বোতলের দেকান, কড়িগণা, মাকু, ঠেলা ও ভালুকের লোমব্যাচা কোলকেতায় থকতে লজ্জিত হতে লাগলো। সবকামান চৈতনফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলে কাঁধে ক'রে টেনা ধুতি প'রে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না; সুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বগী ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু-একজন ভদ্রলোক মোসাহেব, তকমা-আরদালী ও হরকরা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে কৌশলে বেণেত বেসাতে টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোটলোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুনওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন—প্রায় অনেকেরই এক-একটি পাশবালিশ আচে—"যে আজ্ঞে" ও "হুজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক" বলবার জন্য দুই-এক গণ্ডমুর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভকর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা। কিন্তু প্রতিবৎসরের গার্ডেন ফিষ্টের খরচে— চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শীগ্‌গির ফুরায় না, বারোইয়ারি পূজার প্রতিমা-পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসি, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সেসব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাটকা চড়ক টাটকা-টাটকাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের বারঘুরী টিনের মুহুরী দেওয়া তল্‌তাবাঁশের বাঁশী, হলদে রং-করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তইরি গুড়িয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির-করা হাঁড়ি বিক্রী কত্তে বসেচে। "ড্যানাক্, ড্যানাক্, ড্যাডাং ডাং চিংড়িমাছের দুটো ঠ্যাং' ঢাকের বোল বাজচে। গোলাপী খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে। একজন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচতে নাচতে এসেন চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে মেয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে নেড়ে ঘুরতে লাগলো। কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ, কারু সর্বনাশ, কারু পৌষমাস। একজনের পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখচেন।

পাঠক! চড়কের যথাকিঞ্চিৎ নকসার সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্সাইড জানলে ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েচে "সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি।"

বিশ্লেষণী পাঠ ঃ

বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে বিচরণ করলেও 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'র জন্যই কালীপ্রসন্ন সিংহ সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বইটির প্রথম ভাগ ১৮৬২ খ্রীঃ ও প্রথম দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ড 'চড়ক' এর আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ ঃ

[হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্‌শা। চড়ক। প্রথম খণ্ড। আশমান। রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুঁকোরাম বসুর ইস্ট্রীট। মূল পয়সার দুখানা।]

প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভে মধুসূদনের এই কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হয়েছিল—

[হে শারদে! কোনই দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে? কোনই অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?]

কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এই কবিতার পরিবর্তে একটি টপ্পা গানের দুটি পংক্তি উদ্ধৃত হয়—

"কহই টুনোয়া

সহর সিখাওয়ে কেতোয়ালী।"

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটি শাখা ছিল সমকালীন সমাজ সমস্যা ও সামাজিক বিকৃতি অবলম্বনে ব্যঙ্গমূলক নক্‌শা। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে' এই ধারার সূত্রপাত এবং পরবর্তীকালে এই ধারায় পাওয়া গেছে, ভাবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)। লক্ষণীয় কালীপ্রসন্নই কেবল গ্রন্থনামে প্রথম সচেতন ভাবে 'নকশা' কথাটি ব্যবহার করেছেন ও ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর ব্যঙ্গরচনাকে প্রকৃত নকশাধর্মী করেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে প্রকাশিত ব্যঙ্গরচনাগুলির মধ্যে 'কলিকাতা কমলালয়' ছাড়া সবগুলিতেই সুনির্দিষ্ট কাহিনী আছে এবং নকশাধর্মিতার চেয়ে উপাখ্যান ধর্মিতাই প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই কালীপ্রসন্ন নতুন আঙ্গিক প্রবর্তনের দাবী করে লিখেছেন—"...আমরাও এই নক্‌শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নূতন বলে দাঁড়ালেম...।

'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'য় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার সমাজজীবনকে রঙ্গে ব্যঙ্গে, চিত্রণ নৈপুণ্যে ও বাস্তবতায় তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্রূপের চাবুক দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের সকল কুপ্রথা, কুরীতি, দুর্নীতি ও হীনতার উপর আঘাত হেনেছিলেন। ভবাণীচরণ, প্যাঁরীচাঁদ, রামনারায়ণ বা মধুসুদনের সমাজের প্রতি ব্যঙ্গাবিদ্রূপ এমন ব্যাপক ও সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চরণশীল হতে পারেনি। হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া অবতার, মোসাহেব পরিবৃত-জমিদার, মতালা, উমেদার, ব্রাহ্ম, পাদরী, ইয়ংবেঙ্গাল বাবু, বৈষ্ণববাবাজী, ভিখারী, কেরানী, দোকানী, ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক, চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, কলকাতার পথ, যাত্রা, কবি, হাফ আখড়াইয়ের আসর, শ্যাম্পেনের মজলিস, গঙ্গায় নৌকাবিলাস, নগরের বারবিলাসিনী—লেখকের দৃষ্টি সর্বত্র পতিত হয়েছে। তৎকালীন কলকাতার সমাজজীবন যেন ফোটোগ্রাফিক বাস্তবতায় এখানে বিধৃত হয়েছে। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের পরস্পর বিরোধী আঘাতে সেদিনকার সমাজ হয়েছিল তরাঙ্গিত, আর সেই তরঙ্গের তলায় তলায় ছিল যাবতীয় কপটতা ও ভণ্ডামী— যা হুতোমের বিদ্রূপের কশাঘাতে হয়েছিল জর্জরিত। তিনি বিশেষ কোনো গল্পে আবদ্ধ না থেকে সমাজের যেখানেই অসঙ্গাতি বা বিকৃতি দেখেছেন, সেখানেই রঙ্গাব্যঙ্গামুখর ছবি এঁকেছেন। এখানে লেখক সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে সমাজচেতনা ও সমাজচিত্রের বিচিত্র প্রদর্শনী করেছেন। একথা স্বীকার করেই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বাঙ্গালাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে হুতোম প্যাঁচার ন্যায় লেখকের প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক। পুরানো দিনের কলকাতার ছবি তুলে ধরা এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক রসটুকু 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা'র স্থায়ী মূল্য।

তবে ঐতিহাসিক রস ছাড়াও এর হাস্যরস গ্রন্থটির স্থায়ীমূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই লেখক 'স্বভাবের সুনির্মল পটে'ই শুধু চিত্রাঙ্কন করেননি, তাকে রহস্যের রঙ্গেও রাঙিয়ে তুলেছেন। তাঁর সামাজিক বিকৃতি ও দূষিত ক্ষত সংশোধনের মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও তিনি নীতির বেত্রদণ্ড হাতে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত থাকলেও আজ তা সাময়িকতার সীমা পেরিয়ে এসেছে বলেই হাস্যরসটুকুই এখন প্রধান উপভোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ব্যক্তিরা প্রায়শঃই তাদের ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে শ্রেণী চরিত্রে প্রতীক হয়ে উঠেছেন। এই কৌশল কালীপ্রসন্নই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। হয়তো তিনি পূর্ববর্তী প্যারীচাঁদ-ভবানীচরণদের সঙ্গে সুইফ্‌ট, ডিকেন্স, এইডসনের ব্যঙ্গ সাহিত্যের সমন্বয়ে এই কৌশল করায়ত্ব করেছিলেন। এভাবেই তিনি মধ্যযুগীয় অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামির পর্দা থেকে উন্নীত করেছিলেন তাঁর নক্‌শাকে। তাঁর নকশায় কিছু হিউমার ও ফান থাকলেও উইট ও স্যাটায়ারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন কপট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হাস্যকর অসঙ্গাতি বা বিকৃতি হুতোমের সচেতন মনের শ্রেষ্ঠত্ববোধ নিয়ন্ত্রিত অব্যর্থ ব্যঙ্গাবিদ্রূপের আঘাতে ক্ষতবিক্ষথ হয়েছে। তাঁর হাসি "প্রস্ফুটিত রক্ত গোলাপের জ্বলন্ত বুদবুদের মতো, কঠিন বৃন্তে বিধৃত এবং তীক্ষ্ণ কাঁটায় সুরক্ষিত (বাঙলা সাহিত্যের নরনারী-প্রমথনাথ বিশী)"। তিনি শুধু হাসির আঘাতে অপরকে বিব্রত করেন নি, নিজেকেও অনেক সময়ে সেই ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত করেছেন। স্যাটায়ারের সঙ্গে ফান মিশিয়ে হজরতকে লণ্ডনে পাঠিয়ে এবং কালী ও কেষ্টর মধ্যে কে বড় ময়ূরের লেজ ধরে তার হিসাব করে হুতোম এবং বিচিত্র হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। হুতোমের নক্‌শায় হিউমার কম থাকলেও তা যে একেবারে নেই তা নয়।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল এর ভাষা। কালীপ্রসন্ন এবং প্যারীচাঁদ সংস্কৃত বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। প্যারীচাঁদ অবশ্য সাধু গদ্যরীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ চলিতরীতি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর নক্‌শার শব্দ ব্যবহারে, ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের চলিতরূপ প্রয়োগে, বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে, বানান পদ্ধতিতে চলিত ভাষা তার স্বকীয় স্বভাবের পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পেরেছিল। হুতোমী ভাষায় বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—

১। কলকাতার চলতি মুখের বুলি (কুক্‌নি) (তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী বিদেশী শব্দ) এবং বাংলার নিজস্ব প্রবাদ-প্রবচনের প্রাধান্য।

২। শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও সর্বনাম পদের চলিতরূপের ব্যবহার।

৩। শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার।

৪। চলিত রীতির আধারে ভাষার স্বচ্ছতা ও সংক্ষিপ্তি।

৫। বর্ণনায় বিষয়ের নিপুণ চিত্রধর্মিতা।

৬। বাক্যগঠনরীতি কথনভঙ্গিমায় স্বচ্ছন্দ এবং প্রাণের প্রবাহে গতিময় ও চঞ্চল।

কি শাণিত ব্যঙ্গারচনায়, কি কৌতুক তরল পরিহাস রসিকতায় এবং গভীর বিষয়ের উপস্থাপনায় হুতোমী ভাষার আশ্চর্য সাবলীলতা ও সজীবতা দেখে এ ভাষাকে বিদ্যাসাগর প্রশংসা করেছিলেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের চলিত ভাষার সমালোচনায় কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে বিবেকানন্দ ছিলেন এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ও সাধু চলিতের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত চলিতের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। সংস্কৃত ঘোমটা খুলে আমাদের ভাষাবধূটির কালো চোখের চাহনি দেখার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বিবেকানন্দেরও পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন কালীপ্রসন্ন।

আবার শুধু ভাষা নয়, নূতন চন্দের দিক থেকেও 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণে 'নক্‌শা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে কালীপ্রসন্ন যে দুটি কবিতা রচনা করেন তাতেই পরবর্তীকালে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে চিহ্নিত বাংলা ছন্দের প্রথম সূচনা হয়। সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ গিরিশচন্দ্র একথা গোপন রাখেন নি। (গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাবণবধ' নাটকের title page)।

বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছেন 'অশ্লীল,' বিদ্যাসগের তাকেই বলেছেন 'বড়ই আবশ্যক'। বঙ্কিচন্দ্রের প্রধান আপত্তি ছিল অশ্লীল শব্দ সম্বন্ধে, কিন্তু এই তথাকথিত অশ্লীলতা গ্রন্থটির সামান্য অংশেই আছে, সমগ্র গ্রন্থ সম্পর্কে এ অভিযোগ তাই প্রয়োজ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে নীতির দোহাই দিয়ে অশ্লীল বলেছেন, আধুনিক পাঠকের কাছে তা অশ্লীল নয়, কারণ তা থেকে আমরা তৎকালীন সমাজের একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্র পাই। তাছাড়া হুতোম সমাজের বিকৃতি সংশোধনের উদ্দেশ্যেই তাঁর নকশা এঁকেছিলেন, তাই পিউরিটান মনোভাব নিয়ে সমাজের নৈতিক অধঃপতনের দিকগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। সুতরাং সমালোচক বঙ্কিচন্দ্র এ প্রসঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন নি। দু-একটি অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে সবক্ষেত্রেই ব্যাপারটা অশ্লীল হয়ে ওঠে না। যেমন "কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন"' (কলিকাতার চড়ক পার্বন)-বাক্যটিকে সার্বিকভাবে অশ্লীল বলা চলে না। এই প্রবন্ধে মোট শব্দসংখ্যা ৩৯০০ আর বিতর্কযোগ্য অশ্লীল শব্দ সংখ্যা-৫। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে "পরদ্বেষী, পরনিন্দুক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত' বলেও নিন্দা করেছিলেন। কিন্ত ব্যাক্তি পরিচয়ের সাধারণীকৃতিত্বে হুতোমের নক্‌শা সহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছিল। তাছাড়া ভাবনীচরণ, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রর রচনাতেও (মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত) ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উপদান ছিল। প্রকৃতপক্ষে হুতোম নিজে ছিলেন উদার, প্রগতিবাদী ও পরোপকারী, তাই সমাজের দুর্নীতিগ্রস্ত অধঃপতনের উপর তাঁর মর্মভেদী আঘাত এমন অভ্যর্থভাবে এসে পড়েছিল তাই নীতিবাগীশ শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছেও হুতোমের নক্‌শা সুনীতি ও সুরুচির

বিরোধী মনে হয়নি, বরং মনে হয়েছিল "সরল, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। হুতোমের পূর্বে বা পরে সমাজের এমন সর্বত্রসঞ্চারী ফটোগ্রাফিক বাস্তবতাধর্মী নক্‌শা আর কারো কলমেই ফুটে ওঠে নি। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক নক্‌শা রচনার নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি সমাজচেতনা, হাস্যরসসৃষ্টি, সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক চলিতভাষার সাহিত্যে প্রবর্তন, বিষয় বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণে বাস্তবতা ও সরসতার অপূর্ব সমন্বয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র রচনারীতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আর কয়েকজন প্রখ্যাত হাস্যরসিকের রচনারীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে জরুরী। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র মধ্যে সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও গ্রন্থদুটি সগোত্র প্রায়। কারণ প্যারীচাঁদ সাধুগদ্যরীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দের মিশ্রণে ডিকেন্সের 'পিক্‌উইক পেপাস'-এর মতো চিত্রধর্মী ব্যঙ্গোপন্যাস লিখতে চেয়েছিলেন। আর কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ কথ্যভাষায়, রঙ্গব্যঙ্গের শাণিত সুচতুর বৈঠকিভঙ্গিতে ডিকেন্সের 'স্কেচেজ বাই বজ' এর মতো নকন্‌শাই লিখেছিলেন। বরং হুতোমের নক্‌শার উপর মধুসূদনের প্রহসন দুটির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। ['একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)]। পরবর্তী দীনবন্ধু মিত্রের 'বিধবার একাদশী' (১৮৬৬) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রহসনগুলিতে হুতোমের মতই ব্যক্তিগত পটভূমিকায় হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস আছে। তবে হুতোমের নক্‌শায় ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ উইট এবং স্যাটায়ারই বেশি আর সহানুভূতিসম্পন্ন দীনবন্ধুর প্রহসনে হিউমারের করুণ হাস্যরস বেশি। বঙ্কিমের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর পূর্বাভাষ পাওয়া যায়' 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারে'। হুতোম এবং কমলাকান্ত উভয়েই নিজ নিজ ষ্টাইলে অর্থাৎ হুতোম স্যাটায়ারের মাধ্যমে এবং কমলাকান্ত হিউমারের মাধ্যমে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় রেখে গেছেন। হুতোমের ব্যঙ্গের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে বিদ্যাসাগরের বেনামী ব্যঙ্গ পুস্তিকায় ব্যঙ্গ পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রীর তর্কযুক্ত উপলক্ষ্য করে অনেকটাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ, কিন্তু হুতোমের ব্যঙ্গ কখনো ব্যক্তিগত পটভূমিকায় বিধৃত হলেও প্রায়শঃই তা ব্যক্তিচরিত্রের সীমা পেরিয়ে শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক রূপে সামাজিক বিদ্রূপে পরিণত হয়েছে। হুন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী হুতোমের প্রধান সাদৃশ্য হল উভয়ের রচনাতেই ব্যঙ্গের ঝাঁঝ অত্যন্ত তীব্র, কিন্তু প্রধান পার্থক্য হল হুতোম পরিচালিত হয়েছেন মূলতঃ প্রগতিশীল মনোভাবের দ্বারা আর ইন্দ্রনাথ পরিচালিত হয়েছেন মূলতঃ রক্ষণশীল মনোভাবের দ্বারা। ত্রৈলোক্যনাথের বাস্তব কাহিনীতে উদ্ভটত্ব কম, কিন্তু শ্লেষ ও বিদ্রূপের আঘাতে এখানে সমাজের ভণ্ডামি প্রভৃতি অনাবৃত হয়ে পড়েছে এবং এখানেই পূর্বজ হুতোমের স্যাটায়ারের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য ও সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দ তাঁর পরিব্রাজক গ্রন্থে ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের কথ্যরূপ সমন্বিত, দেশী-বিদেশী সর্বাধিক শব্দের স্বীকরণযুক্ত, হুতোমী ভাষার মত তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন খাঁটি চলিত ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। পরবর্তী বীরবলের সঙ্গে হুতোমের সর্বপ্রধান সাদৃশ্য হল উভয়েই চতুর, বুদ্ধিদীপ্ত, নাগরিক শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যকে তার আবেগব্যাকুল করুণ রসার্দ্র আবহাওয়া থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তবে উভয়ের লক্ষণীয় পার্থক্য হল হুতোমে কিছু অশ্লীল শব্দের ব্যবহার থাকলেও বীরবলে তা একেবারে নেই। তাছাড়া হুতোমের তুলনায় বীরবলে উইটের অনেক বেশি প্রাধান্য। শেষ কথায় বলা চলে ভাবী ফরাসী সাহিত্যিক, মোপাঁসার মেজাজ নিয়ে, ডিকেন্সের 'স্কেচেজ বাই বজ' এক নক্‌শাধর্মী আধারে উনিশ শতকীয় নাগরিক বাঙালী সমাজের বাস্তব পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পুরো খাঁটি চলিত ভাষায় চিত্র ও চরিত্রের রঙ্গব্যঙ্গময় নিপুণ প্রদর্শনীতে 'হতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

৭৭.৫ সারাংশ

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' বইটি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সমাজের নানা সমস্যা এবং সামাজিক বিকৃতি নিয়ে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। উনিশ শতকীয় কলকাতার সামাজিক জীবনের নানা কুপ্রথা, কুরীতি, দুর্নীতির ছবি গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়। লেখকের দৃষ্টি মাতাল, ব্রাহ্ম, পাদরী, ইয়ংবেঙ্গাল বাবু, বৈষ্ণব বাবাজী, ভিখারী, কেরানি, দোকানি, স্টেশন মাস্টার, বুকিং ক্লার্ক, মোসাহেব পরিবৃত জমিদার, এছাড়া নানা ধরণের উৎসব যেমন চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, কলকাতার পথ, যাত্রা, হাফ আখড়াইয়ের আসর, গঙ্গায় নৌকাবিলাস, নগরের বারবিলাসিনী ইত্যাদি সবদিকেই পড়েছে।

গ্রন্থটির মধ্যে ঐতিহাসিক রসের পাশাপাশি হাস্যরসের অবতারণাও লক্ষ্য করা যায়। হাস্যরসের প্রকারভেদের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর রচনায় উইট এবং স্যাটায়ারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

তবে গ্রন্থটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এর ভাষা। গ্রন্থটির মধ্যে কালীপ্রসন্ন বিশুদ্ধ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এই ভাষাকে স্বয়ং বিদ্যাসাগরও প্রসংশা করেছিলেন। ভাষার পাশাপাশি গ্রন্থের মধ্যে ছন্দের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত ছন্দ পরবর্তীকালে "গৈরিশ ছন্দ" নামে চিহ্নিত হয়।

"হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা" গ্রন্থটির সঙ্গে মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা", "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী", "বিয়ে পাগলা বুড়ো" "জামাই বারিক" ইত্যাদি প্রহসনগুলির হাস্যরসের সৃষ্টির মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মুচিরাম গুড়ের জীবনাচরিত"-এর সঙ্গেও গ্রন্থটির 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারে"-র মিল পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, বীরবল প্রমুখ লেখকের লেখার সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখনভঙ্গির মিল পাওয়া যায়।

৭৭.৬ অনুশীলনী-২

ক. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

১। "হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা"-র চড়ক নিবন্ধ অবলম্বনে লেখকের সমাজ মনস্কতার পরিচয় দিন।

২। কালীপ্রসন্ন সিংহের ভিতরে যে সমাজসংস্কারক মন, হাস্যরসিক প্রাণ ও চিন্তাশীল মনন ছিল—তার পরিচয় পাঠ্য নিবন্ধ আনুসারে দিন।

৩। পাঠ্য 'চড়ক' নিবন্ধে গৃহীত কালীপ্রসন্নের ভাষারীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

খ. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা" কেন বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ?

২। 'চড়ক' নিবন্ধে ব্যবহৃত অশ্লীল শব্দের পাঠান্তে আপনি নিবন্ধটিকে কি অশ্লীল বলবেন? আপনার মতের সপক্ষে যুক্তি দিন?

৩। কালীপ্রসন্নের মেজাজ পরবর্তীকালে কার রচনায় লক্ষ্য করা যায়?

৪। 'আলালের ঘরের দুলাল' কার লেখা? এই গ্রন্থটি কি ধরণের?

৫। কালীপ্রসন্নের ব্যবহৃত কলকাতার চলতি মুখের বুলির উদাহরণ দিন।

৬। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

"একেই কি বলে সভ্যতা" গ্রন্থের রচয়িতা—

(ক) মধুসূদন দত্ত, (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) কালীপ্রসন্ন সিংহ।

৭৭.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. সুকুমার সেন—*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২-য় খণ্ড।*

২। মন্মথ নাথ ঘোষ—*মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ।*

৩। অজিত দত্ত—*বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস।*

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী—*রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।*

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—*'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা"-র ভূমিকা অংশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।*

৬। ড. সুকুমার সেন—*বাংলা সাহিত্যে গদ্য।*

৭। ড. অজিতকুমার ঘোষ—*বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা।*

৮। পরেশচন্দ্র দাস—*বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ।*

একক ৭৮ ❑ কমলাকান্তের দপ্তর ঃ পতঙ্গ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

৭৮.১ উদ্দেশ্য
৭৮.২ প্রস্তাবনা
৭৮.৩ লেখক পরিচিতি ঃ প্রাবন্ধিক বঙ্কিম
৭৮.৪ মূলপাঠ—কমলাকান্তের দপ্তর ঃ পতঙ্গ—বিশ্লেষণী পাঠ
৭৮.৫ সারাংশ
৭৮.৬ অনুশীলনী
৭৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৭৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- 'কমলাকান্তের দপ্তর' সমগ্র গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক কৌতূহলী হবেন।
- পতঙ্গের সঙ্গে মানুষের যে তুলনা লেখক করেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করে পাঠক নিজেদের সামাজিক অবস্থানটি নতুন করে অনুধাবন করবেন।
- বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট হাস্যরসের প্রয়োগ সম্বন্ধে পাঠক অবহিত হবেন।

৭৮.২ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে প্রাবন্ধিক বঙ্কিম সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। এককের মূলপাঠে বঙ্কিমের "কমলাকান্তের দপ্তর" প্রবন্ধটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে "পতঙ্গ" প্রবন্ধটির বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে। এছাড়া প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং দার্শনিক মনের পরিচয়ও এককটিতে ফুটে উঠেছে।

আপনি এককটি ভালো করে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার অসুবিধা হবে না।

৭৮.৩ লেখক পরিচিতি ঃ প্রাবন্ধিক বঙ্কিম

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ শে জুন যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দুর্গাদেবীর চতুর্থ সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। শিশু বয়স থেকেই তিনি ছিলেন ধীর, শান্ত, মেধাবী কিন্তু শারীরিকভাবে দুর্বল। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাই পুরস্কৃত হয়েছিল। বি. এ. পাশ করে তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ সময়েই (১৮৫৮ খ্রী.) তিনি Indian Field পত্রে Rajmohan's wife ইংরাজি উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেছিলেন। ১৮৬৫ খ্রী তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। চোদ্দটি উপন্যাস ও বড় গল্প রচনার পাশাপাশি তিনি লিখেছিলেন অসংখ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বল্পকাল রোগভোগের পরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের প্রতিভা বহুমুখী। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ সেই প্রতিভার সামগ্রিক চরিত্রটি প্রতিফলিত। এখানে বঙ্কিম ব্যক্তিত্বের অতি স্পষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; যেমন—দার্শনিক কবিত্ব, সমাজসচেতনতা, রোমান্টিকতা, ইতিহাস-চেতনা, সাম্য ও মানবতার প্রতি আকর্ষণ, ধর্মনিষ্ঠ মনোভাব, যুক্তিবাদিতা ইত্যাদি। তাঁর ব্যক্তিত্বে এইসব বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে উঠেছিল যুগ ও পারিবারিক প্রভাবে। তাঁর প্রাবন্ধিক প্রতিভাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়—বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের রচয়িতা হিসাবে। তাঁর বেশির ভাগ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'-এ এবং 'প্রচার নবজীবন'-এ। বঙ্গ দর্শন-এর বঙ্কিম ছিলেন প্রগতিশীল এবং প্রচার নবজীবন-এর বঙ্কিম ছিলেন তুলনামূলকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। বঙ্কিম-যুগেই নিহিত ছিল এই দ্বৈতসত্তা। উনিশশতকের নবজাগরণ আসলে ছিল হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের নবজাগরণ, তাই হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ বঙ্কিম মানসে যুগপত কারণেই ছিল। হিন্দু ধর্মকে যুক্তি ও আবেগের দ্বারা গৌরবান্বিত করার চেষ্টা প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের অনেকখানি জুড়ে ছিল। তাঁর দর্শনভাবনার চূড়ান্ত প্রকাশ 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনের বিবিধ পথ পরিক্রমা করে ন্যায় নির্দেশিত যুক্তি ও বিশ্লেষণের পথ ধরে নিজে অভিজ্ঞতা, যুক্তিবোধ, মানবতাবোধ ও আধ্যাত্মবোধের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর নবদর্শন চেতনা। ব্যক্তি চরিত্রের উন্নতিসাধনে তিনি বস্তুগত ও চৈতন্যগত সত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁর আধ্যাত্মবাদ নবজাগরণের যুগের প্রেক্ষিতে, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের প্রেক্ষিতে আধুনিক হয়ে উঠেছিল। তাঁর রাজনীতিচিন্তা সমাজ-সচেতনতা ও স্বদেশ প্রীতির পথ ধরে এসেছিল। বঙ্কিমের যুগচরিত্র ও ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে নিহিত দ্বৈতসত্তাই তার সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক ভাবনায় ক্লাসিক ও রোমান্টিক ভাবনার মিশ্রণে প্রতিফলিত। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নীরস বা তথ্যনির্ভর নয়, বরং শিল্পগুণে হাস্যরসে সজীব হয়ে উঠেছে।। বাঙালীর ইতিহাসচেতনাকে তিনিই প্রথম জাগ্রত করেছিলেন। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের প্রতিভার চূড়ান্ত সার্থক প্রকাশ তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধ 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ।

৭৮.৪ মূলপাঠ-কমলাকান্তের দপ্তর ঃ পতঙ্গ

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মেসাহেবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,—আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পরায় একটি ফল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশি করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহা অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারিপাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 'চোঁ-ও ও-ও', 'বোঁ-ও ও' করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, 'তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছে আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।' তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, 'আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপকর।' আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চরি দিকে ঘুরে বেড়াই-প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্। পতঙ্গজাতি, পূর্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছে—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন

আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,—আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কী ভাবে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?—লইয়া কি করবি।—নিত্য নিত্য কুসুমের মধুচুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্বপ্রফুল্লকর সূর্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্যের সে এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি। আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমির জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে?—কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছে-বোঁ-ও-ও।

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নশীরামবাবু ডাকিল, 'কমলাকান্ত!' আবার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নশীরামকে চিনিতে পারিলাম না।—দেখিলাম মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে সে চোঁ বো করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ বহ্নি, ধর্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয় বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাঁচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই তাহা ত পাই না—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানস প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি-ধন-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি।

এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয় তাকে কাব্য বলি। মহাভারতের মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলে জগতে অতুল্য কাব্য গ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের 'Paradise Lost'। ধর্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় করি, সেন্ট পল। ভোগ বহ্নির পতঙ্গ, 'আন্টনি', 'ক্লিওপেত্রাচ'। রূপ-বহ্নির 'রোমিও ও জুলিয়েত', ঈর্ষা-বহ্নির 'ওথেলো'। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয় বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়নের সৃষ্টি। বহ্নি কি আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান, হারি মানে। ধর্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম কি জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গেরদ দল, ঘুরিয়া কোন ফাল নাই। পার, আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মর. না পার, চল, 'বোঁ, করিয়া চলিয়া যাই।

—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

বিশ্লেষণী পাঠ

"কমলাকান্তের দপ্তর" গ্রন্থের ভাব ও আঙ্গিক, বিষয় ও প্রকাশভঙ্গি—উভয়ক্ষেত্রেই ছিল যুগপ্রভাব। লোকশিক্ষক বঙ্কিম প্রথাগত প্রবন্ধে গুরুর মতো তাঁর মত শিক্ষাদানের ভঙ্গিতে মতামত প্রকাশ করতেন; কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সুহৃদের মতো আন্তরিক ভঙ্গিতে, পাঠকের সমস্তরে নেমে এসে তাঁর কথা বলেছেন। এই গ্রন্থের প্রধান কয়েকটিবৈশিষ্ট্য হল—স্বদেশ প্রেম, সমাজসচেতনতা, পুরাতনের নব-মূল্যায়ণ, বাঙালীয়ানা ও হিন্দুত্বের প্রতি গভীর অনুরাগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধারণার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা আবেগ ও যুক্তিবাদিতার সহাবস্থান, আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা এবং লেখক ব্যক্তিত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব। 'আমার দুর্গোৎসব' নিবন্ধে স্বদেশপ্রেমের আবেগ শিল্পরূপ লাভ করেছে। স্বদেশ প্রেম ও সমাজসচেতনতা আবার ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা 'আমার দুর্গোৎসব', 'মনুষ্যফল', 'একটি গীত' বা 'বিড়াল' নিবন্ধে প্রকাশিত। পুরাতনের নবমূল্যায়ণ রেনেসাঁ যুগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ছিল বলেই দুর্গামূর্তির নবব্যখ্যা দিয়েছেন কমলাকান্ত। ইতিহাস চেতনার সূত্র ধরেই "কমলাকান্তের দপ্তর"-এ এসেছে বাঙালীয়ানা ও হিন্দুত্বের প্রতি বিশেষ অনুরাগের প্রসঙ্গ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সমন্বয়ও দেখা যায় কমলাকান্তের দপ্তর"-এ। কারণ এর আঙ্গিকটি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যজাত Personal Essay-র প্রভাবজাত, কিন্তু এর বক্তব্য বাঙালার এক বিশেষ যুগের বিশেষ মানুষের আত্মকথন। এই সমন্বয় দপ্তরের হাস্যরসের ক্ষেত্রেও লক্ষিত। আবেগ ও যুক্তির দ্বন্দ্ব রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য, যা এখানে কমলাকান্তের দর্শনভাবনায় মাবনতাবাদের প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দর্শনভাবনায় কখনো তিনি যুক্তিবাদী কখনো নৈরাশ্য পীড়িত। তাঁর পরহিতব্রত কখনো উদার মানবতাকেন্দ্রিক, কখনো শুধু হিন্দু-হিতব্রত। 'একা' প্রবন্ধে আবেগ ও যুক্তির সৌষম্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থের পাঠ্য 'পতঙ্গ' নিবন্ধটি বিশ্লেষণের সময় যুগভাবনা ও নবআঙ্গিকের আলোয় দপ্তর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'পতঙ্গ' প্রবন্ধের দুটি অংশ। প্রথমাংশে আফিমের প্রসাদে কমলাকান্ত পতঙ্গের ভাষা বুঝতে পেরেছেন এবং পতঙ্গের জীবনাদর্শ জেনেছেন। দ্বিতীয়াংশ তিনি মানুষের ভাষা বুঝতে পারেননি এবং সকল মানুষকে পতঙ্গ বলে বোধ হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে পরিহাসের সুর থাকলেও মূল সুরটি কিন্তু গভীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা-সঞ্জাত নৈরাশ্যে বিধুর। যে কমলাকান্ত 'আমার মন'-এ বলেছিলেন "বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়।" তিনিই 'পতঙ্গ'-এ বলেছেন—"ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি?" তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় ক্লান্ত কমলাকান্তকে যেন এই দুটি উক্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতা আমাদের সাধারণ লক্ষণ, যা আড্ডায় হয়তো ধরা পড়ে। বঙ্কিমের উপন্যাসে আমরা আদর্শবাদী দৃঢ়চেতা বঙ্কিমকে পাই, কিন্তু "কমলাকান্তের দপ্তর"-এ আমরা বিভ্রান্ত ক্লান্ত বঙ্কিমকেও পাই।

'পতঙ্গ' প্রবন্ধে উপমার মূলে ছিল সক্রিয়া গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও দার্শনিক চিন্তা। নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় বসে বাবুর দলাদলি গল্প শুনতে শুনতে উত্তেজিত কমলাকান্ত বেশী মাত্রায় আফিম খেয়ে পেলে হঠাৎ দিব্যকর্ম প্রাপ্ত হয়ে

পতঙ্গের দীর্ঘ একোক্তি শুনেছেন। এই প্রবন্ধে কমলাকান্ত বেশির ভাগ সময়টাই চুপ করে থেকেছেন, নসীরামবাবুও পতঙ্গ কথা বলেছে, এর প্রেক্ষিতে কমলাকান্ত ডুব দিয়েছেন তাঁর ভাবনার গভীরে। পতঙ্গের আগুনে পুড়ে মরার বৈশিষ্ট্যের সূত্রে তিনি গেঁথেছেন মানবজীবনের প্রবৃত্তিগত অসহায়তাকে। অমোঘভাবে আমরা যে ধ্বংসের অভিমুখে যাচ্ছি, প্রবৃত্তির এই চক্রব্যূহ থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাননি বলেই হতাশ হয়েছেন কমলাকান্ত।

প্রাবন্ধিক পিতলের পিলসুজের মেটে প্রদীপের শিখা থেকে সভ্যতার পথ ধরে ফানুসে প্রবেশ পর্যন্ত বাস্তব ইতিহাস তুলে ধরে পতঙ্গের বক্তব্যকে আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। পরের অনুচ্ছেদে যুক্তির থেকে দাম্পত্য কলহের সুরটি যেন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই মেয়েলি ঢঙে পতঙ্গ এখানে গজগজ করেছে—"দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক।" রাইট, হক শব্দের ব্যবহারে, সহমরণ প্রথার উল্লেখ পতঙ্গ মানবজীবনের, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। কলহের সুরটি বজায় রেখে অতি সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন ভাবে হিন্দুনারীর থেকে সমগ্র স্ত্রী জাতির প্রসঙ্গে চলে গেছে পতঙ্গ। পরের অনুচ্ছেদে পতঙ্গ ও স্ত্রীজাতির তুলনা আছে।—

"আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রী জাতিতে পারে?"

এর পরের তিনটি অনুচ্ছেদে বঙ্কিম গভীর আকুল আবেগ সঞ্চারিত করেছেন পতঙ্গের বক্তব্যের মাধ্যমে। আসলে প্রবৃত্তির অমোঘ আকর্ষণকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা কঠিন, তাই তাকে সঞ্চারিত করতে হয় আবেগের পথে ধরে। প্রবন্ধের শেষে তাই একই সুরে কমলাকান্ত বলেছেন বহ্নি, ঈশ্বর, ধর্ম, জ্ঞান, স্নেহ কি তিনি জানেন না। "তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি।" ফলে আবেগ যন্ত্রণা, নৈরাশ্যের প্রেক্ষিতে পতঙ্গের সঙ্গে সহমর্মী হয়ে ওঠেন কমলাকান্ত তথা সমগ্র মানবজাতি। আবেগঘন এই উপলব্ধির মাধ্যমে এই উপমাজাত আবেদন পৌঁছে যায় হৃদয়ের কাছে। এখানে বক্তা পতঙ্গটি বাধা পেয়ে ফিরে এসেছিল কিন্তু বলে গিয়েছিল—"ভাল থাক-আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি।" পতঙ্গ উড়ে গেছে এবং প্রবন্ধ থমকে দাঁড়িয়েছে এইখানে। কিন্তু কমলাকান্তের ঘোর এখনো কাটে নি, তখনই নসীরাম বাবুর ডাকে কমলাকান্ত সম্পূর্ণ আচ্ছন্নতা থেকে অর্ধচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরে এলেন। কিন্তু পতঙ্গের বক্তব্য আবেগের পথ ধরে চৈতন্যের এমন গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল যে নসীরামবাবুর জায়গায় তিনি একটি বিরাট পতঙ্গকে দেখতে পেলেন; ততক্ষণে মানবভাষা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য হয়ে গিয়েছিল। কমলাকান্তের সত্তা তখন পতঙ্গ সত্তায় পরিণত।

এরপ কমলাকান্তের মনে হয়েছে—".....মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ।" তবে মানুষ যা চায় তা সে পায় না অর্থাৎ কাচের আবরণ হল কাম্যবস্তু লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা। কমলাকান্তের মতে "কাচ না থাকিলে সংসার এতনিদ পুড়িয়া যাইত"। কারণ কাম্যবস্তু পেলে অন্বেষণ ফুরিয়ে যায়, মনুষ্যজীবন হয় নিরর্থক। আবার কাম্যবস্তু না পেলে অতৃপ্তির আকুলতা, অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা জাগে। প্রবন্ধের শেষে দেখি না জানার যন্ত্রণা কমলাকান্তকে অস্থির করেছে। তবু না জানার অস্থিরতায় তিনি অপেক্ষাকৃত সুখে আছেন; সব জানার দুঃখ তাকে স্থবির করে দেবে। অর্থাৎ আকর্ষণে শুধু খুঁজে যেতে হবে—এখানেই বঙ্কিমের রোমান্টিক মনটিকে স্পর্শ করা যায়। জীবনের সংজ্ঞা যদি হয় 'অনন্ত যন্ত্রণাময় অন্বেষণ', তাহলে সাহিত্যের সংজ্ঞা হবে 'অনন্ত যন্ত্রণার ইতিহাস'। এরপর কমলাকান্ত ধর্মবহ্নি ও জ্ঞান-বহ্নিকে দগ্ধ হবার বাস্তব ক'টি উদাহরণ দিয়ে তিনি সাহিত্য-প্রসঙ্গে চলে গেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ধর্মবহ্নির জ্বালা বুকে বয়ে বেড়িয়েছেন, কিন্তু সাধারণ ধর্মবিৎ জ্ঞান বা বুদ্ধি রূপকাচের আবরণে বাধা পেয়ে বেঁচে যান। সক্রেটিস বা গ্যালিলিও জ্ঞানবহ্নির আকর্ষণে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেছিলেন। কিন্তু বহু জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজব্যক্তির অনুশাসনের কাছে বাধা পেয়ে ফিরে আসেন ও বেঁচে যান। কমলাকান্তের মতে মনুষ্য জীবনের বহ্নির দাহ কাব্যে বর্ণিত। যেমন মহাভারতে মান-বহ্নিতে দুর্যোধনেরূপী পতঙ্গ পুড়ে মারা গিয়েছিলেন। স্নেহবহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ হয়েছিল রামায়ণে। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত Paradise lost. ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল। ভোগবহ্নির

পতঙ্গ অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রা, রূপবহ্নির রোমিও-জুলিয়েত ঈর্ষাবহ্নির ওথেলো। ইন্দ্রিয় বহ্নি জ্বলছে 'গীতগোবিন্দ' ও 'বিদ্যাসুন্দর'-এ।

পতঙ্গারূপী মানুষের সামনে কমলাকান্ত দুটি পথ খোলা আছে দেখেছেন—হয় পুড়ে মরা, নয় ফিরে যাওয়া। হয় তত্ত্বজিজ্ঞাসায় ঝাঁপ দেওয়া, নয়তো তত্ত্বজিজ্ঞাসা থেকে নিবৃত্ত হওয়া। কমলাকান্ত কোনো পথটিকেই পাঠকের উপর চাপিয়ে দেন নি। কারণ ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখক তাঁর মত জবরদস্তি মূলকভাবে পাঠকের উপর চাপিয়ে দেন না, কারণ তাতে আন্তরিকতা নিষ্পেষিত হয় নৈতিকতার চাপে।

৭৮.৫ সারাংশ

"কমলাকান্তের দপ্তর" -এ বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-দার্শনিকতা, কবিত্ব, সমাজ-সচেতনতা, রোমান্টিকতা, ইতিহাসচেতনা, সাম্য ও মানবতার প্রতি আকর্ষণ, ধর্মনিষ্ঠা মনোভাব, যুক্তিবাদিতা ইত্যাদি। তবে "কমলাকান্তের দপ্তর" এ বঙ্কিমের দার্শনিক মনের পরিচয়ই বেশি পাওয়া যায়। গ্রন্থটির সবক্ষেত্রেই ছিল যুগের প্রভাব। গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—স্বদেশপ্রেম, সমাজসচেতনাতা, পুরাতনের মূল্যায়ণ, বাঙালিয়ানা ও হিন্দুত্বের প্রতি গভীর অনুরাগ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ধারণার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা, আবেগ ও যুক্তিবাদিতার সহাবস্থান, আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা লেখ ব্যক্তিবের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

"কমলাকান্তের দপ্তর" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "পতঙ্গ" প্রবন্ধটির দুটি অংশ। প্রবন্ধের শুরুতে পরিহাসের সুর থাকলেও, শেষপর্যন্ত তা নৈরাশ্যে ভরা। প্রবন্ধটির মূলে আছে গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও দার্শনিক চিন্তা। প্রবন্ধটিতে কমলাকান্তের মনে হয়েছে, মানুষ মাত্রই পতঙ্গ এবং সেই মানুষের সামনে দুটি পথ খোলা আছে, হয় পুড়ে মরা, নয় ফিরে যাওয়া। তবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে লেখক নির্দিষ্ট কোনো পথকে না বেছে নিয়ে তা পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন।

৭৮.৬ অনুশীলনী

ক. নীচের প্রশ্নগুলির অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। 'Paradise Lost' কার লেখা?

২। কার লেখা তিনটি ট্র্যাজেডিরঙ্গক উল্লেখ আছে প্রবন্ধে?

৩। ইন্দ্রিয়-বহ্নি কোন দুটি কাব্যে জ্বলছে? কাব্য দুটির রচয়িতাদের নাম লিখুন।

৪। সক্রেটিস ও গ্যালিলিও কে?

৫। রামায়ণ ও মহাভারতে লেখক কোন্ দুটি বহ্নিকে ক্রিয়াশীল দেখেছেন?

খ. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন—

১। "আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?"

২। "আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?"

৩। "যেদিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে।"

৪। "কাচ না থাকলে, সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত।"

৫। "তবু সেই আলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি।"

গ. বিশদ আলোচনা করুন—

১। 'পতঙ্গ' প্রবন্ধ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র মানবচরিত্রের যে রহস্য উন্মোচন করেচেন তার পরিচয় দাও।

২। 'পতঙ্গ' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং এর রচনাশৈলীর পরিচয় দাও।

৩। 'পতঙ্গ' পবন্ধটিতে কমলাকান্তের আত্ম-উপলব্ধির যে পরিচয় পরিস্ফুট তার বিশদ আলোচনা কর।

৭৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা সাহিত্যের একদিক—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

২। বঙ্কিমচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৩। 'ব্যক্তিগত'—বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৪। 'আড্ডা'—গোপাল হালদার।

৫। কমলাকান্তের দপ্তর—ড. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত।

৬। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা—ড. অধীর কুমার দে।

৭। বাংলা সাহিত্যে গদ্য—ড. সুকুমার সেন।

৮। Benginning of English Essay—W.L. Mac Donald.

পত্রপত্রিকা ঃ

১। অমিত্রাক্ষর পত্রিকা 'আড্ডা' সংখ্যা ২০১৫

একক ৭৯ ❑ বিচিত্র প্রবন্ধ ঃ বাজে কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

৭৯.১ উদ্দেশ্য

৭৯.২ প্রস্তাবনা

৭৯.৩ লেখক পরিচিত ঃ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ

৭৯.৪ মূলপাঠ—বিচিত্র প্রবন্ধ ঃ বাজে কথা—বিশ্লেষণী পাঠ

৭৯.৫ সারাংশ

৭৯.৬ অনুশীলনী

৭৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৭৯.১ উদ্দেশ্য

- রাবীন্দ্রিক প্রবন্ধ পাঠ করে পাঠক মননের জগতে সম্পন্ন হবেন।
- রবীন্দ্রনাথ কৌতুকময় যে বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি এখানে ব্যবহার করেছেন, তা পাঠককে তাঁর ভাষাগত দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।
- রবীন্দ্রনাথের খেয়ালী কল্পনা, লঘু বাচনভঙ্গি, মানুষকে বিচার করার ক্ষমতা জেনে পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠে সবিশেষ উপকৃত হবেন।

৭৯.২ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এককের মূলপাঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিচিত্র প্রবন্ধ" -এর অন্তর্গত 'বাজে কথা" প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ আছে।

আপনি এককটি ভালো করে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার অসুবিধা হবে না।

৭৯.৩ লেখক পরিচিতি ঃ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ

৭ই মে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। মাত্র আঠার বছর বয়সে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম বই 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'গীতাঞ্জলি' ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া কিছু কবিতার ইংরাজী অনুবাদ Song Offerings-এর জন্য নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। এরপর থেকেই বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালী সাহিত্যিকদের উপর তাঁর বিপুল প্রভাবের সূচনা হয়। মাত্র বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে আশী বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছেন কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র। প্রাণশক্তির এত প্রাচুর্য, আবেগের এত গভীরতা, রোমান্টিক মানসের একম কল্পস্বর্গপরিক্রমা; বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বাতীতের, সীমার সঙ্গে

অসীমের, খণ্ডের সঙেঅগ পূর্ণের এমন মিলনলীলা আর কোনো একজন কবির মধ্যেও এভাবে পাওয়া যায় না। ৭ই আগষ্ট ১৯৪১ এ তাঁর মহাপ্রয়াণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ প্রধানতঃ রবীন্দ্র প্রভাবিত যুগ বলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পরিচিত।

সার্বভৌম কবিখ্যাতির জন্য গদ্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন ন্যায্য সমাদর পেলেন না, কবিখ্যাতির অন্তরালেই এই গদ্যশিল্পী ঢাকা রইলেন। অথচ তিনি গদ্য রচনা শুরু করেছেন পনের বছর বয়স থেকে। 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় তার 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা' বা 'ভারতী' পত্রিকায় মেঘনাদবধ কাব্য ছিল সূক্ষ্ম গ্রন্থ সমালোচনা। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তিনি একনাগাড়ে গদ্য লিখে গেছেন। সুদীর্ঘ জীবন ধরে তিনি সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে এত প্রবন্ধ লিখেছেন, তার পরিমাণ রসসাহিত্য থেকে খুব কম হবে না। এই সমস্ত প্রবন্ধে তাঁর অসাধারণ মণীষা, পাণ্ডিত্য, ভুয়োদর্শন ও যুক্তিনিষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ততটা মনীষাগত নয়, যতটা অনুভূতি বা হৃদয়গত। অর্থাৎ এও তাঁর মানস রচনা—কবিতার মতোই তাঁর সাধের সাধনা। রবীন্দ্রসত্তায় ছিল রমণীয়তা, তাই তাঁর প্রবন্ধ জাতীয় রচনাগুলিও রমণীসুলভ কমনীয়তায় মধুর। বঙ্কিমচন্দ্র বা রামেন্দ্র সুন্দরের প্রবন্ধের যুক্তি শৃঙ্খলার ঐশ্বর্যে তা ততটা বীর্যবান নয়। রবীন্দ্রনাথ রসবাদী প্রাবন্ধিক ছিলেন বলেই তিনি নীরস প্রবন্ধকে সাহিত্য করে তুলেছিলেন। হৃদয় ও মস্তিষ্ক, অনুভূতি ও উপলব্ধি, কল্পনার ভাবসত্য আর বিজ্ঞানের প্রয়োগসত্যের সমন্বয় হয়েছে রবীন্দ্র-জীবনবোধের অসীমলোকে। চিন্তা-পুরুষের সঙ্গে ভাব-বধূর, প্রণয়ের পূর্বরাগ দেখা দিয়েছিল বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ক্রমবিকাশে পূর্বরাগের পালা শেষ হয়ে অভিসারের যুগ শুরু হয়েছে। জ্ঞান ও যুক্তি-শৃঙ্খলার সঙ্গে ভাব ও আবেগের মিলনধর্মিতার গুণেই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে শিল্প।

রবীন্দ্রনাথের মননমূলক গদ্যরচনা সাধারণ ও সমগ্রভাবে রচনাসাহিত্য। তবু বস্তু-তথ্য ও যুক্তি-নিষ্ঠার মাত্রাগত পরিমাণ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধশিল্পকে দুভাগে ভাগ করা যায়—রচনাশিল্প এবং নিবন্ধ-সন্দর্ভ। যে লেখাগুলিতে ব্যক্তিগত ভাবাদর্শ, আমেজ ও আবেগ, খেয়ালী কল্পনা এবং ভাষার আলঙ্কারিতার সর্বময় বিস্তারগ এই ব্যক্তিগত নিবন্ধগুলিকে রচনাশিল্প এবং যেগুলিতে অপেক্ষাকৃত জ্ঞান ও মণীষার প্রাধান্য, বস্তু ও তথ্যনিষ্ঠা বেশি, ভাষায় আছে ঋজুতা, সেগুলিকে নিবন্ধসন্দর্ভ বলা যেতে পারে।

রচনাশিল্পের অন্তর্গত হল—

ক। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১), 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী' (১৮৯১-৯৩), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'পতের সঞ্চয়' (১৯৩৯) (ভ্রমণ সাহিত্য)।

খ। 'ছিন্নপত্র' (১৯১২), 'পথে ও পথের প্রান্তে' প্রভৃতি। (পত্র সাহিত্য)।

গ। 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭), 'লিপিকা' (ব্যক্তিগত রচনা)।

ঘ। 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), (স্মৃতি সাহিত্য)।

নিবন্ধ-সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত হল—

ক। সাহিত্য সমালোচনা— 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোক সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬); প্রভৃতি।

খ। রাষ্ট্রাদর্শ—'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'রাজা প্রজা' (১৯০৮), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'পরিচয়' (১৯১৬); 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪১)।

গ। শিক্ষাদর্শ— 'শিক্ষা' (১৯০৮), 'বিশ্বভারতী', 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রভৃতি।

ঘ। চরিতাদর্শ— 'আত্মপরিচয়', 'খৃষ্ট', 'বুদ্ধদেব', 'মহাত্মা গান্ধী', 'বিদ্যাসাগর', 'চারিত্র পূজা'।

ঙ। বিজ্ঞান— 'বিশ্বপরিচয়'।

চ। ধর্মাদর্শ— 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৬), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩)।

৭৯.৪ মূলপাঠ—বিচিত্র প্রবন্ধ ঃ বাজে কথা

বাজে কথা

অন্য-খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম-অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে সে পথ কেজো-সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্য চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারেই চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক 'তাবচ্চ শোভতে' যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমানকালের পরীক্ষিত সর্বজনবিদিত সতত্য ঘোষণার প্রবৃত্ত থাকেন; কিন্তু তখনই তাঁর বিপদ যখনই তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোনো কথাই বলিতে পারে না, হয় বেদবাক্য বলে নয় চুপ করিয়া থাকে, হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য, তাহার প্রতিবেশ, শিয়সি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ?

পৃথিবীতে জিনিসমাত্রই প্রকাশধর্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, স্ফটিক অকারণে ঝকঝক্ করে। কয়লার বিস্তর কল চলে, স্ফটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্য। কয়লা আবশ্যক, স্ফটিক মূল্যবান।

এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝল্‌মল্ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে— তাহার কোনো বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারও থাকে না, সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ প্রকাশ এক ভালোবাসে, আলোক-তাহার এত প্রিয় যে,আবশ্যককে বিসর্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও, উজ্জ্বলতার জন্যলালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মেহা সকলের নাই। অনেকেই বুদ্দিমান, বিবেচক। গুহা দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেকিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উদ্যমমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহতিরা সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইহাদের কোনো লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইহাদিগকে যে সকল নামে অভিহিত করিয়াছে আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বরুচি ইঁহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচি গর্হিত। আমরা ইঁহাদিগকে যাহা মনে করি তাহা মনেই রাখিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সামলাইয়া কথা কহিতেন না, তাহার পরিচয় একটি সংস্কৃত শ্লোকে পাই। ইহাতে বলা হইতেছে— সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়া ছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল, যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তমামাত্র তখন দূরে ছুড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় যাঁহারা সকল জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করেন, শুদ্ধতার সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্বরনারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভলো করিতেন; কারণ ইঁহারা গুরমহাশয়ের কাজ করেন। যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্‌বেজিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃতসাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায় ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন, তবে তখনই ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছু নাই। ইহা নিটোল মুক্তা এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী, কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘনির্মিত পান ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীহৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিত বেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখ ছুটিয়া চলিয়াছে— আর কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন যে (Idletears) যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের কাব্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উদ্যত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তখন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছ কেন। আমি তর্ক করিতে চাই না, এ সকল কথা আমি কোনো উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে বৃক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার ও সমস্ত কালিদাসের বানানো, কাব্যরচনারও একটা উপলক্ষ্যমাত্র। এই ভারা বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন? এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, 'রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশমা শব্দান্' মন অকারণ বিরহে বিকল হইয়া উঠে কালিদাস অন্যত্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন; আষাঢ়ের প্রথম দিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাত। তবে পূর্বমেঘ এত রহিয়া বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া এত জনপদবধূর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কৃষ্ণকটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পড়িবার সময়েও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি কী লাভ করিলাম হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয়, তবে স্বীকার করিব, মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনও মানুষ ছিল এবং তখনও আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন। ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে। অতএব যাহা অকারণ যাহা

অনাবশ্যক, হে চতুরানন, তাহার রসের কাব্যে রসিকদের জন্যই চাকা থাকুক—যাহা আবশ্যক যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদ্দারের অভাব হইবে না।

১৩০৯ আশ্বিন

বিশ্লেষণী পাঠ ঃ

১৮৮৫-১৯১৬-র মধ্যে লেখা কিছু রচনার সঙ্কলন "বিচিত্র প্রবন্ধ"। এর রচনাগুলি আদৌ প্রবন্ধজাতীয় নয়। "বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর রচনাগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয় ও ভঙ্গিগত আত্মীয়তা এবং রবীন্দ্রনাথের অপরাপর নিবন্ধ সমূহ থেকে এদের অনন্যপূর্বতা কোথায় ও কিভাবে তার আলোচনা প্রয়োজন। এর রচনাগুলি বিচিত্র নয়, কারণ এর প্রায় সবগুলি রচনারই ভাবমর্ম মূলত এক। এর কোনোটিতেই নেই যুক্তির প্রকৃষ্ট বন্ধন বা তথ্যভার ও বিষয়বস্তুর গৌরব, তাই এদের সঠিক অর্থে প্রবন্ধ বলা হয়তো যায় না। এর কোনো রচনাই নিঃসঙ্গ বা দোসরবিহীন নয়। যেমন—'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে'; 'বাজে কথা' ও 'পনেরোআনা'; 'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা'-তে এই ভাব দু'টি রচনায় পূর্ণতা পেয়েছে। এর সব রচনাই রচনাকারের ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত। এই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নের প্রথম বৈশিষ্ট্য লেখকের 'মুড'। সব ক'টি রচনায় একই 'মুড' তবে তার তরঙ্গ কোথাও উঁচুতে কোথাও বা নীচুতে। রচনাগুলিতে লেখকের অহং সর্বদাই উপস্থিত, সব রচনাই তার প্রথম পুরুষে লেখা। তৃতীয়ত, সম্বোধনের একটি সাধারণ রীতি রচনাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। রচনাকার একদিকে, আর সকলে যেন তার প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের প্রতি সম্বোধনে মধ্যমপুরুষের ব্যবহারের এই রীতি যেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর দ্বারা প্রভাবিত। 'সোনার কাঠি' ছাড়া সব রচনাই সরল সাধুভাষায় লেখা। পদবিন্যাস, অলঙ্কার প্রয়োগ, যদি স্থাপন প্রভৃতিতে যেন একই রচনারীতি অনুসৃত। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ রসরচনার আদর্শ স্থাপিত হয়েছে। গভীর কথা সহজভাবে প্রসন্নচিত্তে বলার এই আর্ট তিনিই দেখিয়েছেন। এখোনে কবিত্ব, দার্শনিকতা, বাহ্যজগতকে পর্যবেক্ষণ ও অন্তরের অবগাহন যেমন আছে, তেমনি এসব মিলেমিশে এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে সমগ্রতার ঐক্যও আছে। মন্নয়তার গুণেই এই গ্রন্থটি এমন অনন্যসাধারণ হয়েছে। করুণরস (রুদ্ধগৃহ), শান্তরস (পথপ্রান্তে), বিদগ্ধ কৌতুকহাস্যরস (বাজে কথা), উৎসাহব্যঞ্জক মৃদু বীররস (মাভৈঃ) এবং সার্বিক প্রসন্নরসের সমাহার এখানে লক্ষিত হয়। লেখকের মনের হাসির স্নিগ্ধতাই এর মাধুর্যের উৎস, যা একে দিয়েছে অজন্তার চারুতা।

'বাজে কথা' রচনাটিতে লেখক অনাবশ্যকতাকে একটি তত্ত্ব মূল্য দান করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের পনের আনাই অর্থাৎ বেশির ভাগটাই অপচায়িত হয় বা বাজে খরচে যায়। কি সাহিত্য, কি মানবসমাজ, কি বিশ্বপ্রকৃতি, সর্বত্র যা প্রয়োজনীয় বা ফলবান তা পরিমাণে মাত্র এক আনা। অধিকাংশের আত্মবিস্মৃতি, অস্তিত্বহীন আত্মদানের দ্বারা যে উর্বর শ্যামলতার সৃষ্টি হয়, তারই আনুকূল্যে ঐ সামান্য এক আনা পরিমাণ মহামূল্যবানের সৃষ্টি হয়। অতএব পনের আনা বাজে কথার অনাবশ্যকতার জন্য ক্ষোভ বা বেদনাবোধ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে বিস্মৃতি ও গতিতত্ত্ব আছে। বাজে কথা অনাবশ্যকতার কারণেই স্থায়ী হয় না, সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হয়ে যায়। এই বিস্মৃতিতে বা বিলীয়মানতায় তার অগৌরব নয়; কেননা যে ক্ষণটুকু তারা ছিল, সে মুহূর্তেটুকুতে তারা এই বিশ্বজগৎ ও জীবনকে সুন্দর সরস, উর্বর ও শ্যামল করে আনন্দ দিয়েছে আর তাতেই জীবনের সার্থকতা ও চরিতার্থতা।

তাই রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেছন বাজে খরচে মানুষকে যথার্থ চেনা যায়, কারণ প্রয়োজনের খরচ নিয়মানুযায়ী হয় আর অপব্যয় মানুষ করে তার নিজের খেয়ালে। ঠিক তেমনি করেই বাজে কথাতেই একটি মানুষের মনের বা চিন্তাশক্তির যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায়। অনেকেই কেতাবী শিক্ষায় শিক্ষিত হন ফলে বক্তৃতা তাঁরা সাজিয়ে গুছিয়ে

ভালোই দিতে পারেন; কিন্তু আড্ডার তাঁর চারপাশে ভিড় জমে না। অনেকেই এমন আছে যে সহজ কথা মনের কথা কিছুতেই কাছের লোকেকেও স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। আসলে কোনো কথার বাইরে কোনো কথা এঁরা বলতেই পারেন না।

অথচ মানুষ স্বভাবতই নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। এই প্রকাশ করার তাগিদেই বহু যুগ আগের মানুষও গুহাচিত্রে, পাথরে নিজেদের কথা খোদাই করেছিল। তবু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা প্রকাশধর্মী নন। আবার এমন অনেক নিতান্ত সাধারণ মানুষ আছে যাঁরা অকারণ আনন্দেই কথা বলে যান। উপলক্ষ্য ছাড়াই এঁরা প্রকাশের আলোয় ঝলমল্ করে ওঠেন ঠিক স্ফটিকের মত। পতঙ্গ যেমন আগুন দেখলেই আকৃষ্ট হয়, পুড়ে মরা তার নিয়তি জেনেও; তেমনি কিছু মানুষ জীবনভ'র নানা বাজে কথায় বিভোর হয়ে থাকে। স্বার্থচিন্তা ছেড়ে সে অযথা সময় নষ্ট করে আড্ডায় উজ্জ্বল চোখের কোনো মানুষ তাকে এতটাই আকর্ষণ করে যে সে কাজ ছেড়েও তারই সঙ্গে বাজে কথার জাল বুনে যায়।

আবার ঠিক এর বিপরীতধর্মী মানুষও আছেন। যাঁরা কাব্য-নাটকের চর্চাও করেন কিছু পাওয়ার লোভে। বুদ্ধিমান, বিবেচক এইসব মানুষ এই মরণশীল পৃথিবীতে একটুও সময় নষ্ট করতে চান না। প্রতিটা পল তাঁরা ব্যবহার করতে চান, নিজেদের সম্পন্ন করতে চান। যা অকারণ বা যা অনাবশ্যক, তার প্রতি এঁদের অন্তত কেনোই আগ্রহ নেই। এঁদেরকেই বররুচি অরসিক বলেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ এঁদের আহত করার রুচি গর্হিত কাজটি করেন নি। কারণ এঁরাই এ যুগের ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, প্রকৃত সমঝদার, তাই এঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনার আশঙ্কায় লেখক এঁদের রুচিহচীনতা সম্পর্কেও নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। অনেকেই প্রয়োজনের নিরিখে জিনিসের বিচার করেন, কেবল সৌন্দর্য বা মাধুর্য এঁদের লেশমাত্র বিচলিত করে না। এই সব লাভ-লোকসকানের ব্যাপারীদের দ্বারাই জীবনের নানা পর্বে যথার্থ শিল্পীদের নাকাল হতে হয়— তাই অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রনাথকে হয়তো শিখিয়েছিল মনের কথা সবসময়ে মুখে আনা ঠিক নয়। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"যাঁহারা সরস্বতীর কাব্য-কমলবনে বাস করেন। তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্‌বেজিত না করুন। এই আমার প্রার্থনা।"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অঙ্গন থেকেও বাজে রচনা বেজে তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করেছেন। যেমন সংস্কৃত মেঘদূত কাব্যে ধর্ম, পুরাণ ইতিহাস কিছুই নেই; কিন্তু এই বিরহী যক্ষের মনোভাবের সঙ্গে অনন্ত কালের বিরহী আত্মা নিজেদের যোগ খুঁজে পান বলেই তা পাঠ করে আজ অবধি মানুষ আনন্দ পান। 'মেঘদূত'-এ প্রয়োজনের কথা কিছুই নেই, এর প্রেম ভাবনাটি নেহাৎ-ই অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক, তবু কাব্য সাহিত্যের এই নিটোল মুক্তাটি যুগে যুগে প্রকৃত কাব্যরস পিপাসুর সানন্দপ্রাপ্তির কারণ হয়েছে। উদ্দেশ্যহীন এই প্রেম কাব্যটি যেন স্বচ্চ ও উজ্জ্বল এক তরী বিশেষ যা কল্পনার হাওয়ায় ভেসে সজল মেঘের পাল তুলে অবারিত বেগে এক অপরূপ নিরুদ্দেশ মাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে। এ কাব্যপাঠে অকারণেই চোখের কোল ভরে ওঠে। টেনিসনের ভাষায় যা idle tears. অভিশাপ জনিত যক্ষের নির্বসন আসলে কাব্য নির্মাণের নেহাৎ-ই এক কৌশল। আসলে মেঘদূত রবীন্দ্রনাথের মতে "আকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ।" আষাঢ়ের প্রথম দিনে যখন দিগন্ত ঢেকে যায় ঘনমেঘের ঘটায়, তখন সম্পূর্ণ অকারণেই আমাদের মনে এক বিরহ জেগে ওঠে। আমরা জানি ও মানি মন খারাপ করা বিকেল মানেই মেঘ জমেছে, দূরে কোথাও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মেঘলা দিনে তাই কাজে মন বসে না, বরং অকাজের আলস্যে দিন কাটাতে সাধ জাগে। ঠিক যেমন পূর্বমেঘ এত রয়ে বসে, এত ঘুরে ফিরে এত যূথীবন প্রফুল্ল করে, এত জনপদবধূর কটাক্ষ আকর্ষণ করে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে। আর আশ্চর্যের কথা, এই আধুনিক মন-সর্বস্ব মানুষের মতো সেকালের মানুষেরও মনে ছিল এবং তখনো

আষাঢ়ের প্রথম দিন মেঘপূর্ণ হয়েই আসতো। কৌতুক করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন মেঘদূত কাব্যপাঠের তাৎক্ষণিক ফললাভ এই তথ্যই। তবে এটুকু তথ্যে না হয় জ্ঞানের বিস্তার না হয় দেশের উন্নতি, না হয় চরিত্রের সংশোধন। ফলে এই লাভকে অনেকেই লাভ বলে মনে করবেন না। আর শেষ কথায় রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মন্তব্য—রসের কাব্য রসিকদের জন্যই ঢাকা থাকুক— "যাহা আবশ্যক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদ্দারের অভাব হইবে না।"

তাই কালিদাসের অমর কাব্য 'মেঘদূত'-এর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর ও ব্যাপক। কালিদাসের সৌন্দর্য জগৎ কবির কাছে কল্পনাসৃষ্ট হয়েও পরম সত্য। সেই সত্য ও সুন্দর থেকে নির্বাসিত বিরহী রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রোমান্টিক কালের চিত্র কল্পনায় পুর্নসৃষ্টি করেছেন তাঁর "প্রাচীন সাহিত্য"-এর অন্তর্গত 'মেঘদূত' প্রবন্ধে। আমরা সকলেই আজ চিরসৌন্দর্যের নিকেতন অলকাপুরী আর চিরপ্রেমের প্রেয়সী যক্ষিণীর বিরহে কাতর। কবির কাব্য তো সেই বিরহেই মেঘদূত, সেই অমূর্ত আদর্শায়িত প্রেম ও সৌন্দর্য-জগতের উদ্দেশ্য রচিত ও প্রেরিত। সুতরাং 'মেঘদূত' কাব্য পাঠে হাতে হাতে পাওয়ার মত জ্ঞানলাভ এটুকুই, যা আমাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়; যা মগজ দিয়ে হিসেব কষে বোঝা যায় না। এখানেই এই বাজে রচনার চিরন্তনত্ব আর এখানেই জ্ঞানবান রচনার অসারত্ব।

রবীন্দ্রনাথের রচনা শিল্পের গদ্য শৈলীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছন্দস্পন্দ। চরণের বহু পর্ব-সংহতি এবং পর্ব-সঙ্গতি গদ্যছন্দের মূলসূত্র। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' -এর গদ্য শৈলীর অন্যতম লক্ষণ হল দীর্ঘ যৌগিক বাক্য। এক একটি সরল বাক্যের পর একটি বহুপর্বিক দীর্ঘ যৌগিক বাক্য এবং পর্বগুলি সমাপিকাক্রিয়া সহ প্রত্যেকটি প্রায় সম্পূর্ণ, পরস্পর নিরপেক্ষ। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি কালের দীর্ঘ ব্যবধানে লেখা সত্ত্বেও লেখাগুলিকে অনবিচ্ছিন্ন মনে হয় তার কারণ একই 'মুড' নিয়ে সবক'টি রচনা লিখিত। ফলে রচনাশৈলীটিও হয়েছে এক। রচনার ভাষায় আবেগোচ্ছলতা আছে কিন্তু আড়ম্বর নেই। শব্দগুলি সমাসবহুল নয়, সাড়ম্বরও নয়, কিন্তু অধিকাংশই তৎসম এবং সানুপ্রাসিক। বিশেষণের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অন্যতম আরেকটি শৈলী বৈশিষ্ট্য হল প্রথম পুরুষের প্রয়োগ এবং মধ্যম পুরুষের সম্বোধন। এই প্রবন্ধের গদ্যশৈলী ভাবাত্মক বলে স্বতঃই তা চিত্রকল্পী, অলঙ্কারবহুল ও শব্দাড়ম্বরময় না হয়ে স্বচ্ছ ও ছন্দস্পন্দিত হয়েছে। তাই তাঁর গদ্য স্থানে স্থানে কাব্য হয়েছে। গদ্যের ওজোগুন এর দ্বারা কিছু হ্রাস পেয়ে থাকলেও মাধুর্যগুণ বেড়েছে। আটপৌরে গদ্য ভাষাকে শিল্পোত্তীর্ণ করার জন্য তিনি এর পদবিন্যাসে, পর্ব সজ্জায়, ছন্দস্পন্দনে এবং শব্দের মধ্যে অভিনব অর্থ ও ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছেন, ফলে তাঁর প্রতিভা গদ্যরচনায় কবিতার চেয়ে কিছুমাত্র কম পারদর্শিতা ও সৃজনশীলতা প্রদর্শন করেনি। তাঁর হাতে বাংলা গদ্য শিল্প হয়ে উঠেছে। গদ্য যদি কবিদের কষ্টিপাথর হয় তাহলে তিনি ভারতের চিরকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী।

৭৯.৫ সারাংশ

১৮৮৫-১৯১৬-র মধ্যে লেখা বেশ কিছু প্রবন্ধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' রচিত হয়েছে তবে রচনাগুলি আদৌ প্রবন্ধ জাতীয় রচনা না হলেও লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

"বিচিত্র প্রবন্ধ"-এর অন্তর্গত "বাজে কথা" প্রবন্ধটিতে লেখক অনাবশ্যকতাকে তত্ত্বমূল্য দিয়েছেন। প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক বলেছেন একটি মানুষকে বাজে খরচের মধ্যে দিয়েই যেমন চেনা যায়; তেমনি বাজে কথার মধ্যে দিয়ে একটি মানুষের মনের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অঙ্গন থেকেও বাজে রচনা বেজে তার মূল্যও নিধারণ করেছেন। যেমন— "মেঘদূত" কাব্যে ধর্ম, পুরাণ ইতিহাস।

ছন্দস্পন্দ রবীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। "বিচিত্র প্রবন্ধ"-এর গদ্যশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল দীর্ঘ যৌগিক বাক্য এবং ভাবাত্মক। এই কারণে গদ্য মাঝে মাঝে কাব্য হয়ে উঠেছে। তবে কবিতার পাশাপাশি গদ্য রচনায়াও তিনি সমান পারদর্শী এবং তাঁর হাত্রেত গদ্য শিল্প হয়ে উঠেছে।

৭৯.৬ অনুশীলনী

ক. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। বরুচি কে? তিনি কাদের, কেন 'অরসিক' বলেছেন?

২। আলোচ্য নিবন্ধে ভীলরমণীর কথা কি প্রসঙ্গে এসেছে?

৩। রবীন্দ্রনাথ কাদরে 'ক্ষমতাশালী লোক' বলেছেন? কেন?

খ. প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্ব সংক্ষিপ্তভাবে তাৎপর্য লিখুন—

১। "যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহা প্রতি ইঁহাদের কোনো লোভ নেই।"

২। "আষাঢ়ের প্রথম দিনে অকস্মাৎ ঘনমঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া ওঠে।"

গ. ১। 'বাজে কথা' প্রবন্ধের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ও কাব্যানুভূতির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করুন।

২। উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন— "যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।"

৩। "মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমুলক প্রলাপ"— কোন্ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি লিখেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৪। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের মর্মব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, উপযুক্ত বিশ্লেষণসহ নির্ণয় করুন।

৭৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—*বাংলা সাহিত্যের একদিন।*

২। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়—*বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভূমিকা।*

৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— *রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা।*

৪। নরেশচন্দ্র জানা—*কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ।*

৫। বিচিত্র প্রবন্ধ—*ড. সরোজ দত্ত।*

একক ৮০ ❑ পঞ্চতন্ত্র ঃ বই কেনা—সৈয়দ মুজতবা আলী

গঠন

৮০.১ উদ্দেশ্য
৮০.২ প্রস্তাবনা
৮০.৩ লেখক পরিচিতি ঃ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী
৮০.৪ মূলপাঠ-বই কেনা—বিশ্লেষণী পাঠ
৮০.৫ সারাংশ
৮০.৬ অনুশীলনী
৮০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৮০.১ উদ্দেশ্য

- সৈয়দ মুজতবা আলীর বিশিষ্ট গদ্যশৈলী সম্পর্কে পাঠক অবহিত হবেন।
- তাঁর জ্ঞানের বিশাল্ পরিধি সম্বন্ধে পাঠকের একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে।
- পাঠক সর্বোপরি এই প্রবন্ধ পাঠ করে আরো বেশি বই কেনায় ও বই পড়ায় আগ্রহী হবেন।
- যে বিশিষ্টজনদের কথা লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন, তাঁদরে সম্পর্কে কৌতুহলী পাঠক আরো বিশদ জানতে আগ্রহী হবেন।

৮০.২ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এককের মূলপাঠে মজুতবা আলীর "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থের "বইকেনা" প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। মুজতবা আলীর রচনাশৈলীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ করা আছে। "বাজে কথা" প্রবন্ধটি যে সাধারণ বাঙালীকে বই কেনা ও পড়ার জন্য উৎসাহিত করতে লেখা হয়েছে, সে কথাও এককের মধ্যে পাওয়া যাবে।

আপনি এককটি ভালো করে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার অসুবিধা হবে না।

৮০.৩ লেখক পরিচিতি ঃ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জে জন্ম। পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সকুল ছেড়ে দেন। ১৯২১-২৬ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা শেষে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮ -৩০ জার্মানী থেকে বৃত্তি পেয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এচি ডি উপাধি লাভ করেন। তারপর সমস্ত ইউরোপ এবং জেরুসালেম দামাস্কাস প্রভৃতি দেশে ঘুরে এক বছর কায়রোতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৬-এ তিনি বরোদা রাজ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ভারত বিভাগের পর বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষতা করেন।

১৯৫০-এ আকাশবাণীর কেন্দ্রপরিচালক হন। বিশ্বভারতীর ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু, মারাঠী গুজরাটী, ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলল—দেশেবিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী, শবনম্, ধুপছায়া, টুনিমেম প্রভৃতি। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নরসিংহ দাস পুরস্কার পান। ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

উনিশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যাঁদের লেখনী বাংলা রসসাহিত্যের ধারাটিকে পুষ্ট করেছে, আলী সাহেব তাঁদের অন্যতম। মূলতঃ তিনি রস-সাহিত্যের বা রকম্যসাহিত্যের বা রম্যরচনার লেখক হলেও অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য অনেক। তাঁর রচনায় যেমন হাসির খোরাক আছে, তেমনি আছে উপাদেয় ভ্রমণকাহিনী; গভীর রোমান্টিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যেমন তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে, তেমনি বেরিয়েছে ভয়াল রোমাঞ্চকর আধা গোয়েন্দাকাহিনী, রাজনীতির নানা লোমহর্ষক ঘটনার বিশ্লেষণ; কাব্যসুষমামণ্ডিত প্রকৃতি বর্ণনা যেমন পাওয়া গেচে তাঁর কাছ থেকে, তেমনি পাওয়া গেছে, ভাষা-ধর্ম-শিক্ষা নিয়ে মূল্যবান চিন্তাপূর্ণ আলোচনা একই লেখকের এমন বহুমুখী রচনার নিদর্শন সাহিত্যে খুবই দুর্লভ। তাই তাঁর রচনা প্রচুর জনসমাদর পেয়েছে।

রম্যরনচার ক্ষেত্রে নতুন প্রকাশভঙ্গিতে যে লেখক প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি যাযাবর। তাঁর অনবদ্য সুন্দর প্রথম গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাত' বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এরফলেই মুজতবা আলী এই ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর রচনাশৈলীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি তাঁর মনের ভাব বাচনবঙ্গীরর উপর এঁকে দিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি অনেক আর্‌বি ফার্‌সি শব্দ ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দকে বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর কলমের গুণে তাঁর ব্যবহৃত নতুন শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁরগদ্যে ফরাসী ভাষার প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, সরসতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করা যায়। লঘু চালের ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত রচনাশৈলীতে চমক ও শ্লেষের ব্যবহারে তিনি এক অভিনব রম্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। অতি সাধারণ ঘটনাকেও তিনি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে এক তীব্রতর স্বচ্ছ প্রদান করতেন। আর এখানেই তাঁর সাহিত্যিক অনন্যতা নিহিত।

৮০.৪ মূলপাঠ—বই কেনা ঃ বিশ্লেষণী পাঠ

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যেদিকে দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চটতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি সে কথা চোখ বন্ধ করে একটু খানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সন্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ব করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমতঃ— বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।"

অর্থাৎ সাহিত্যে সন্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভুগোল— আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুলন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবে হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loat of bread
beneath the bough
A flask of wine, A book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness of paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্ত বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মাদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন, তাতে আছে "আল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই Per excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনি তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেইটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে— ব্যস । এর বেশী আর কিন্তু নিয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফারসী ভাষা। এ-ভাষায় বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ 'সিকে দিয়ে যেকোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। একস্‌পেরিমেন্ট করতে নারাজ—দে'ল হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র বাসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে producer এবং consumer-তামাকের নিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? এই একখানা বই producer করেছি— কেউ কেনে না বলে আমিই consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত— পা ফেলা ভার। কেবন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লেকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজের জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে যের উত্তর পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ.ই. দিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাদ কিন্‌তে। দোকানদার একটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপুত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। সেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললেন 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন 'সেও তো ওঁর এখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালোবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জং করতে চায়; তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সরে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়বেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিল'মে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টাহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলাম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাদের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (ভাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

*　　*　　*

আর কত বলবো? বঙালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ- কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক থাক। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তার হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টাচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিন পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাপের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনাবপ্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

বিশ্লেষণী পাঠ ঃ

সাধারণ বাঙালীকে বই পড়া ও তার জন্য বই কেনায় প্রবৃত্ত করানোই এই প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল বিষয়ে যাবার আগে তিনি স্বভাবসঙ্গত ভাবেই হালকা একটি প্রসঙ্গ নিয়ে সরসভাবে নিবন্ধটি শুরু করেছেন। তাই মাছ-মারা কেরানীর সূত্রে তিনি মাছি ধরার আপাত কঠিন কাজটির কথা বলেছেন। মবশার মতো মাছি সহজে মারা যায় না, কারণ তাদের সম্বল কেবল দুটো চোখ নয়, তাদের সমস্ত মাথা জুড়েই নাকি অজস্র চোখ আছে। তাই ধরার আগেই মাছি ঠিক উড়ে যায়। মাছিদের এই চোখ সমৃদ্ধতা নিয়ে আনাতেলে ফ্রাঁস আক্ষেপ করেছিলেন। কারণ যদি তাঁর মাথার চতুর্দিকে চোখ থাকতো তবে তিনি এই সুন্দরী ধরনীর অপূর্ব সৌন্দর্যকে আরো বেশি করে একসঙ্গে দেখতে পেতেন। তবে ফ্রান্স এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন যে, মানুষের চক্ষু-ইন্দ্রিয় দুটি থাকলে কি হবে, সে মনের চোখের সংখ্যা সর্বদা বাড়াতে পারে। আর এটা করা সম্ভব জ্ঞানের পিপাসা বাড়িয়ে। চোখ বাড়াবার পন্থ স্বরূপ তাই আলী সাহেব বই পড়া ও বই কেনার কথা বলেছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন—পৃথিবীর আর সব সভ্যজাতি যেখানে বহুপাঠের মাধ্যমে কেবলি মনের চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, সেখানে বাঙালী হয়ে উঠছে আরব্য উপন্যাসের এক চোখা দৈত্য সম। অথচ মনের ভিতর আরো একটা ভুবন- সৃষ্টি করে নিতে পারলে জাগতিক অনেক যন্ত্রণা এড়ানো যায়। এ ব্যাপারে লেখক

বারট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে একমত। এই মনোভূবন র্মিণ করার একটাই উপায় বিভিন্ন বই পড়া বা দেশ ভ্রমণ করা। যেহেতু দেশ ভ্রমণ করা আর্থিক ও শারীরিক কারণে অনেক পক্ষেই সম্ভব হয় না তাই বোধ হয় মের খৈয়াম তাঁর বৈহেশ্‌তের সরঞ্জাম-এর তালিকায় সর্বাগ্রে রেখেছিলেন তাঁর প্রিয় বইগুলি। বিভিন্ন ধর্মও (মুসলমান-হিন্দু বা খ্রীষ্টান) কলমের শক্তির কথা যুগে যুগে স্বীকার করে এসেছে। সুতরাং ভালো বই না পড়লে মানুষ সর্বার্থেই ভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু সাধারণ বাঙালী ক্রমেই ভ্রষ্ট হচ্ছে কারণ জীবনের সবদিকে সে টাকা খরচ করতে পারলেও বই কেনার ব্যাপারে সে নিদারুণ কৃপণ। পাঠক এ ব্যাপারে প্রকাশককে দায়ী করেন প্রকাশকেরা আরো সস্তা দামে বই প্রকাশ করেন না। উল্টোদিকে প্রকাশকের বক্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে বই বিক্রী না হ'লে বই-এর দাম কমানো যায় না। ফলে এক অচ্ছেদ্য চক্রে পড়ে বাঙালীর বই কেনা বা বই পড়া আর হয়ে ওঠে না। এ চক্র ছিন্ন করতে হবে পাঠককেই। কারণ প্রকাশক দেউলে হওয়ার ভয়ে ঝুঁকি নেবেন না। কিন্তু কেউ কখনো দেউলে হয় নি বলেছেন আলী সাহেব। বরং প্রতি মাসের বাজেটে বাঙালী বই কেনার খাতে কিছু টাকা যদি বরাদ্দ করে, তবু বই বেশি বিক্রী হওয়ার সুবাদে একদিকে যেমন বই-এর দাম কমবে; তেমনি অন্যদিকে বাঙালী মনোরাজ্যে আরো সমৃদ্ধ হবে। লেখক তাই বাঙালী পাঠককে বই-এর নেশায় চুর হতে বলেছেন।

নিজের বই-এর প্রসঙ্গে এবং অপরের গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গে লেখক ব্যঙ্গে নিপুণ। তাই তিনি লিখেছেন "আমি একখানা বই produce করেছি কেউ কেনে না বলে আমি consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।" আবার মার্ক টুয়েন এবং অধিকাংশ লোকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর অভিমত—এঁরা কিছু বই কেনেন, আর কিছু বই বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করেন কিন্তু ফেরৎ দেন না। এভাবে তাঁদের লাইব্রেরীতে বই স্তূপীকৃত হয়।

লেখকের মতে ধনীর ধনার্জনের চেয়ে জ্ঞানীর জ্ঞানার্জন অনেক কঠিন কাজ। তাই লেকখ ধনীর চেয়ে জ্ঞানীকেই বিশে উচ্চাসন দিয়েছেন। কারণ ধনীর মেহনতের ফল টাকা, যা ধনী অপেক্ষা কোনো জ্ঞানী অনেক ভালো পথে ও উত্তম পদ্ধতিতে খরচ করতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানীর জ্ঞানচর্চার ফল পুস্তক, যা ধনীর কোনো কাজে লাগে না। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষ অকাতরে ধন ব্যয় করতে পারে। আবার উল্টো রকমের মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যাঁরা ঘর সাজাবার জন্য বই কেনেন। বই-এর প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স—এই মন্তব্য করেছেন লেখক। মানুষকে সম্মান জানতে বা অপমান করতে ফরাসীরা বই-এর সাহায্য নিয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে লেখক আঁদ্রে জিদের সম্পর্কে একটি মজাদার তথ্য সরবরাহ করেছেন। রাশিয়া থেকে ফিরে জিদ যখন রুশদের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন তখন প্যারিসের স্তালিনীয়রা জিদকে নানাভাবে পিবর্যস্ত করেছিলেন। অথচ তখন জিদের লেখকবন্ধুরা জিদের পক্ষ নিয়ে কিছুই বলেন নি বা লেখেন নি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জিদ এঁদের শিক্ষা দিতে এঁদের স্বাক্ষর সহ যে সব বই এঁরা জিদকে উপহার দিয়েছিলেন, কেবল সেগুলিকেই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিলামে চড়িয়েছিলেন। অপমানিক লেখকরা দ্বিগুণ তিনগুণ দাম দিয়ে নিজেদের লোক পাঠিয়ে ঐসব বই কিনে নিয়েছিলন; যাতে ব্যাপারটি কম জানাজানি হয়।—এভাবেই ফরাসীরা বই দিয়ে মানুষকে অপদস্ত করতেন।

বই কেনা ও বই পড়ার ব্যাপারে বাঙালীকে চেতনাসমৃদ্ধ করে তুলতে আপ্রাণ প্রয়াস করেচেন এই রম্যরচনাকার।বই কেনার ব্যাপারে বাঙালীর অনীহা লক্ষ্য করে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। অথচ বাঙালীর যে ক্রয়ক্ষমতা নেই তা লেখক মানতে নারাজ, কারণ ফুটবল বা সিনেমার টিকিট কিনতে তিনি বাঙালীকে কার্পণ্য করতে দেখেন নি। পূজা বা নববর্ষে বাঙালী নতুন জামাকাপড় কেনায় বেশ দরাজ, কিন্তু বইমেলায় গিয়ে আজো অনেকে একটা বইও না কিনে খাবারের স্টলে

'কিউ' দেন। বাঙালীর এই বই-অপ্রীতরি কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক আরবোপন্যাসের একটি গল্পের কথা মজাচ্ছলে লিখেছেন। কোনো এক হেকিমের একটি প্রিয় বই রাজা হস্তগত করেছিলেন হেকিমকে খুন করে। রাজা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে বইটি যখন পড়ছিলেন তখন বইটির জুড়ে যাওয়া পাতাগুলি উল্টাতে গিয়ে তাঁকে বারবার আঙুলে থুথু নিয়ে জোড়া পাতা ছাড়াতে হয়েছিল। প্রতিশোধপ্রবণ হেকিমের বইটির জুড়ে যাওয়া পাতায় পাতায় মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ, যা রাজার অজান্তে তাঁর মুখে যাচ্ছিল। প্রতিহিংসার এমন অভিনব পন্থাটির কথাও হেকিম বইটির শেষ পাতায় জানিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই নিদারুণ তথ্যটি জানার সঙ্গে রাজা ঐ বিষের প্রভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। কৌতুকপ্রবণ আলীসাহেবের অনুমান—এই গল্পটি জেনে গিয়েই হয়তো বাঙালী আর বই কেনে না বা বই পড়ে না। বই পড়ে অকালে যমালয়ে যেতে ভীরু বাঙালী স্বভাবতই রাজী নয়—অন্তিম বাক্যের এই শ্লেষ আজো যদি বাঙালীকে বই মুখো করতে না পারে তবে বাঙালীর সত্যিই বড় দুর্দিন।

৮০.৫ সারাংশ

সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা রম্যরচনার এক উল্লেখযোগ্য লেখক। তাঁর রচনায় হাসির উপাদানের পাশাপাশি ভ্রমণকাহিনী, রোমান্টিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী, গোয়েন্দাকাহিনী ছাড়াও ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা বিষয়েও আনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনাও পাওয়া যায়।

তাঁর "বই কেনা" প্রবন্ধটি বাঙালীদের বই কেনা ও বই পড়ায় উৎসাহ বাড়াবার জন্যই লেখা, কারণ বাঙালীরা আর সব দিকে টাকা খরচ করলেও বই কেনার জন্য টাকা খরচ করতে চায়না। বরং তারা প্রকাশকদের আরো কম টাকায় বই বিক্রী করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু প্রকাশকরা তা করতে চায় না। তাই আলী সাহেবের পরামর্শ প্রতিমাসে যদি কিছু বই কেনা যায়, তাহলেও বাঙালীরা মনের দিক থেকে যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি বই বেশি বিক্রী হলে আস্তে আস্তে বইদামও কমে যাবে। তবে বাঙালীর যে টাকা নেই তা নয়। এ প্রসঙ্গে লেখক আরব্য উপন্যাসের হেকিম ও রাজার গল্প বলেছেন। সেখানে রাজা হেকিমকে খুব করে তার প্রিয় বই হস্তগত করেছিলেন। কিন্তু হেকিম বইটার পাতায় পাতায় বিষ মাখিয়ে রেখেছিল। রাজা পাতা ওল্টাতে গিয়ে আঙুলে থুথু নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। বইটির শেষ পাতায় এসে রাজা যখন এ তথ্য জানতে পারলেন, তখন তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন, তাই আলী সাহেবের ধারণা বাঙালীরা হয়তো এই গল্পটি জেনে গিয়েই আর বই কেনে না।

৮০.৬ অনুশীলনী

ক. নীচের প্রশ্নগুলির অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। মার্ক টুয়েনের কী দেখবার মত ছিল?

২। 'আল্লামা বিল কলমি'—কথাটির অর্থ কি?

৩। 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে'— কে, কাকে বলেছেন?

৪। 'লেখরে মতে বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্যের কারণ কি?

৫। লেখক কি লিখবেন বলে কলম ধরেছিলেন?

খ. **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্ব সংক্ষিপ্তভাবে তাৎপর্য লিখুন—**

১। "যে যত বেশ ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।"

২। "তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র।"

৩। "কিন্তু লাইব্রেরীটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় জোগাড় করতে পারি নে।"

গ. ১। 'বই কেনা' নিবন্ধের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সৈয়দ মুজতবা আলীর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ও মজাদার রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করুন।

২। এই নিবন্ধে বাঙালীকে বই কেনায় অভ্যস্ত করে তুলতে প্রয়াসী আলী সাহেব নানা মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কোন্ প্রসঙ্গে, কার উদ্ধৃত, মজার ঘটনাগুলি তিনি লিখেছেন সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৩। রম্য-রচনা হিসেবে 'বই কেনা'-র সার্থকতা বিচার করুন।

৮০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—*বাংলা সাহিত্যের একদিক।*

২। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়—*বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভূমিকা।*

৩। সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী।